বংশ-পরিচয়

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রজাপতি-সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত

কলিকাতা ২০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

ও

২০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

গোবর্দ্ধন প্রেসে

শ্রীরসিকলাল পান দ্বারা মুদ্রিত

কার্ত্তিক, ১৩৩৪

মূল্য ৫৲ টাকা

৺পুণ্যশ্লোক—হেমচন্দ্র চৌধুরী

আবির্ভাব—আম্বারিয়া, ২৪শে কার্ত্তিক, [illegible] বঙ্গাব্দ

তিরোভাব—মোক্ষধাম ৺কাশীধাম, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ

সূচীপত্র

বংশ-পরিচয়

(অষ্টম খণ্ড)

সুসঙ্গ-রাজবংশ

যে সমস্ত প্রাচীন জমিদার বংশ বঙ্গদেশে এখনও বিদ্যমান, তাহাদের মধ্যে ময়মনসিংহ জিলাস্থিত সুসঙ্গ রাজবংশ সুপ্রাচীন; বস্তুতঃ এরূপ প্রাচীন বংশ দ্বিতীয় একটীও আছে কি না সন্দেহের বিষয়। সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা সোমেশ্বর পাঠকের পুণ্য-শোণিত অদ্যাপি বংশধরগণের ধমনীতে সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এই দৈবানুগৃহীত বংশে এই পর্য্যন্ত "দত্তক" গ্রহণ করিতে হয় নাই। তাহিরপুর রাজবংশও এই বিষয়ে শ্লাঘা করিতে পারেন কিন্তু তথাকার বর্ত্তমান রাজবংশও দৌহিত্র বংশ। ভূমিকম্প ও অগ্নির কবল হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রাচীন জীর্ণ দলিল এবং অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকাদির সাহায্যে সুসঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, বি-এ একটী ধারাবাহিক প্রামাণিক ইতিহাস লিখিবার প্রয়াস করিতেছেন। আমরা আশা করি, এই ইতিহাস লিখিত হইলে সুসঙ্গ রাজপরিবার সম্বন্ধে বহু তথ্য সাধারণের জানিবার সুযোগ হইবে। এই প্রামাণিক ইতিহাস বাহির হইলে ব্যক্তিবিশেষের সুসঙ্গ রাজবংশকে কৃত্রিম বংশ প্রমাণিত করিবার উপহাসাস্পদ প্রচেষ্টা বিফল হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে, নানা

উৎপাত, অধঃপাত এবং সজ্ঘাত, প্রতিঘাতের ভিতর দিয়াও বংশসুলভ নৈতিক উচ্চাদর্শ এবং বিনয় বর্ত্তমান বংশধরগণও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ মহারাজা কুমুদচন্দ্রের ন্যায় চরিত্রবান, বিনয়ী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সুশিক্ষিত এবং সর্ব্বজনাদৃত, অজাতশত্রু মহাপুরুষের আবির্ভাব এই বংশে সেই দিনও হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই সময়ের মধ্যে সুসঙ্গের সম্পূর্ণ ইতিহাস দেওয়া সম্ভবপর হইবে না—সুতরাং সংক্ষেপে প্রধান প্রধান ঘটনা সকল বিবৃত করা হইবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে খ্যাত পুরুষগণের কর্ম্মজীবনের কিঞ্চিৎ আভাষ এবং প্রধান প্রধান দুই একটী ঘটনা বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যাইবে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কান্যকুব্জ হইতে সোমেশ্বর পাঠক নামক জনৈক তেজস্বী, মহাপ্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ যুবক কামরূপ তীর্থ-পর্য্যটনের পথে গারো পর্ব্বতের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হন। বর্ত্তমান "ভংবাজারের" এক মাইল পথ উত্তরে সোমেশ্বরীর স্ফটিক-স্বচ্ছতোয়-বিধৌত একটী সুবিশাল প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাইয়া প্রকৃতির নয়ন-মনোহরণ শোভায় আকৃষ্ট হইয়া সেইস্থানে তপ-জপাদি ক্রিয়া-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। এমন সময়ে কতিপয় ধীবর আসিয়া পার্ব্বত্য গারোদের হস্তে অশেষবিধ নির্য্যাতনের কাহিনী এই ব্রাহ্মণকুমারের নিকট নিবেদন করিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল। ব্রাহ্মণকুমার ইহাদের করুণ কাহিনী শ্রবণে বিচলিত হইলেন এবং ধীবরগণকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন যে, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া বহুসংখ্যক লোকজন আনিয়া গারোদিগকে শান্ত করিবেন। বস্তুতঃ কিছুকাল পরই বহুসংখ্যক সাধু সমভিব্যহারে আসিয়া অচিরেই গারো সর্দ্দারকে বশীভূত করিয়া সমগ্র গারো জাতিকে করতলগত করিলেন। সাধুগণের পরামর্শে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া সুবিস্তীর্ণ গারো পর্ব্বত এবং সুবিস্তৃত সমতল ভূমিতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন

করিলেন। রাজ্যের নাম সুসঙ্গ হইল এবং রাজধানী হইল সুসঙ্গ। সুসঙ্গ হইতে নদী তখন বহু দূরে প্রবাহিত হইত। প্রবাদ আছে, নিজ যোগবলে সোমেশ্বর পাঠক নদীর গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজ রাজধানীর পার্শ্ব দিয়া বহাইয়া দেন। এই কারণে সুসঙ্গের পাদধৌতকারিণী স্বচ্ছতোয়া নদীর নাম "সোমেশ্বরী" হয়। সুসঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। আসামের বাহিরে এরূপ সুন্দর স্থান দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহের বিষয়।

গুণাকর

সোমেশ্বরের অতি বৃদ্ধ বয়সে দেহান্তর ঘটে। তৎপর তৎপুত্র গুণাকর শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি যোগবলে শূন্যমার্গে আসীন থাকিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহাকে "আকাশবাসী" এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নসিরুদ্দিনের সহিত তাহার বিশেষ সখ্যতা ছিল। নসিরুদ্দিন তাঁহার বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দেখিয়া "বুদ্ধিমন্ত খাঁ" এই উপাধি দেন। ১৩১৮ খৃঃ অঃ শ্রীনিবাস মৈত্র নামক এক কুলীনের সহিত গুণাকরের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়, এই ঘটনার পর হইতে সুসঙ্গ রাজবংশ বঙ্গীয় বারেন্দ্র সমাজভুক্ত হইলেন।

জানকীনাথ মল্লিক

জানকীনাথ গুণাকরের পৌত্র। খাঁ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া মল্লিক উপাধি ধারণ করেন। জানকীনাথের সহোদরগণ কুলগত প্রথানুযায়ী "কোঙর" বলিয়া খ্যাত ছিলেন, এবং নিয়মিত ভাতা রাজসংসার হইতে পাইতেন। জানকীনাথই প্রথম তাহিরপুর রাজবংশের সহিত কুলক্রিয়া করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে সুসঙ্গের নায়কত্ব অধিকার অর্জ্জন করেন। তদবধি সুসঙ্গ সমাজে "উদয়াচল," তাহিরপুর অস্তাচল" এবং পাবনা জিলার রায় পরিবার "সুমেরু পর্ব্বত" বলিয়া খ্যাত হন। এতদবধি সুসঙ্গ রাজকন্যাগণ কুলীনেই প্রদত্ত হন এবং সুসঙ্গ কেবলমাত্র আট পটী কুলীনেই কার্য্য করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

বাণিজ্য-ব্যবসায়ী নহি। আমি সুসঙ্গের স্বাধীন নরপতি। যদি আমাকে দক্ষিণা দিতে চান, তবে এই 'মহারাজ' উপাধিটী সম্রাট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন।'

রাজা মানসিংহের অনুরোধে তাঁহার সহিত রঘুনাথ দিল্লীতে গমন করেন। তথায় বাদশাহ তাঁহার স্বরূপ, শৌর্য্য, বীর্য্য ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা দর্শনে 'সিংহ" এবং 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন "পঞ্চহাজারী" "মনসবদার" "গারোতাম্বী" প্রভৃতি অতি উচ্চ সম্মান প্রদান করেন। ইহা ভিন্ন ৩৫০ জন নায়েকের উপর শাসন-ক্ষমতা দেন; তৎকালে এই সম্মান ভারতীয় নৃপতিগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকের ভাগ্যেই ঘটিত। তদবধি দিল্লীশ্বরকে সুসঙ্গাধিপতির আগর কাষ্ঠ খাজনা-স্বরূপ দিতে হইত।

"Mallik Janakinath was succeeded by his son Raghunath. The fragrant wood called Agar produced largely in the Garo Hills was in request at the Court of Delhi, and Raghunath agreed to supply a quantity of Agar to Delhi yearly as a tribute, in return for the half of an Imperial force which enabled him to subdue his turbulent Garo subjects, and for the title of Raja. It further stated that the Emperor conferred on Raja Raghunath the title of Garotambi, Monshabi or Commander of five thousands".

—Bridge.

মোগল পাঠান সৈন্যের বংশধরগণ অদ্যাপি সাড়িয়া ও মনাটী গ্রামে "খাঁ" ও "কো" উপাধি ধারণ করিয়া বাস করে।

রাজা রঘু ও কমলারাণী সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আছে। রাজা রঘুনাথ একবার ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বন্দী হন। কিন্তু রঘুনাথ কোনও ক্রমে

পলায়ন পূর্ব্বক কারামুক্ত হন। পলায়নসময়ে একটী ক্ষুদ্র খালে তাহার নৌকা আটকাইয়া যাওয়ায় রঘুনাথ নৌকাখানি টানিয়া আনেন। তাহাতে খালটী প্রশস্ত হয়। তদবধি খালটীর নাম রঘুখালী হয়। মাধবপুর নামক স্থানে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত একটী ইষ্টকনির্ম্মিত শিবমন্দির স্থাপন করেন। বিগত ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পে সুসঙ্গের নানা প্রকার কীর্ত্তি লোপ হওয়ার সঙ্গে এই মন্দিরও ভূমিসাৎ হয়। সুসঙ্গ রাজবাটীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী দশভুজা মূর্ত্তির সহিত রাজা রঘুর শৌর্য্য ও বীর্য্য বিজড়িত। কথিত আছে, যখন তিনি দিল্লীতে ছিলেন তখন বাদশাহ তাহাকে বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে শাসন করিতে নিযুক্ত করেন। রাজা রঘু কৌশলে স্বীয় বুদ্ধি ও ভুজবলে ইঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যের সমস্ত বাদশাহ-দরবারে প্রেরণ করেন, কেবল একটী অষ্টধাতুনির্ম্মিত দশভূজা মূর্ত্তি আপন বাটীতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৯৫ খৃঃ অঃ উক্ত দশভূজা মূর্ত্তি অপহৃতা হইলে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত ভাস্কর যদুপালের আদর্শানুযায়ী অতি রমণীয় সিংহবাহিনী দশভূজা মূর্ত্তি রাজবাটীর দুর্গা-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। সেই ঘটনার কতিপয় বৎসর পর রাজ-ধানীর কোন সমীপবর্ত্তী জঙ্গলভূমির মধ্যে রাস্তা কাটিতে কুলীগণ অপহৃতা দশভূজা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। তখন সেই মূর্ত্তিকে রাজবাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র বিশোধিত করিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। নূতন মূর্ত্তিটী সরিকা বণ্টনের সময় রাজা রাজকৃষ্ণ পাইয়াছিলেন।

চাদ রায়কে পরাজিত করার পরই রঘুনাথ সম্রাট কর্ত্তৃক "পঞ্চহাজারী" সম্মানে সম্মানিত হন।

রঘুনাথের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনাথ সনন্দ পাওয়ার অভিপ্রায়ে দিল্লী গমন করেন। কুমার রামনাথের আরও ছয়টি ভ্রাতা ছিলেন। রাজা রামনাথকে সনন্দ দিয়া বাদশাহ তাঁহার ছয়টি কনিষ্ঠ

ভ্রাতাকে ছয়টী পরগণার জায়গীর দেওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রামনাথ বলেন যে, তাহারা নিজেরা আসিয়াই সনন্দ লইয়া যাইবেন; কিন্তু দীর্ঘকাল পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে, ভ্রাতাগণ সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কেবলমাত্র তিন ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমান আছেন। ভ্রাতৃগণের মৃত্যুতে নূতন সনন্দ পাওয়ার আশা না থাকায় ধিক্কারস্বরূপ "মতিনাশ" এই শব্দ স্বীয় নামের শেষে লিখিতেন।

রামনাথের পর রামজীবন সম্পত্তির মালিক হন। তিনিও সম্রাটের যথেষ্ট অনুগ্রহভাজন ছিলেন। রাজা রামজীবনের সময় হইতে আগর কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে রাজস্ব প্রচলিত হইল। সুলতান সুজার সময় হইতেই সুসঙ্গের রীতিমত রাজস্ব দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজা রামজীবন অপুত্রক হওয়ায় তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণ সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর রামসিংহ সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসী এবং বুদ্ধিমান ছিলেন।

সনন্দ গ্রহণার্থ দিল্লীতে গমন করিয়া ঔরঙ্গজেবের নিকট সনন্দ গ্রহণ করেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে রাজা রামসিংহ অস্ত্রচালন-কৌশলে বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিয়া ৭০০ মনশবদারী ও ৩০০ সওয়ারের অধিকার প্রাপ্ত হন। কিছুকাল দিল্লীতে থাকার পর রামসিংহের স্বাধীন হওয়ার বাসনা বলবতী হয় এবং রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া রাজধানী দুর্গাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দুর্গাপুরে দিল্লীর অনুকরণ করিয়া একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন এবং কয়েকটী কামান স্থাপন করিলেন। এমন কি, সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার দুঃস্বপ্নরূপ আকাশকুসুম দেখিলেন, কিন্তু সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অচিরেই তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ফলে মুর্শিদকুলী খাঁ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং এক ওমরাহের কন্যার সহিত পরিণয়ও হয়। বাদশাহের আদেশে তিনি

পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাঁহার নূতন নাম হইল “আবদুল রহিম”। কিছুকাল পর নবপরিণীতা স্ত্রী সহ স্বদেশে উপনীত হইলে হিন্দু গৃহিণী জাতিচ্যুত স্বামীর সহিত বাস করিতে অসম্মত হন এজন্য আবদুল রহিম রাজধানীতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলেন না। রাজা রামসিংহ রাজত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেও প্রজাগণ তাঁহাকে ভয় এবং ভক্তি করিত। তিনি সময় সময় প্রজাবর্গের উপর শাসন পরিচালনও করিতেন। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিন্দু পত্নীর গর্ভে রণসিংহ নামে পূর্ব্বেই এক পুত্র ছিল এবং মুসলমানী স্ত্রীর গর্ভে রহিমিরাম নামে এক পুত্র এবং তারাবিবি নামে এক কন্যা জন্মে। মুসলমান স্ত্রীর প্ররোচনায় রামসিংহ এক বিভাগপত্র দ্বারা কুমার রণসিংহকে ।৵০ আনা ও রহিমিরামকে ॥৵০ আনা পাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। বাদশাহের সুবিচারে এই বণ্টনপত্র অগ্রাহ্য হয় এবং রণসিংহই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। ইতিমধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে—রামসিংহ ওরফে আবদুল রহিমের অভাবে তাঁহার সহোদর ভ্রাতা বীরসিংহ গোপনে দিল্লীর বাদশাহ হইতে সুসঙ্গের সনন্দ লইয়া আসিতেছিলেন ; পথিমধ্যে সুসঙ্গরাজের পরম হিতৈষী কোন বন্ধুকে আনন্দসহকারে সেই সনন্দ দেখাইতে গেলে বন্ধুবর সেই সনন্দখানি লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এই বিশ্বাসিকতার পুরস্কার-স্বরূপ ইঁহারা বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং তদবধি তাঁহাদের বংশধরগণ এই উপাধি গৌরবের সহিত ধারণ করিয়া আসিতেছেন। এই ঘটনার পর বীরসিংহ লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া পুনর্ব্বার সনন্দ পাওয়ার আশায় দিল্লীতে গমন করেন। ঠিক সেই সময়েই সুসঙ্গের প্রকৃত অধিকারী রণসিংহ তথায় উপনীত হইয়া সমুদয় কথা সম্রাটের নিকট বিবৃত করিলে সম্রাট রণসিংহকেই সনন্দ প্রদান করেন।

রাজা রণসিংহের পর রাজা কিশোর সিংহ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী

তন। কিশোর সিংহ হাতী খেদা রীতিমতভাবে প্রচলন করার জন্য বহু হাজংগণকে পর্ব্বতের সানুদেশে অন্যত্র হইতে আনাইয়া বাসস্থান দেন। ইহারাই প্রতিবৎসর গারো পর্ব্বত হইতে প্রচুর হস্তী ধৃত করিয়া রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করিত। তদ্ভিন্ন পর্ব্বতজাত কাঠ বাঁশের আমদানী ইহাদের দ্বারাই হইত। কিশোর সিংহ ও কুমার রাজসিংহ এতদুভয়ের মত ভ্রাতৃ-প্রণয়ের দৃষ্টান্ত বিরল। রাজা কিশোর সিংহ বাকী করের জন্য ঢাকার নবাব কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী অবস্থায় ঢাকায় নীত হইলে কুমার রাজসিংহও স্বেচ্ছায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। আর সেই সঙ্গে গিয়াছিল পরম বান্ধব ভৃত্য বাঙ্গারাম। ঢাকায় উপনীত হইলে নবাব আদেশ দিলেন, "যদি সাত দিনের মধ্যে তোমাদের তিন পুরুষ হইতে প্রাপ্য সমস্ত কর পরিশোধ করিতে পার ভাল, নতুবা প্রাণদণ্ড হইবে। আর সাত দিন যাবৎ প্রত্যহ তোমাদিগের অঙ্গে বেত্রাঘাত পড়িবে।" পরম সুহৃদ বাঙ্গারাম বেত্রাঘাতের শাস্তি নিজে বরণ করিয়া লইয়া অম্লানবদনে বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া চলিলেন। সপ্তম দিবসে তাঁহারা মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে ইংরাজ সৈন্য ঢাকা নগরী অবরোধ করিয়াছে শুনিতে পাইলেন। নিরাশার মধ্যেও তাঁহাদের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল।

রাজা কিশোর সিংহ মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। কিশোর সিংহের পুত্রসন্তান না হওয়ায় কিশোর সিংহ রাজসিংহের হস্তে সম্পত্তির ভার অর্পণ করেন।

রাজসিংহের ন্যায় উদার ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি কদাচ দৃষ্ট হয়। তিনি প্রকৃত দানবীর ছিলেন। সুসঙ্গে এমন কেহ নাই যে, কোনও না কোন প্রকারে তাঁহার দান না পাইয়াছে। তিনি পাবনা, রাজসাহী অঞ্চল হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আনাইয়া সুসঙ্গে উপনিবিষ্ট করেন। তিনি একজন সুকবি

ছিলেন। "ভারতীমঙ্গল কাব্য" "রামায়ণ" "মনসা পাঁচালী" "ঢাকা বর্ণনা" প্রভৃতি খণ্ড কাব্য লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে "রাসমালা" ও "মনসা পাঁচালী" তাঁহার প্রপৌত্র কমলকৃষ্ণ সিংহ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। "ভারতীমঙ্গল কাব্য" মহারাজা কুমুদচন্দ্র "সাহিত্য-সংহিতা" পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

ইঁহার সময় সর্ব্বপ্রথম ভারত সরকার গারো পর্ব্বত সহ সুসঙ্গ পরগণা ষোল আনায় ২৮৭০৩৵১২ গণ্ডায় দশশাল বন্দোবস্ত করিয়া লন। লর্ড ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সুসঙ্গের মালীক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হ'ন।

এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রমানাথের পুত্র যাদবেন্দ্রকে রাজা রামনাথ কয়েকটী গ্রাম তালুকস্বরূপ প্রদান করেন। যাদবেন্দ্রের কন্যা এই সম্পত্তি পান এবং তাঁহার দৌহিত্র হরিরাম ভাদুড়ী এই তালুক প্রাপ্ত হন। হরিরাম ভাদুড়ী হইতেই পূর্ব্বধলার জমিদারগণের অভ্যুদয় হয়।

দশশালা বন্দোবস্তের সময় অনেক জমিদারের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহারা সুসঙ্গ পরগণার দুই আনী অংশের দাবী করিয়া বন্দোবস্ত করিয়া লন। ভাদুড়ীগণ দুই আনা অংশের জমীদার হইয়া "সিংহ" উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহাদেরই বংশধর পূর্ব্বধলা এবং ঘাগড়ার জমীদারগণ।

রাজা রাজসিংহের পর হইতেই সুসঙ্গের ভাগ্যলক্ষ্মীশ্রী পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। রাজসিংহের মৃত্যুর পর বিশ্বনাথ, গোপীনাথ ও জগন্নাথ বর্ত্তমান থাকেন। বিশ্বনাথ মহাবলশালী ও সুপুরুষ ছিলেন। শরীরচর্চ্চাবিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় এই পরিমাণ প্রতিষ্ঠা থাকিলে সুসঙ্গের বর্ত্তমান ইতিহাস অন্য প্রকার হইয়া যাইত। তাঁহার সময়ে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন নারায়ণডহরের রামচরণ মজুমদার।

রামচরণ তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধূর্ত্ত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধিই সুসঙ্গের সর্ব্বনাশ-সাধনে ও নিজ স্বার্থসাধনেই নিয়োজিত হয়। এই কার্য্যে সহায়ক ছিলেন রাজগুরু কৃষ্ণহরি বিশারদ। ইঁহাদের পরামর্শে বিশ্বনাথের অজ্ঞাতসারে গোপীনাথ ও জগন্নাথ কালেক্টরীতে নাম জারী করান। বিশ্বনাথ প্রথমে ইহা জানিতে পারেন নাই, কিন্তু অবশেষে জানিয়াও বোধ হয় ইহার ফল ভবিষ্যতে কি হইতে পারে তাহা অনুমান করিতে না পারিবার ফলে এবং সম্ভবতঃ স্বাভাবিক ঔদার্য্য ও ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ প্রথমতঃ ইহার প্রতিকার-প্রচেষ্টা করেন নাই। কিন্তু ভ্রাতৃগণের বৈরীভাব যখন ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিল, তখন আদালত যোগে জ্যেষ্ঠানুক্রমিক সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার প্রথা বহাল রাখিবার চেষ্টা করেন। এই মোকর্দ্দমা Privy Council পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল।

সুসঙ্গের রাজগণ গারো পর্ব্বতের অতুল বিভবরাশির মালিক হওয়ায় সমতল ভূমির আয়ের উপর তৎকালে অধিক দৃষ্টিপাত করেন নাই। পাহাড়ে হাতী খেদায় প্রতি বৎসর প্রচুর হাতী ধৃত হইত এবং পর্ব্বতজাত নানা প্রকার বৃক্ষ ও খনিজ পদার্থ হইতে প্রভূত পরিমাণ ধনাগম হইত। প্রাচীন পত্রাদি হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, একবার স্বয়ং দিল্লীশ্বর সুসঙ্গে হাতী খেদা দেখার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট গারো পর্ব্বতের কয়েকটী গ্রাম যাহা পূর্ব্ব সুসঙ্গ রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল তাহা পৃথকভাবে বন্দোবস্ত করিতে থাকেন (১৮৩৭ খৃঃ অঃ)। কিছুদিন ইহা লইয়া গোলযোগ করার পর ১৭ই মার্চ্চ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আসামের কমিশনার সাহেব সেইসকল গ্রাম ছাড়িয়া দেন এবং সুসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন।

বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সুচতুর, মহাকর্ম্মী প্রাণকৃষ্ণ সকল প্রকার অশান্তি সহ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন।

বিশ্বনাথের ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃপত্নীদ্বয় সম্পূর্ণরূপে ক্রূরবুদ্ধি রামচরণের হস্তে ক্রীড়নক হইল; রামচরণের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে পরিচালিত হইতে লাগিলেন। রামচরণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খান্দানের মোকদ্দমার ফল প্রাণকৃষ্ণের বিরোধী হইল এবং তদবধি সুসঙ্গ রাজবংশে জ্যেষ্ঠানুক্রমিক রাজ্য পাওয়ার প্রথা বিলুপ্ত হইল। ফলে বঙ্গের সমুদয় জমিদার-গৃহে যাহা হইয়াছে এই স্থানেও তাহা হইবার সুযোগ হইল। ইহার বিষময় পরিণতি বর্ত্তমান মহারাজা সম্পূর্ণই অনুভব করিতেছেন।

একে খান্দানের মোকদ্দমায় নানা প্রকার অর্থহানি ও অশান্তি, তাহার উপর পুনরায় এক সাজ্যাতিক বিপদ দেখা দিল। এইবার স্বয়ং ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সুসঙ্গ রাজ্যের প্রতি পতিত হয়। "১৮৫৭ সালের ৩০শে জুন ২৭৯ নং পত্র দ্বারা রেভিনিউ বোর্ড জরিপ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সুসঙ্গের উত্তর সীমা নির্দ্ধারণের জন্য আদেশ দেন।" উক্ত Superintendent পার্ব্বত্য প্রদেশ সম্পূর্ণ সুসঙ্গের সীমানার বাহিরে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করেন। ফলে প্রাণকৃষ্ণকে এক মোকর্দ্দমা দায়ের করিতে হয়। এই মোকদ্দমা Privy Councilএ মহারাজা রাজকৃষ্ণের সময় শেষ হয়। প্রাণকৃষ্ণ নানা অশান্তিতে দীর্ঘায়ু হইতে পারেন নাই। তাহার ন্যায় অসামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি অল্পই দৃষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রাণকৃষ্ণ সিংহকে জীবিত কালের জন্য "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।

রাজা প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণ গবর্ণমেণ্টের নিকট নাম জারী করেন। পিতৃসম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু রাজকৃষ্ণ ধৈর্য্য, দৃঢ়তা এবং বিচক্ষণতার সহিত সাংসারিক কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে Garo Hills Act পাশ হইয়া সমগ্র গারো পাহাড় সুসঙ্গের বহির্ভূত হইয়া গবর্ণমেণ্টের অধিকারে যায়। মোকদ্দমায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত

হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট পাহাড়ে সুসঙ্গের স্বত্ব স্বীকার করিলেও রাজনৈতিক কারণে পাহাড় গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র দেড়লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিয়া সুসঙ্গের অতুল সম্পত্তি পাহাড় সুসঙ্গের হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। ইহার ফলে সুসঙ্গের আয় বহু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই উপাধি পুরুষানুক্রমে পাইবার অধিকারী করিয়া গবর্ণমেণ্ট সুসঙ্গের গৌরবস্মৃতিকে জাগরূক রাখিয়াছেন। পাহাড় হস্তচ্যুত হইলেও যদি পাহাড়ের মৌরসী প্রথা বহাল থাকিত, তাহা হইলেও সমতলভূমির জমিদারের আয় সম্মানরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হইত। কিন্তু বিচারে ও নূতন আইনে উভয় প্রকারেই ফল সুসঙ্গের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক হইয়াছে।

বিপদ কখনও একা আসে না, ইহা বন্যার ন্যায়ই আসে। হঠাৎ একদিন রাজার প্রতিষ্ঠিত দশভুজা বিগ্রহ রজনীযোগে অপহৃতা হন এবং ১২৯৪ বাঙ্গালা সনের বৈশাখ মাসে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বহুকালের সংগৃহীত গৃহসামগ্রী ও প্রাচীন কাগজপত্রাদি একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। শুনা যায়, কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে step লওয়ার ফলেই নাকি এই অগ্নিসংযোগ ক্রিয়া সাধিত হইয়াছিলেন।

মহারাজা রাজকৃষ্ণ ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান, গুণগ্রাহী এবং সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যে উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনিই প্রথমে চা বাগান, কমলা বাগান, গারো পর্ব্বতে কয়লার খনিতে কাজ করান এবং চূণের ব্যবসা ইত্যাদির প্রথমারম্ভ করেন। তিনিই গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন, Dispensary স্থাপন, রাস্তা তৈয়ারী প্রভৃতি বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। বিদেশ হইতে স্বদেশবাসীকে সর্ব্বপ্রকারে শিক্ষা প্রদান করিয়া আনিয়া গ্রামের শ্রী ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় দূরদর্শী ও কর্ম্মী লোক বিরল।

তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে অল্পবয়স্কাদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টা ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা এবং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণের মধ্যে বিবাহের চেষ্টা প্রভৃতি করিয়া যান।

তাঁহার ভ্রাতাগণ প্রত্যেকেই প্রাচীন প্রণালীতে শিক্ষিত ছিলেন। অল্পাধিক সাহিত্যচর্চ্চা এবং Natural History চর্চ্চা এই পরিবারের মজ্জাগত। মহারাজের ভ্রাতাগণের মধ্যে কেহ কেহ সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছেন।

শিবকৃষ্ণ এখনও জীবিত; তিনি 'কবুতর', 'ময়না' এবং অন্যান্য পশু পক্ষী সম্বন্ধে নিজ ভূয়োদর্শনের ফল প্রবন্ধাকারে জনসমাজকে উপহার দিয়াছেন। কমলকৃষ্ণ সাহিত্যসেবীর উৎসাহদাতা ছিলেন এবং বহু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন পাণ্ডুলিপি সকলেই সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে উপহার দিত।

সুসঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের দরিদ্র কবি গোবিন্দদাস কিছুকাল ছিলেন; কমলকৃষ্ণ "অশ্বতত্ত্ব" "গোপালন" "আম্র" "জাতীয় সঙ্গীত" "তূর্য্য-বরঙ্গিণী" প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করিয়া যান। জগৎকৃষ্ণের সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ অধিকার ছিল।

পশ্চিম বঙ্গে যেরূপ ঠাকুরবাড়ী সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রণী, পূর্ব্ববঙ্গে সুসঙ্গ পরিবারও সেইরূপ সর্ব্বাগ্রগণ্য। সত্তা বজায় রাখিয়া সময়োপযোগী ভাবগ্রহণের অসাধারণ ক্ষমতা এই পরিবারে বিদ্যমান। বস্তুতঃ সাহিত্যচর্চ্চা এবং সমাজসংস্কারবিষয়ে এই পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন।

মহারাজা রাজকৃষ্ণের পর কুমুদচন্দ্র মহারাজা উপাধির অধিকারী হন। নানা কারণে কুমুদচন্দ্রের জীবন নানা প্রকার অশান্তিতে পূর্ণ ছিল। তাঁহার সময়েই বিশ্বনাথের প্রবর্ত্তিত খান্দান প্রথার তিরোভাবে প্রকৃত অশান্তির

ভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতে থাকে। যাহাই হউক, রাজপরিবারের মধ্যে যাহাতে কোনও সূত্র ধরিয়া অসদ্ভাবের সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা বিশেষ চেষ্টা করিতেন। মহারাজা কুমুদচন্দ্র স্বধর্ম্মানুরাগী, মিষ্টভাষী, সদালাপী, বিনয়ী এবং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি জমিদারি কার্য্যে পরিপক্ক হইলেও, আসক্তিশূন্য সংসারী ছিলেন। জমীদার সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার মত নিষ্কলঙ্কচরিত্র এবং সংস্কৃতসাহিত্যসেবী কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

তিনি কখনও নিজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন নাই। ময়মনসিংহ District partitionএর সময় তিনি রেল লাইন খুলিয়া Head Quartersএর সহিত বিভিন্ন Subdivision যোগ করিয়া দিলে District partition না করিলেও চলিতে পারে, এই যুক্তিপূর্ণ দূরদর্শী প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় বহু মাসিক পত্রিকায় সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিয়া গিয়াছেন। যে সকল মহাসম্মিলনের সভাপতিত্ব করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে কালীঘাটের ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী ও ময়মনসিংহ নগরের সাহিত্য-সম্মিলনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন কলিকাতায়, ঢাকায় ও ময়মনসিংহে বহু সাহিত্য-সভা ও সামাজিক সভায় বহু সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া সমবেত লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তিনি নানাবিধ রাজসম্মানের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। যদিও তিনি রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন তথাপি তিনিই পটী-সমীকরণ-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন এবং নিঃস্বার্থ সমাজ-সংস্কারের বিরল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ স্বীকার করিতেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সম্মিলনে ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান দেখিয়া গিয়াছেন। তাহার সমস্ত সময় সংস্কৃত-সাহিত্য ও দর্শন চর্চ্চা

পক্ষীপালন এবং গো-সেবায় ব্যয়িত হইত। তাহার বাহ্যিক এবং ভিতরকার জীবনে এতটুকুও পার্থক্য ছিল না। বস্তুতঃ এইরূপ প্রগাঢ় জ্ঞান এবং চরিত্র অর্থশালী লোকের ভিতর ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়, এমন কি মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের মধ্যেও বিরল।

অনেকে অর্থ ব্যয় করিয়াই লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু বিনা অর্থে মহারাজা কুমুদচন্দ্র যে সম্মান পাইয়া গিয়াছেন তাহা দেশ-নায়কদের ভাগ্যেও অল্পই ঘটে। ভারতের সনাতন ভাবধারা ও সাধনার তাঁহার প্রতি অসাধারণ আসক্তি ছিলে।

কুমুদচন্দ্রের জীবিতকালের মধ্যে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। ইহাতে সুসঙ্গের প্রাচীন কীর্ত্তিসমুদয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ভূমিকম্পে জগৎকৃষ্ণ ও তদীয় পুত্র নরেন্দ্রচন্দ্র দেওয়াল চাপায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজবাড়ীর পরিবারবর্গকে ৭ দিন নৌকায় থাকিতে হয় এবং প্রায় ছয়মাস কাল গোশালার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য ইহার পর সাধারণভাবে বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

দেশবাসীর হৃদয়ে মহারাজা কুমুদচন্দ্র কত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া সকল সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যেভাবে এবং ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ মহারাজা কুমুদচন্দ্র ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। মহারাজা তাঁহার ভ্রাতা কুমার নীরদচন্দ্রের হস্তেই সমস্ত বিষয় কার্য্যের ভার সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তদীয় খুল্লতাত ভ্রাতা প্রমোদচন্দ্র, নরেশচন্দ্র ও নীরদচন্দ্র এই তিন জনে ষ্টেটের কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

প্রমোদচন্দ্র ও নীরদচন্দ্র উভয়েই অসাধারণ বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন সুচতুর ব্যক্তি। যদি কোনও বৃহত্তর কার্য্যে তাঁহারা ব্যাপৃত থাকিতেন তাহা

হইলে প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিতে পারিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে বিষয়কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা আছে।

বর্ত্তমানে কুমার দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র বি-এ, রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র বি-এ, (Police Magistrate) অরুণচন্দ্র সিংহ এম-এ, সুধীন্দ্রচন্দ্র সিংহ M. Sc. (Attorney), সুহৃদচন্দ্র সিংহ, M. A., ও মহারাজা ভূপেন্দ্র-চন্দ্র সিংহ, বি-এ, এই কয়জন গ্রাজুয়েট আছেন। প্রত্যেকেই সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সাহিত্যিক-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

বর্ত্তমান মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, বি-এ পিতৃদত্ত সম্পত্তির সহিত পিতার অনেক গুণরাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বিষয়ের জটিল সমস্যা-সমাধানের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে এতদিন অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পাইতে-ছেন না। আমরা আশা করি, তাঁহার মত চরিত্রবান এবং বিদ্বান ব্যক্তি অচিরেই জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। ইতিমধ্যে সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে তাহার স্বাধীন অথচ সুচিন্তিত মতের আভাষ মাসিক পত্রিকার ভিতর পাওয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহের ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর অভ্য-র্থনা সমিতির সভাপতিত্ব ও অন্যান্য সভার সভাপতিত্ব করিয়া যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সমাজসংস্কার-বিষয়ে রক্ষণশীল হইলেও উদারমতাবলম্বী। তথাকথিত অসভ্য জাতি-গণকে সমাজে গ্রহণ করা তাঁহার মত এবং দেশকালপাত্র-বিবেচনায় স্থানীয় সমস্যার মীমাংসা স্থানীয় আবশ্যকতা অনুসারে উদার ভাবে করাও তাঁহার মত। এই বিষয়ে এই দুর্দ্দিনে সমাজকে ঠিক পথে চালিত করিয়া বংশের উপযুক্ত ক্রিয়া করিবেন, বিশ্বাস আছে। মহা-রাজার একমাত্র পুত্র মহারাজকুমার সুরজিৎ দীর্ঘজীবী হউন, ইহাই প্রার্থনা। মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র শীঘ্রই মহারাজা কুমুদচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি "কৌমুদী"

নাম দিয়া প্রকাশিত করিবেন। মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্রও পিতৃপিতামহের ন্যায় রাজসম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। মহামান্য যুবরাজের ভারত আগমনের সময় তাঁহার সহিত আলাপ করার সৌভাগ্য ইঁহার ঘটিয়াছিল।

রাজপরিবারের প্রত্যেক যুবকই উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন।

ধীরেশচন্দ্র সিংহ, B. Sc., কৃষিবিদ্যা শিক্ষার মানসে এডেনবরায় গিয়াছেন।

সুসঙ্গ-রাজবংশ তালিকা।
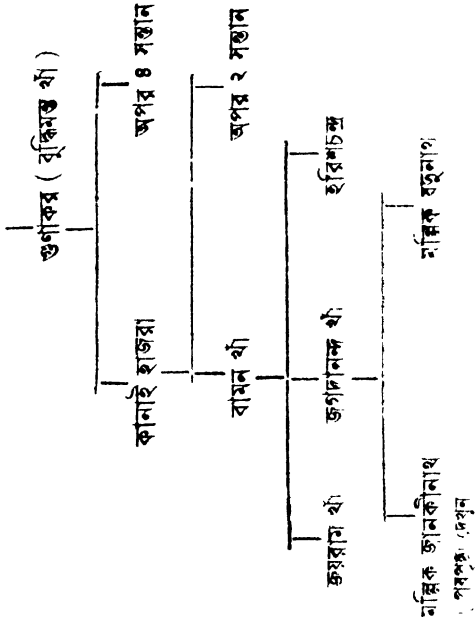
মল্লিক জানকীনাথ
রাজা রঘুনাথ
রাজা রামনাথ
কুমার রমানাথ
কুমার গোপীনাথ
কুমার ভূপতি
কুমার শ্রীপতি
রূপনারায়ণ
ভবদেব
যাদবেন্দু
রাজা রামজীবন
রাজা রামকৃষ্ণ
রাজা রামসিংহ (বা আবদুল রহিম)
কুমার বীরসিংহ
রাজা রণসিংহ
তারা বিবি
রহিমিন্নার
রাজা কিশোর সিংহ
রাজা রাজসিংহ
কুমার বৈদ্যনাথ
কুমার কৃষ্ণনাথ
রাজা বিশ্বনাথ
কুমার গোপীনাথ
কুমার জগন্নাথ
রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর
(পরপৃষ্ঠা দেখুন)

রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর
মহারাজা রামকৃষ্ণ
কমলকৃষ্ণ
জগৎকৃষ্ণ
শিবকৃষ্ণ
মহারাজা কুমুদচন্দ্র
কুঃ নীরোদচন্দ্র
কুঃ নগেন্দ্রচন্দ্র
কুঃ দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র
প্রমোদচন্দ্র
গিরীন্দ্রচন্দ্র
সুরেন্দ্র রমেশ নরেন্দ্র
সুধাংশুকুমার
মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র
গগনেন্দ্র
সমরেন্দ্র
বিমল
সুরথ
বড়ু
মহারাজকুমার সুরজিৎ
(পরপৃষ্ঠা দেখুন)
(পরপৃষ্ঠা দেখুন)
(পরপৃষ্ঠা দেখুন)

শিবকৃষ্ণ
রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র
নরেশচন্দ্র
পরেশ
ধীরেশ
পরিমল
শৈলেশ
শীতেশ
কুমার নীরোদচন্দ্র
কিরণচন্দ্র
বাদল
অরুণ
তরুণ
বিজয়
প্রমোদচন্দ্র
সুধীর
দেবেশ
সুধীন্দ্র
সুহৃদ
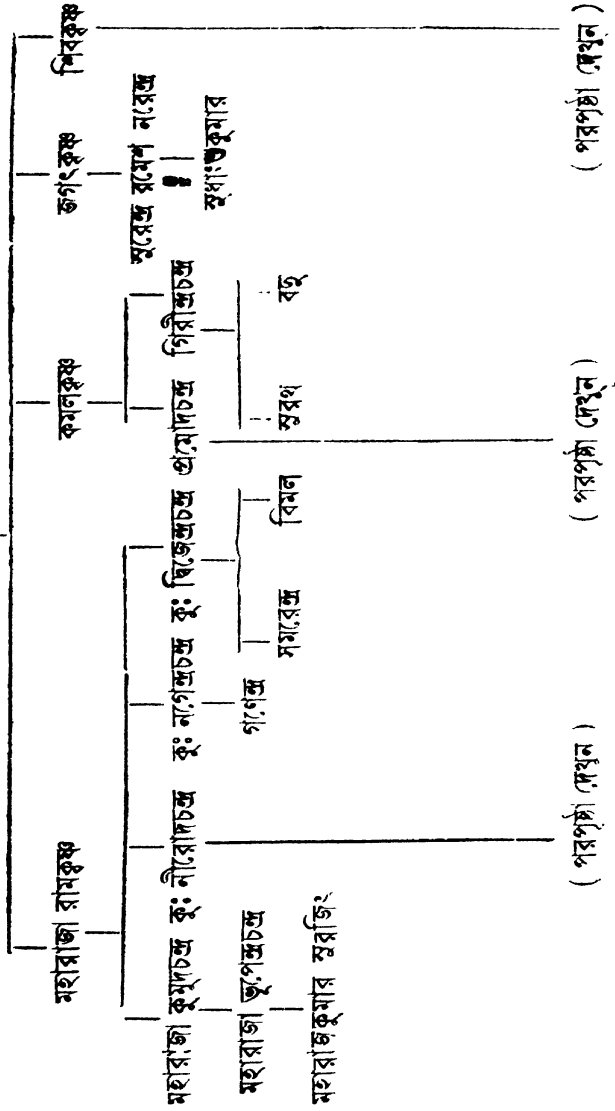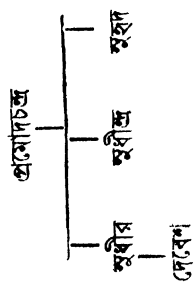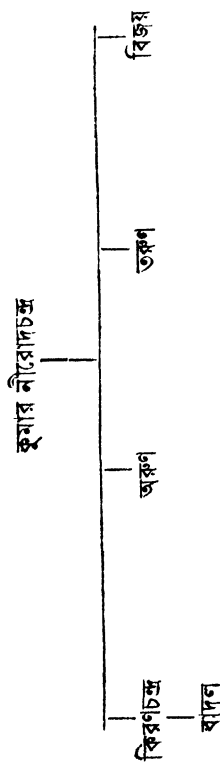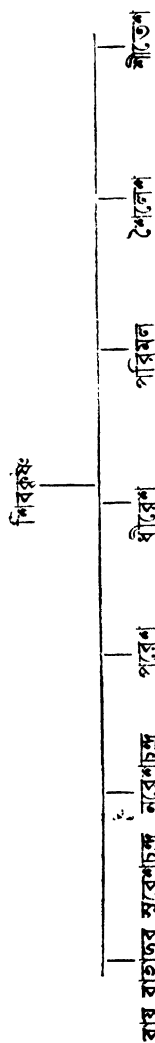
রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তালন্দ গ্রামের মৈত্র জমিদার-বংশ।

কনৌজ-নিবাসী ব্রাহ্মণ কাশ্যপগোত্রজ দক্ষের পুত্র সুষেণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কনৌজ হইতে রাজা আদিশূরের সভায় আগমন করেন।

আদি পরিচয়

ইনিই কাশ্যপগোত্রজ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আদি-পুরুষ। এই সুষেণ ওঝার বংশে মতু মৈত্রের জন্ম হয়। ইঁহার সময় হইতেই এই বংশে ওঝার স্থলে মৈত্র খেতাব আরম্ভ হইয়াছে। কুলশাস্ত্রে জানা যায়, ইনি রাজা বল্লাল সেনের সভায় প্রথম কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ইঁহার বংশে প্রীতিকৃষ্ণ মৈত্রের জন্ম হয়। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হাঁপানীয়া গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ইঁহার পুত্র ব্রজকিশোর মৈত্র তালন্দ গ্রামে বিবাহ করিয়া তালন্দবাসী হইয়াছিলেন।

ব্রজকিশোর মৈত্রের পুত্র গৌরকিশোর, তৎপুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ মৈত্র। তৎপুত্র প্রসিদ্ধ আনন্দমোহন মৈত্র মহাশয় স্বীয় বুদ্ধিবলে প্রায় ৮০০০০৲

এষ্টেট স্থাপয়িতা

হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নামানুসারেই তদ্‌পরিত্যক্ত এষ্টেটের নাম "তালন্দ আনন্দমোহন এষ্টেট" হইয়াছে। এক জীবনে এই বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন করা সহজ কথা নহে। পারসী ভাষা ও ইতিহাসে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। স্বগ্রামে প্রথমে একটী উচ্চ প্রাইমারী পাঠশালা স্থাপন ...

ছিলেন; পরে ১২৯০ সালের পূর্ব্বে ঐ পাঠশালাকে মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত করিয়া স্বীয় নামানুসারে "আনন্দমোহন ইনষ্টিটিউসন" নাম রাখিয়া গিয়াছেন। তৎকালে পার্শ্ববর্ত্তী অন্য কোন স্থানে কোন স্কুল ছিল না, সুতরাং ঐ অঞ্চলের লোকের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। বিদেশী ছাত্রদের থাকিবার জন্য একটী বোর্ডিংও স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় বহু বিদেশী ছাত্র থাকিয়া উক্ত স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে। এই বোর্ডিংএর সমস্ত ব্যয়, এমন কি ছাত্রদের বৈকালের জলখাবারের ব্যয় পর্য্যন্ত তিনি নিজে বহন করিতেন। স্কুল এবং বোর্ডিং এখনও সেইভাবেই চলিতেছে। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কেহ বিপদে পড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে পৈতৃক বিগ্রহ ৺শ্রীশ্রীরাধামাধব জিউ ঠাকুরকে স্থাপন করিয়া সেবা চালাইবার নিয়মিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই শ্রীমন্দির তথায় "মৈত্রকুঞ্জ" নামে খ্যাত। এখানে বার্ষিক ছয় হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়া থাকে। আগ্রা জেলা-তেও তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি আছে। তালন্দের বাড়ীতে শ্রীশ্রী৺মদনমোহন জিউ বিগ্রহ তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। এই বিগ্রহদেবের শ্রীপাদপীঠের নীচে "রূপনারায়ণ শর্ম্মা" নাম খোদিত আছে। মালদহ জেলার অধীন তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত চাঁপাই গ্রাম হইতে এই বিগ্রহদেবকে আনন্দ-মোহন মৈত্র মহাশয় তালন্দ গ্রামে আনয়ন করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। "রূপনারায়ণ শর্ম্মা" নাম খোদিত দেখিয়া অনুমান হয় "প্রসিদ্ধ গৌরগত-প্রাণ রূপ গোস্বামী" এই বিগ্রহস্থাপনকর্ত্তা। সম্ভবতঃ গৌড়ে তিনি নবাব বাহাদুরের কর্ম্ম করিবার সময় এই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

আনন্দমোহন অত্যন্ত অতিথিপ্রিয় ছিলেন। যত অতিথিই আসুক না কেন, যে সময়েই আসুক না কেন, তিনি অকাতরে অন্ন দান করিতেন।

তিনি অনেক সংকার্য্য করিয়াছেন। পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি ললিত মোহন মৈত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ললিতমোহনও কুলীন-সন্তান ছিলেন। ১২৯৬ সালের মাঘ মাসে আনন্দমোহন মৈত্র মহাশয় ৯০ বৎসর বয়সে শ্রীবৃন্দাবনধাম লাভ করিয়াছেন।

ললিতমোহন অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সম্পত্তির সদ্ব্যবহারই করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত প্রজারঞ্জক ছিলেন। প্রজাগণের কোন প্রার্থনাই তাঁহার নিকট অপূর্ণ থাকিত না।

মোহান্ত মহারাজ

দুর্ভিক্ষ বা অজন্মার বৎসর নিজ গোলা হইতে ধান্য দিয়া অভাবগ্রস্ত প্রজাগণকে সাহায্য করিতেন। এই উদ্দেশ্যে স্বীয় জমিদারী মধ্যে মালদহ জেলার দুইটী মফঃস্বল কাছারীতে এবং রাজসাহী জেলার একটী মফঃস্বল কাছারীতে ও তালন্দ সদর কাছারীবাড়ী মোকামে সর্ব্বদা ধান্য মজুত রাখিতেন। প্রজাগণ সুদ দিতে পারিবে না বলিয়া ধরিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সুদ বাদ দিতেন। ঐ সমস্ত দুঃস্থ প্রজাকে তিনি কখন পীড়ন করেন নাই। এমন কি আসল ধান্যও অনেককে মাপ করিয়াছেন।

তাঁহার দেড় লক্ষ টাকার এষ্টেটে বাকী খাজনার নালিশ ৩০।৪০টী ব্যতীত বেশী হয় নাই। যাহারা তামাদির আপত্তি করে তাহাদেরই নামে বাধ্য হইয়া নালিশ করিতে হইয়াছে। যাহারা তামাদির আপত্তি করে নাই, তাহাদের নামে কখনই নালিশ হয় নাই। অনেকে আসল খাজনাও মাপ পাইত। এক প্রজার ৬।৭ বৎসরের বাকী থাকিলেও তথাপি তাহার নামে বাকী খাজনার নালিশ হয় নাই। প্রজাগণও তেমনি যে বৎসর সুআবাদ পাইত, সেই বৎসর সাধ্যমত সমস্ত খাজনা শোধ করিয়া দিত। তাঁহার এষ্টেটে প্রজাপীড়ন নাই।

প্রজাদের উপকারার্থে তিনি তালন্দ গ্রামে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে একটী

দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া দিয়াছেন। উহা আজিও "ব্রজেন্দ্রমোহন দাতব্য চিকিৎসালয়" নামে পরিচিত। তিনি নিজ জমিদারী মধ্যে মালদহ জেলায় নাচোল গ্রামে এবং রাজসাহী জেলায় তানোর গ্রামে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়ে মাসিক সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত ডিস্‌পেনসারীতে বহু দরিদ্র প্রজা ঔষধ পাইয়া উপকৃত হইতেছে। পানীয় জল সরবরাহ জন্য তিনি স্থানে স্থানে জলাশয় খনন করিয়া দিয়াছেন।

শিক্ষাবিস্তারের জন্যও ইনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তালন্দ গ্রামে "বিনোদিনী টোল" নামে একটী টোল স্থাপন করিয়া পাড়াগাঁয়ে সংস্কৃতচর্চ্চার বেশ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ঐ টোলের অধ্যাপক মহাশয়ের বেতন, আহার ও বাসস্থান এষ্টেট হইতে বহন করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। গ্রামে "ললিতমোহন লাইব্রেরী" নামে একটী পাঠাগার স্থাপন করিয়া এতদঞ্চলস্থ লোকের বিনা ব্যয়ে বিবিধ পুস্তকপাঠের সুবিধা করিয়াছেন। রাজসাহী সহরে নিজ বাসায় অনেক ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিয়া রাখিয়া গরীব বিদ্যোৎসাহী ছাত্রের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। গ্রাম্য রাস্তা-ঘাটেরও অনেক হিতসাধন করিয়াছেন। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার জন্য নিজ গ্রামে "বীণাপাণি বালিকা-বিদ্যালয়" নামে একটী প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অতিথিসেবা ও দেবসেবা ইত্যাদি রীতিমত ঠিক রাখিয়াছিলেন। দ্রব্যাদির ত্রিগুণ দ্বিগুণ মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও ইনি কখন অতিথিসেবার ত্রুটী করেন নাই। ইঁহার ধর্ম্মজীবন যে ভাবে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে ইনি কোন সাধক ছিলেন। যোগভ্রষ্ট হইয়া এই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে ইঁহার খুবই আস্থা ছিল। প্রসিদ্ধ গোস্বামীমহাশয়গণ ইঁহার ধর্ম্মজীবনের পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে "মোহান্ত মহারাজ" ও "মহর্ষি" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

উপাধি-সমর্পণ-পত্র।

বৈষ্ণবলক্ষণ-লক্ষিত অনন্য-শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত তালন্দাধিপতি শ্রীল ললিত মোহন মৈত্র মহাশয় শ্রীনবদ্বীপস্থিত পণ্ডিত গোস্বামীবৃন্দ-দত্ত, রাজসাহী-স্থিত শ্রীহরি শ্রীধর্ম্ম-সভা সভ্যবৃন্দ-দত্ত "মোহান্ত মহারাজ" উপাধিরত্ন পাইয়াছেন, আমরা তাঁহার অঙ্গে নববিধ কুলীন বিপ্রলক্ষণের সাক্ষাৎ করিয়া "মহর্ষি" উপাধি-ভূষণ অর্পণ করিলাম।

দাতাসুধীর সকলভূতসুহৃদ যতাত্মা
শাস্ত্রোক্ত ভূসুর সুবৈষ্ণবধর্ম্মপালঃ।
শ্রীকৃষ্ণপাদরতিধৃক্ সদয়ো মহর্ষি
র্জীব্যাচ্চিরং ললিতমোহন মৈত্র নামা॥

সন ১৩২৭
শ্রীহরিসভা বার্ষিকোৎসব
দিন ২ বৈশাখ।

বগুড়া জেলান্তর্গত রায়কালী
গ্রামস্থিত শ্রীবৈষ্ণব সমিতি সভা
শ্রীআনন্দলাল চৌধুরী প্রভৃতি

যোগ্য পাত্রেই যোগ্য উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি ৺শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জিউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন এবং তদ্গতচিত্তে তাঁহারই ধ্যানে অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। তাঁহার তীর্থ-পর্য্যটন-যাত্রা এক অপূর্ব্ব সমারোহ ব্যাপার। তিনি ভারতের কোন তীর্থক্ষেত্রই পর্য্যটনে বাকী রাখেন নাই। নিজ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ, ইষ্টদেব, আত্মীয়-স্বজন, কর্ম্মচারী, পাচক, চাকর, ধোপা, নাপিত, এমন কি কোন বৈষ্ণবপ্রবর সঙ্গ প্রার্থনা করিলে আদরে গ্রহণ করিয়া বিপুল লাটবহর সমভিব্যাহারে ভারতীয় সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। "তীর্থ-পর্য্যটন" নামক পুস্তিকাতে তাঁহার তীর্থযাত্রাসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। রাজসাহীর শ্রীবৈষ্ণব সভার ভিত্তি স্থাপন করিয়া এবং

উহার উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া শ্রীবৈষ্ণবপ্রাণজনের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

ললিতমোহনের এবং এষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার তালন্দ-নিবাসী 'পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব'-লেখক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সুষেণ-বংশীয় শ্রীযুত বিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন মহাশয়ের অসীম পরিশ্রম এবং শাসন-সংরক্ষণের গুণে সম্পত্তির আয় যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পুরস্কারস্বরূপ ললিতমোহন তাঁহার 'পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব'-প্রকাশে ১৪০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

তিনি প্রজাপ্রীতিতে ও লোকহিতার্থে যে সমস্ত সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন সমস্তই স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও নিজ নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, আপন জনকে ভালবাসার ন্যায় ঐ সমস্ত সৎকার্য্য করিতেও তিনি খুব ভালবাসিতেন। ৫২ বৎসর বয়সে ললিতমোহন ৺আনন্দ-মোহনের শূন্য বাগান দুই পুত্র, পাঁচটী কন্যা, সুযোগ্য জামাতা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী-জামাতা প্রভৃতিতে সাজাইয়া, পৌনে দুই লক্ষ টাকার আয়ের ভূসম্পত্তি রাখিয়া গত ১৩৩০ সালের ২১শে পৌষ ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে ৺গোলোকধাম লাভ করিয়াছেন। প্রজাগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত; সুতরাং তাঁহার মহাপ্রস্থান-সংবাদ কোন প্রজাই শুষ্ক চক্ষে শ্রবণ করিতে পারে নাই।

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র, এম-এ, বি-এল, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া অতি যোগ্যতার সহিত এষ্টেট পরিচালন করি-তেছেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান গোপীকুলমোহন এখন পাঠ্যাবস্থায় আছেন। তাঁহারা পিতামহ ও পিতার ন্যায় অত্যন্ত দানশীল। তাঁহাদের সমস্ত কীর্ত্তি ইঁহারা ঠিক রাখিয়াছেন। শ্রীপাট খেতুরে একটী বিগ্রহ স্থাপন জন্য ৭০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। নওহাটা দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতিকল্পে ১২০০৲ টাকা

ব্রজেন্দ্রমোহন ও গোপীকুলমোহন

রাজসাহী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে দান করিয়াছেন। রাজসাহীতে জলের কল হইলে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন, স্বীকৃত হইয়াছেন। এত অল্পকাল মধ্যে উভয় ভ্রাতা স্বীয় প্রজাদের নিকট হইতে আশাতীত খ্যাতি, সম্মান, ভক্তি লাভ করিয়াছেন, ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। তাঁহাদের দরবার-গৃহের দ্বার প্রজাদের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত।

কৃষ্ণগোবিন্দ মৈত্রের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দমোহন মৈত্র অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি বিষয় তত্ত্বাবধানের ভার জ্যেষ্ঠ আনন্দমোহন মৈত্রের উপর অর্পণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ দেবসেবায় যাপন করিবার মানসে পৈতৃক বিগ্রহ ৺রাধামাধব জিউ ঠাকুরকে বৃন্দাবন লইয়া যান এবং তথায় মন্দির নিম্মাণ পূর্ব্বক বিগ্রহ ঠাকুরকে স্থাপন করেন। গোবিন্দমোহনের বৃন্দাবনধামেই প্রাণবায়ু নির্গত হয়। তাহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। কৃষ্ণমতি নামে একটী কন্যা ছিল। গোবিন্দমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী ভুবনমোহিনী দেবী রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাঁচবাড়ীয়া-নিবাসী প্রসিদ্ধ রায় জমিদার-বংশোদ্ভূত ৺হরচন্দ্র রায়ের পুত্র তারকচন্দ্র রায়কে স্বামীর অনুমত্যনুসারে নিজ দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। দত্তকরূপে গৃহীত হইবার পর তারকচন্দ্রের নাম কুঞ্জমোহন হয়। দত্তক লওয়ার ৩।৪ বৎসর পর ভুবনমোহিনী স্বর্গারোহণ করেন। এই সময়ে কুঞ্জমোহনের এষ্টেট-সংক্রান্ত অনেক বড় বড় মামলা-মোকর্দ্দমা হয়। কুঞ্জমোহনের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্ণমতি দেবী ও ম্যানেজার যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বীয় বুদ্ধিবলে এষ্টেট রক্ষা করেন। তৎপরে কুঞ্জমোহনের এষ্টেট সরকার কর্ত্তৃক কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে গৃহীত হয়। কোর্টস অফ ওয়ার্ডসে সম্পত্তির খুব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কুঞ্জমোহনের ২১ বৎসর বয়সে এষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডস হইতে মুক্ত হয়। কুঞ্জমোহনের এখন বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। এ যাবৎকাল তিনি অতি সুচারুভাবে এষ্টেট পরিচালন করিয়া আসিতেছেন

এবং সম্পত্তি যাহা পাইয়াছিলেন তাহা প্রায় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তিনি তালন্দ গ্রাম অতিশয় অস্বাস্থ্যকর হেতু রাজসাহী সহরে বসবাস করিয়া থাকেন। এখানে তিনি খুব সুন্দর বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীই সহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর। কুঞ্জমোহন অতিশয় সজ্জন ও আদর্শচরিত্র। তাঁহার মত নিষ্কলঙ্ক ও চরিত্রবান ব্যক্তি বড়লোকদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। তিনি নিজে তামাক বা পানটী পর্য্যন্ত খান না। সকলেই নির্ম্মল চরিত্রের জন্য তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কুঞ্জমোহন বড় পরদুঃখকাতর। তিনি গোপনে অনেক টাকা দান করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট কেহ যাইয়া নিজের দুঃখ বা কষ্টের কথা জানাইলে তিনি যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। কদাচ কাহাকেও বিমুখ করেন না। তিনি বিলাসপ্রিয়তা পছন্দ করেন না। কুঞ্জমোহনের দেবসেবা ও অতিথিসেবার প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকেন। তিনি অধিকাংশ সময় ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। তিনি সহরের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিতই সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি রাজসাহী ধর্ম্ম-সভা ও বৈষ্ণব সভার সম্পাদক ও সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ও সদর বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বরও ছিলেন। তিনি এখন সেণ্ট্রাল জেলের ভিজিটর ও জেলের এডভাইসরী বোর্ডের একমাত্র বে-সরকারী হিন্দু মেম্বর। গত ১৩২৯ সালে উত্তর-বঙ্গ জলপ্লাবনে এবং স্থানীয় জলপ্লাবনে কুঞ্জমোহন অনেক টাকা সাহায্য করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট কুঞ্জমোহনের সদাশয়তা ও সচ্চরিত্রতার পরিচয় পাইয়া গত ১৩৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে "রায় সাহেব" উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি অতিশয় প্রজারঞ্জক, প্রজার জলকষ্ট-নিবারণের জন্য স্বীয় জমিদারীর মধ্যে স্থানে স্থানে পুকুর খনন করাইয়া দিয়াছেন।

পরদুঃখ-নিবারণে তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট। কুঞ্জমোহন পাবনার অন্তর্গত নাকালিয়ার প্রসিদ্ধ রায়-বংশীয় কোচবিহারের ভূতপূর্ব্ব উকীল ৺আনন্দচন্দ্র রায়ের কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। কুঞ্জমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবনীমোহন M. Sc., B. L., দ্বিতীয় পুত্র ধরণীমোহন M. A., B. L.; তৃতীয় পুত্র যতীন্দ্রমোহন মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছেন। তাহার ছেলেদের স্বভাব-চরিত্র অতি মধুর। কুঞ্জমোহনের তিন কন্যার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার জামাতারা সকলেই কৃতবিদ্য ও বিশেষ সম্পত্তিশালী।

নিম্নে মৈত্র বংশের একটী সংক্ষিপ্ত কুলজী প্রদান করা হইল :—

তালন্দের মৈত্রবংশ তালিকা।
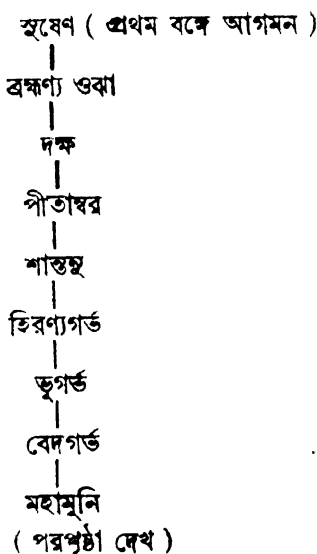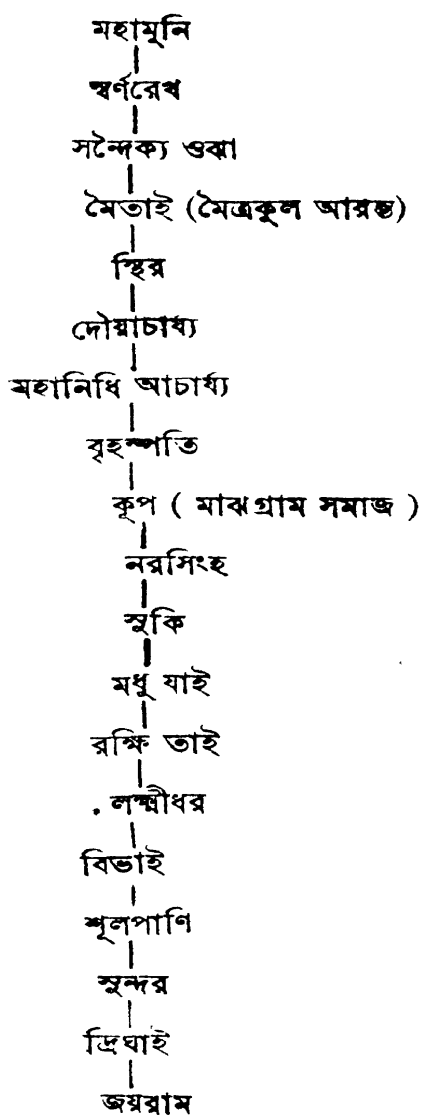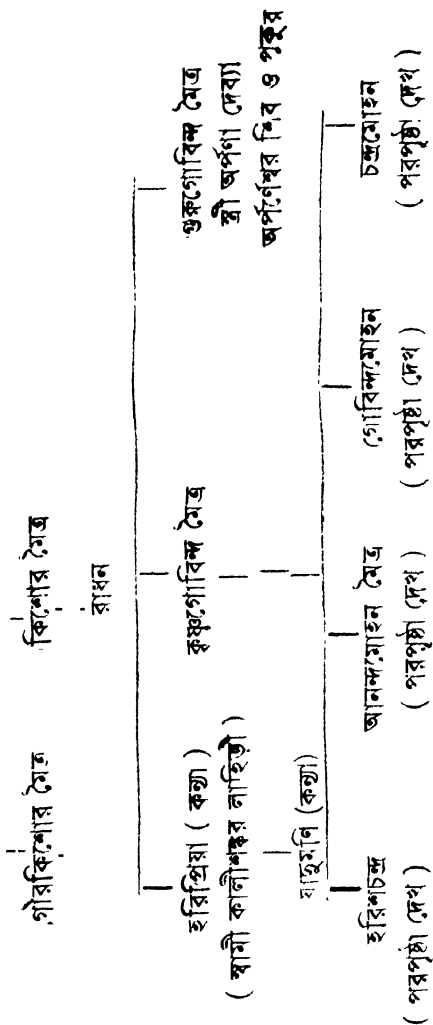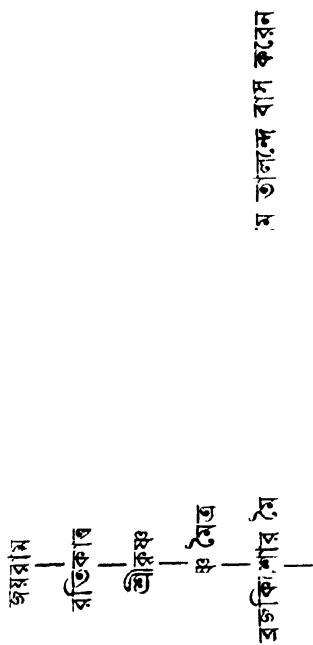
মহামুনি
|
স্বর্ণরেখ
|
সন্দৈক্য ওঝা
|
মৈতাই (মৈত্রকুল আরম্ভ)
|
স্থির
|
দৌয়াচার্য্য
|
মহানিধি আচার্য্য
|
বৃহস্পতি
|
কূপ (মাঝগ্রাম সমাজ)
|
নরসিংহ
|
সুকি
|
মধু যাই
|
রক্ষি তাই
|
লক্ষ্মীধর
|
বিভাই
|
শূলপাণি
|
সুন্দর
|
দ্রিঘাই
|
জয়রাম

জয়রাম
রতিকান্ত
শ্রীকৃষ্ণ
ষ্ণ মৈত্র
ব্রজকিশোর মৈ
ম তালন্দে বাস করেন
গৌরকিশোর মৈত্র
কিশোর মৈত্র
রাধন
হরিপ্রিয়া (কন্যা)
(স্বামী কালীশঙ্কর লাহিড়ী)
কৃষ্ণগোবিন্দ মৈত্র
গুরুগোবিন্দ মৈত্র
স্ত্রী অর্পণা দেব্যা
অর্পর্ণেশ্বর শিব ও পুকুর
যাদুমণি (কন্যা)
হরিশচন্দ্র
(পরপৃষ্ঠা দেখ)
আনন্দমোহন মৈত্র
(পরপৃষ্ঠা দেখ)
গোবিন্দমোহন
(পরপৃষ্ঠা দেখ)
চন্দ্রমোহন
(পরপৃষ্ঠা দেখ)

হরি ন্দ্র | নন্দমোহন মৈত্র | গো মোহন মৈত্র | চন্দ্রমোহন মৈত্র, স্ত্রী ব্রহ্মময়ী

শশিরেখা (কন্যা) স্বামী কিশোরী সান্যাল | ললিতমোহন মৈত্র মোহান্ত মহারাজ | কু হন মৈত্র

ব্রজেন্দ্রমোহন ত্র | শ্রীগোপীকুল ন মৈত্র

শ্রীরাধিকা হন মৈত্র | শ্রীগোপী হন মৈত্র

চন্দ্রনাথের মোহান্তগণ।

চন্দ্রনাথ তীর্থ।

বঙ্গদেশে যত তীর্থস্থান আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রনাথতীর্থ অতি প্রাচীন। দেবীপুরাণের চৈত্র মাহাত্ম্যে চণ্ডিকা খণ্ডে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। একদা ঋষিগণ সূতমুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কলিযুগে শিব কোথায় বাস করিবেন? তদুত্তরে সূতমুনি বলিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-দক্ষিণে লবণাম্বু সমুদ্রের উত্তর তীরে বিরূপরাক্ষে অগ্নিকোণে চন্দ্রশেখরের শিখর দেশে বারুণ বিল্বকোটরে পাষাণরূপী হইয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। তাহার দক্ষিণে মনোহর বাড়বানল, উত্তরে লবণাম্বু, পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ড, পূর্ব্বে মিষ্টবারি মন্দাকিনী, তন্মধ্যে অহিকুলভূষিত, বিভূতিমণ্ডিত শিব বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই বাড়বানলে অযোনিসম্ভবা সীতা স্বামী রামচন্দ্র ও দেবর

লক্ষ্মণের সহিত স্নান করিয়া পিতৃ-দেবতাসমুদয়কে তর্পণ করিয়াছিলেন। তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে আছে যে, চট্টগ্রামস্থ চন্দ্রশেখর আমার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ, ইনি তত্রত্য ভৈরব আর ভৈরবী ভবানী ব্যক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিলে পুনর্জন্ম হয় না। লিঙ্গপুরাণে আছে, চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী যে সীতাকুণ্ড রহিয়াছে, সকল কুণ্ড হইতে তাহা শ্রেষ্ঠ। এই সীতাকুণ্ডে সীতা পরীক্ষানল-তাপিতা হইয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যাসদেব সীতাকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বোত্তর দিকে বৃষকুণ্ড সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণে পাতালগামিনী সীতা অবস্থিতা আছেন, সেই কুণ্ডে সকল মানব যাইয়া স্নান করে। তাহারা অনায়াসে নারায়ণের পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ভারতে যে ৫১টী পীঠস্থান আছে, তাহাদের মধ্যে চট্টলে মায়ের দক্ষিণ বাহু পতিত হয়, তথায় চন্দ্রশেখর ভৈরব ও ভবানী নামে ভগবতী ব্যক্তরূপা। লিঙ্গপুরাণে আছে.—হে বরাননে! আমি লোকের হিতার্থ বঙ্গদেশস্থ চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে তোমার সহিত বাস করিব। আদি ব্রহ্মপুরাণে আছে,—হে শিবে। আমি কলিযুগে দেবতাদিগের সহিত চন্দ্রশেখরে বাস করিব। তথায় জীবের মৃত্যু হইলে তাহাদের মুক্তি হইবে। বারাহী তন্ত্রে আছে,—তথায় শিবপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন সহস্রধারা নামে একটী নদী আছে, তাহাতে স্নান ও দান করিলে লোকে শিবলোকে যায়। চন্দ্রনাথ পঞ্চক্রোশী। বারাহী তন্ত্র বলেন,—পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ড, পূর্ব্বে মন্দাকিনী, উত্তরে চম্পকারণ্য, দক্ষিণে বাড়বানল এই সমুদয় স্থান পঞ্চক্রোশের সীমা। এই সীমার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলে যে কোন প্রাণী বা মানব মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চন্দ্রনাথতীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। আখ্যায়িকাটি এই,—চট্টলের শিবপুরে এক ভগবদ্ভক্ত রজক ছিল। তাহার একটী গাভী ছিল, সেই গাভীটী পর্ব্বতের উপর বিচরণ করিতে যাইত।

রজক কখনও সেই দুগ্ধবতী গাভী দোহন করিয়া একবিন্দু দুগ্ধ পাইত না। রজক ইহার কোন কারণ ঠাওরাইয়া স্থির করিতে পারিত না। একদিন সে গাভী ছাড়িয়া দিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল, অদূরে সে একটী সুন্দর পাহাড় দেখিতে পাইল। দেখিল, সেই গাভী পাহাড়ের উপর যাইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল, আর অবিরামধারে গাভীর বাঁট হইতে দুধ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। রজক সেইস্থানে যাইয়া দেখে যে, একটী মনোহর শিবলিঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছেন। সেইদিন রাত্রে রজক স্বপ্নে দেখিল যেন ভগবান মহেশ্বর তাহাকে বলিতেছেন যে, তিনি ত্রিপুরাসুন্দরীর সহিত এই চন্দ্রনাথে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। রজক তাহা শুনিয়া তৎপরদিনই মহেশ্বরের সেবার জন্য একজন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিল। ক্রমে সেই রজক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া পড়িল। ত্রিপুরার মহারাজ এই সংবাদ পাইয়া তথায় যাইয়া শম্ভুনাথের যথাবিহিত পূজা করিলেন। যে স্থানে শম্ভুনাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই স্থান মহারাজের অধীন। মহারাজ লোকজন নিযুক্ত করিয়া শম্ভুনাথের চারিপার্শ্বে খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যত খোঁড়েন, কিছুতেই বিশ্বনাথের মূল আর পান না। অবশেষে মহারাজ স্বপ্ন দেখিলেন যে, মহাদেব তাঁহাকে বলিতেছেন, যতই কেন খোঁড় না, কিছুতেই তাঁহাকে সে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইতে পারিবে না। তখন মহারাজ সেই লিঙ্গের উপর একটী মন্দির রচনা করিয়া দিলেন। তদবধি শম্ভুনাথ জগতে প্রকটিত হইলেন।

আর একটী উপাখ্যান এই—একদা এক কাঠুরিয়া কাঠ কাটিবার জন্য চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গিয়াছিল। কাঠ কাটিতে কাটিতে তাহার কুঠারের ধার গেল, তখন সে একটি স্ফটিক প্রস্তর দেখিতে পাইল। সেই প্রস্তরে কুঠার শাণাইবার জন্য তাহা স্পর্শ করিবামাত্র তাহার লোহার কুঠারখানা সোণা হইয়া গেল। এই অয়স্কান্ত মণিই পার্শ্বনাথ শিব।

সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হইলে চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষ দেবের মন্দির দৃষ্ট হয়। তাহার পর ব্যাসকুণ্ড, এখানে বটুক ভৈরব ব্যাসদেব আছেন। বিরূপাক্ষে উঠিবার পূর্ব্ব পথে কোটিলিঙ্গ, ছত্রশিলা, কপিলাশ্রম দর্শন করা যায়। চন্দ্রনাথের নিকট পাতালে যাইবার রাস্তা আছে, তথায় হর-গৌরী, শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি আছেন। কলিকাতা হইতে রেলযোগে গোয়ালন্দ যাইয়া তথা হইতে ষ্টীমারে সীতাকুণ্ডে যাইতে হয়।

আদিনাথ ও চন্দ্রনাথতীর্থের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আরও অনেক আখ্যায়িকা আছে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান মহেশখালির পূর্ব্বাংশের পাহাড়ে শিকার করিতে যায় এবং একটী হরিণ শিকার করে। সেই হরিণকে জবাই করিবার উদ্দেশ্যে একখানা লৌহনির্ম্মিত ছুরি শাণাই-বার জন্য ঐ আদিনাথদেবের উপর স্পর্শ করা মাত্র লৌহ সোণা হইয়া যায়। পরে মুসলমান লৌহ সোণা হইল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া বাড়ী যায়। রাত্রে তাহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়, "আমি যেস্থানে ছিলাম, আমাকে সেই স্থানেই রাখিয়া আয়, আমি আদিনাথদেব।" মুসলমান স্বপ্নের প্রতি আদৌ গ্রাহ্য করিল না। ফলে তাহার পীড়া হয়, তখন সে ভয়ে মৈনাক পর্ব্বতের উপরে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ দ্বারা লিঙ্গের পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা করেন। ঘটনাক্রমে বর্ত্তমান সময় হইতে দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে সাধক গোমতি বন স্বপ্ন দেখেন যে, আদিনাথ তাঁহাকে মহেশখালিতে যাইয়া মোহান্ত-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার করিতে বলেন। গোমতি বন আদিনাথের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মহেশখালিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শম্ভুনাথের সম্বন্ধেও নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। শম্ভুনাথের অপর নাম প্রমদীশ্বর। এই শিবলিঙ্গটীর আকার কলার মোচার মত। ইঁহার চারিদিকে যোনিপীঠ।

৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে কোন গোঁসাই চট্টগ্রামে আসিয়া চন্দ্রনাথতীর্থ

আবিষ্কার করেন ও শ্রীশ্রীশম্ভুনাথের মূল মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি স্বয়ং মোহান্তপদে অধিষ্ঠিত হন। উক্ত মোহান্ত-মহারাজ-বংশের জনৈক মোহান্ত জোয়াল গিরিগোঁসাই শম্ভুনাথের দ্বিতীয় বিষ্ণুনাটমন্দির নির্ম্মাণ করেন। তৃতীয় মন্দির অর্থাৎ প্রথম প্রবেশের চৌচালা মন্দির ৺গোমতি বন মোহান্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তাঁহার শিষ্য রামরতন মোহান্ত শম্ভুনাথের বাড়ী যাইবার রাস্তা, গয়াকুণ্ড, তাহার সিঁড়ি ও চট্টগ্রাম সহরস্থ ৺করুণাময়ী কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করেন। কিশোর বন মোহান্ত-মহারাজ সমাধি গ্রহণ করার পর তাঁহার শিষ্য ৺যতীন্দ্র বন মোহান্ত-মহারাজ চন্দ্রনাথ, আদিনাথ প্রভৃতি তীর্থের গদি প্রাপ্ত হন। ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৫শে ফাল্গুন তারিখে ৺যতীন্দ্র বন বাবাজীকে শাস্ত্রানুযায়ী চেলা বা শিষ্যপদে অভিষিক্ত করা হয়। তিনি শম্ভুনাথ-বাটীস্থিত কিশোর বন মোহান্ত-মহারাজের সমাধি-মন্দির ও শিব স্থাপন করেন। ৺যতীন্দ্র বনের চেলা—শ্রীকুমুদ বন। কুমুদ বন বর্ত্তমানে চন্দ্রনাথ ও আদিনাথ দুই স্থানেরই মোহান্ত। কুমুদ বন ১২৪২ সনে সাত বৎসর বয়সে কিশোর বন মোহান্তের সঙ্গে চন্দ্রনাথ আগমন করেন। ১২৩৫ মঘী পৌষী মাসে কাশীধামের গণেশ মহল্লায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মিছির ও মাতার নাম গৌরী। বর্ত্তমানে কুমুদ বনের বয়স ৫০ বৎসর। ১২৭৫ মঘী ইনি চন্দ্রনাথ ও আদিনাথের মোহান্ত-পদ পান। ইঁহার চেলা শ্রীকেশব বন চন্দ্রনাথের ভাবী উত্তরাধিকারী।

চন্দ্রনাথের সেবায়েত-বংশ।

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে শ্যামরাজ্য হইতে পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম জিলার প্রান্তভাগ দিয়া যে শৈলমালা তরঙ্গায়িত হইয়া হিমালয়ের সহিত মিশিয়াছে। তাহার ক্রোড়দেশে ৺চন্দ্রনাথ তীর্থ অবস্থিত। সমুদ্র-

গর্ভ হইতে ১১০০ ফুট উচ্চ গিরিশৃঙ্গোপরি শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি। তাঁহার কটিদেশে অষ্টশক্তি অষ্টমূর্ত্তিসমন্বিত ৫১ পীঠের একাংশ শ্রীশ্রী৺ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, শক্তি ভবানী।

বারাহী তন্ত্রে দেখা যায়, মহামুনি ব্যাসদেব এই মহাতীর্থের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। যখন ব্যাসদেব নৈমিষারণ্য হইতে ঋষিগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইলেন, তখন তিনি স্বীয় যোগবলে ব্যাসকাশী তৈয়ারী করিলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে শিবের কাশী হইতে ব্যাসকাশী শ্রেষ্ঠ হইল। কারণ শিবের কাশীতে লোকের মোক্ষফল লাভ হয়, আর ব্যাসদেবের কাশী নির্ব্বাণফল প্রদান করে।

জগন্মাতা ব্যাসদেবের সাধনার প্রভাব দেখিয়া ছলনাপূর্ব্বক অভি-সম্পাত দ্বারা ব্যাসকাশীতে লোক দেহত্যাগ করিলে গর্দ্দভযোনি প্রাপ্ত হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন।

ব্যাসদেব ভগবতীর দ্বারা নূতন কাশী-সৃজনে বিফলমনোরথ হইয়া শিবের উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করিবার মানসে যখন কাশী পরিত্যাগ করিতেছিলেন তখন ভূতভাবন ভবানীপতি স্বীয় মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন—

"বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে।
অতএব তুমি চন্দ্রশেখরে গমন কর। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

তিনি প্রথমে যে স্থানে আসন স্থাপন করিয়া তপস্যারম্ভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে এখনও ব্যাসদেবের প্রস্তরময় মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তপঃ প্রভাবে ব্যাসদেব স্বীয় বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়াছিলেন। যথা—

"পরমাণুসমোজীবো যদি পঞ্চত্বমালভেৎ।
"সোঽপি নির্ব্বাণতাং যাতি কা কথা স্থূলদেহিনঃ।"

তন্ত্র ও পুরাণাদিতে দেখা যায়, অযোধ্যাধিপতি দশরথাত্মজ রামচন্দ্র বনভ্রমণকালে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চন্দ্রনাথ-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। মহর্ষি ভার্গব সীতাদেবীর স্নানের জন্য এইস্থানে একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কুণ্ড এখনও বিদ্যমান আছে। কুণ্ডের নামানুসারে স্থানটীর নাম সীতাকুণ্ড হইয়াছে।

চট্টগ্রাম যখন ত্রিপুরারাজ্যের অংশ ছিল তখন চন্দ্রনাথতীর্থের প্রচার হয়। রাজমালা-পাঠে ইহার বিবরণ জানা যায়।

তীর্থ-প্রচার-সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী আছে যে, প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে সীতাকুণ্ডের এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে শিবপুর নামক গ্রামে জনৈক দরিদ্র রজক বাস করিত। রজকের একটি কামধেনু ছিল, প্রত্যহ গোচারণের জন্য রজক ধেনু সহ পাহাড়ে যাইত, গাভীটীকে ছাড়িয়া দিয়া সে কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক ধেনুসহ বাড়ী ফিরিত। একদিন গাভীটি গভীর বনে হারাইয়া যায়। চিরদিন হিন্দুরা গোকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সে গাভীটিকে না পাইয়া বিষম বিপদে পড়িল। অরক্ষণ-জনিত গো-পালনের জন্য কি করিতে হইবে তাহার জন্য ব্যাকুল চিত্তে বর্ত্তমান সেবায়েত-বংশের পূর্ব্ববর্ত্তীকে ইহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন। ব্রাহ্মণ যাহা বলিলেন সেই অনুসারে রজক প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করিল। এই সময়ে এক কাঠুরিয়া সংবাদ দিল যে, পূর্ব্বদিন সে এক পর্ব্বতোপরি গাভীটিকে নিজে দেখিয়াছে। এই সংবাদে রজক গাভীর উদ্দেশে পর্ব্বতপর্য্যটনকালে দেখিতে পাইল, গাভীটি পর্ব্বতোপরি দাঁড়াইয়া আছে এবং স্তন হইতে ক্ষীরধারা প্রবাহিত হইয়া স্থানটিকে কর্দ্দমাক্ত করিতেছে। বিশেষ কৌতূহলী হইয়া কারণানুসন্ধানে দেখিল, একটি সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি। ইহা কোন দেবতা হইবে, এই ধারণা করিয়া সেবায়েত-বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী রাধাবল্লভকে

প্রথম দেখান। তিনি অষ্ট-মূর্ত্তি অষ্টশক্তি-সমন্বিত বিগ্রহ দর্শনমাত্রেই চিনিতে পারিয়া সেই দিন হইতে পূজা আরম্ভ করিলেন। অদ্যাবধি তাঁহারই বংশধরগণ সেবায়েতরূপে উক্ত বিগ্রহের অর্চ্চনাদি করিতেছেন।

শিবমূর্ত্তিটী তাঁহাদের "অধিকারে" আছে বলিয়া তাঁহারা অধিকারী নামে পরিচিত। বর্ত্তমান সময় সেবায়েত পাণ্ডারা ৮ ঘর হইয়াছেন।

তীর্থ-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও হিন্দুসাধারণের আগমনে যখন লোকসমাগম অধিক হইতে লাগিল তখন সেবায়েত-বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী রাধাবল্লভ সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা এবং অতিথি-সৎকারাদি কার্য্য কষ্টসাধ্য মনে করিয়া, বিশেষতঃ গৃহীদের পক্ষে শিবের কোন দ্রব্য গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া, ভোগলালসাহীন জিতেন্দ্রিয় দশনামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন উপযুক্ত লোক খুঁজিতে লাগিলেন। চট্টগ্রাম জিলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও পাণ্ডা-বংশের অভিপ্রায়ানুযায়ী গিরিসম্প্রদায়ভুক্ত বানারস গিরিকে মোহান্ত নিযুক্ত করেন। সেবায়েত পাণ্ডা আপন পারিশ্রমিক-স্বরূপ প্রণামী হইতে দুই আনা অংশ নির্দ্ধারিত করিয়া এবং শক্তিপূজার যাবতীয় দ্রব্যাদি নিজে রাখিয়া অবশিষ্ট মোহান্তের তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাবধি পাণ্ডারা প্রণামী হইতে উক্ত রূপ অংশ পাইয়া থাকেন

পাণ্ডা-বংশে শ্রীযুক্ত মহাভারত পাণ্ডা অন্যতম। তিনি চক্রশালা পরগণার অন্তঃপাতী সারোয়াতলা গ্রামে ১৭৭৬ শকাব্দার বৈশাখ মাসের ২৫শে তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামতনু; মাতার নাম উষাসুন্দরী দেবী। নিজ দেশে তিনি ভারতচন্দ্র অধিকারী নামে পরিচিত। ভারতচন্দ্রের ৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি পিতৃহীন হন। পরে একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ২৪ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিলে, সংসারে সান্ত্বনা দিতে মাতা ও বৃদ্ধা পিতামহী ভিন্ন কেহ ছিল না। ভারতচন্দ্রের শরৎচন্দ্র নামে এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, সে চারি

বৎসর বয়সে সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে গমন করে। পিতার মৃত্যুর পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চারি বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। সংসারে অভিভাবক-হীন অল্পবয়স্ক বালক নাবিক-বিহীন তরণীর মত চলিয়া অল্প দিনের মধ্যে বহু টাকা ঋণ করিয়া ফেলিল। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মৃত্যুতে উত্তমর্ণগণ সুযোগ বুঝিয়া যাহা কিছু ছিল সমস্ত লইয়া যাওয়ার পরেও প্রায় ৭ হাজার টাকা ঋণ রহিয়া গেল। ভারতচন্দ্রের দাঁড়াইবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত রহিল না। ৮০৬ শকাব্দে ময়মনসিংহ জিলার মুক্তাগাছার স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের মাতা স্বর্গীয় রাণী বিদ্যাময়ী দেব্যা ৺চন্দ্রনাথ দর্শনোপলক্ষে ভারতচন্দ্রের পর্ণকুটীরে বাস করেন। ভারতচন্দ্রের সাংসারিক যাবতীয় অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তিনি তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ঋণমুক্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা-বলে এখন দশজনের একজন হইয়াছেন। পাণ্ডাগিরির আয় ব্যতীত ৪।৫ হাজার টাকার ভূসম্পত্তি নিজে করিয়াছেন। শৈশবকাল অতিকষ্টে অতিবাহিত হওয়াতে দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে তাঁহার মত কাহাকেও দেখা যায় না। দীন-দুঃখীকে ও বিপন্ন ব্যক্তিকে অযাচিতভাবে তিনি সাধ্যাতীত সাহায্য করিয়া থাকেন।

বিদ্যার্থীকে সাহায্য করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ব্রত। পাণ্ডা-বংশে ভারতচন্দ্রের মত বয়োবৃদ্ধ স্বধর্ম্মনিরত ন্যায়নিষ্ঠ আচারবান সাত্ত্বিক লোক দ্বিতীয় নাই। ভারতচন্দ্র শৈশবে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া হিন্দুদিগের নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় কার্য্যাদি শিক্ষা করেন।

ভারতচন্দ্রের দ্বিতীয় সহোদর না থাকাতে এবং শরৎচন্দ্র নামক কনিষ্ঠ সহোদরের অভাবে ৺গোপীনাথ পাণ্ডা মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শরচ্চন্দ্রকে

তিনি নিজ সহোদরতুল্য স্নেহ করিতেন। শরচ্চন্দ্রও তাহাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত ভক্তি করিত। তীর্থের যাবতীয় কার্য্যাদি সেই ভ্রাতৃ-যুগলের প্রাণের জিনিষ। যখন যে কোন কার্য্য করিতে হইত একে অন্যের পরামর্শ না লইয়া করিত না। তীর্থসম্বন্ধে মোহান্তের সহিত সেবায়েত-বংশের যে সমস্ত মনোমালিন্য হইয়াছিল তাহারই মূল এই ভ্রাতৃ-যুগল। আজ আমরা তীর্থের যে কিছু উন্নতি দেখিতেছি তাহা এই দুই জনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ফল। তীর্থের যাবতীয় অভাব-দূরীকরণের প্রধান নায়ক এই দুই মহাশয়। শরৎচন্দ্র আজ শান্তিময়ের কোলে চির শান্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহার বৃদ্ধ ভ্রাতা এখনও জরাজীর্ণ দেহ লইয়া যতদূর সম্ভব তীর্থকার্য্যে জীবনপাত করিতেছেন।

ভারতচন্দ্রের দুই পুত্র যোগেন্দ্রলাল ও নগেন্দ্রলাল। তাহারাও পিতার ন্যায় বিনয়ী, শান্ত ও আচারবান। ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে তাহারাও দক্ষ। দর্শনার্থী যাত্রিবৃন্দের যাবতীয় কার্য্যাদি সম্বন্ধে পারদর্শী। ইঁহাদের ন্যায় সজ্জনই তীর্থ-পুরোহিত ও তীর্থ-গুরু হইবার উপযুক্ত পাত্র।

রাধাবল্লভ
ঘনশ্যাম
শ্যাম
মণিরাম
বলরাম
লক্ষ্মীনারায়ণ
নন্দরাম
শ্রীধর
রামশঙ্কর
রামনাথ
বিষ্ণুরাম
মধুসূদন
কাশীনাথ
রামসুন্দর
রামহরি
রামতনু
ফকিরচাঁদ
রামকান্ত
চন্দ্রশেখর
গদাধর
দ্বারিকানাথ
গণেশচন্দ্র
কৃষ্ণচন্দ্র
শ্রীভারতচন্দ্র
শ্যামলাল
শ্রীমতিলাল
শ্রীনগেন্দ্র
শ্রীযোগেন্দ্র
শ্রীশিবলাল
শ্রীশ্যামলাল
শ্রীরামনারায়ণ
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ
রামপ্রসাদ
কালীচরণ
রামমাণিক্য
সদাশিব
রামশরণ
অযোধ্যারাম
গোকুল
হরচন্দ্র
জগচ্চন্দ্র
নবচন্দ্র
বৈদ্যনাথ
গোপীনাথ
অখিল
শ্রীকৃষ্ণকুমার
শ্রীকালীকুমার
শরৎচন্দ্র
শ্রীহরকিশোর
প্রসন্ন
শ্রীমতিলাল
শ্রীযতীন্দ্রনাথ
শ্রীমধুসূদন

নাকাশিপাড়া সিংহরায় জমিদার-বংশ।

পলাশী যুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্বে পশ্চিমে রাজপুতনা হইতে রামরাম সিংহ নামক জনৈক বারওয়ার রাজপুত বহু লোকজন-সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান নাকাশি-পাড়াই তাঁহাদের স্থাপিত বাসভূমি এবং এই রামরাম সিংহই বর্ত্তমান নাকাশিপাড়ার জমিদার-বংশের পূর্ব্বপুরুষ। ইঁহারা সূর্য্যবংশসম্ভূত সাবর্ণগোত্রীয় রাজপুত ক্ষত্রিয় জাতি। বঙ্গদেশে আসিয়া রামরাম সিংহ শৌর্য্য-বীর্য্য প্রভৃতি গুণে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার এক প্রপৌত্র আগম সিংহের শৌর্য্য-বীর্য্য-দর্শনে নদীয়ার মহারাজা এরূপ বিমুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁহাকে সাদরে দেহরক্ষী পার্শ্বচর নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতেই বর্ত্তমান নাকাশিপাড়ার জমিদারীর সৃষ্টি। উক্ত নদীয়ার মহারাজা কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া কয়েকখানি মহাল তাঁহাকে উপঢৌকন দেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা ভৈরব সিংহকে এই মহালের ও অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। তিনিও অসাধারণ ক্ষমতাবলে ও কার্য্যনিপুণতায় ক্রমশঃ জমীদারীর উন্নতি সাধন করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন। তাহার পর হইতেই ক্রমশঃ তিনি তাঁহার জমিদারি নদীয়া, যশোহর, খুলনা, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ এই পাঁচটি জেলায় বিস্তৃত করেন। বঙ্গাব্দ ১১৯৮ সালে এই বিপুল জমিদারির সৃষ্টি। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইঁহারা এখানে প্রায় ২০০ বৎসর কাল বংশ-পরম্পরায় বাস করিতেছেন।

বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই এই জমিদারী সম্পূর্ণ বিস্তৃত হয় ও এই জেলার মধ্যে ইঁহারাই অর্থের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এমন কি তৎকালীন বহু বড় বড় ধনী লোক এই নাকাশিপাড়া জমিদারের নিকট হইতে বহু অর্থ ধার করিতে আসিতেন। তৎকালীন এই নাকাশিপাড়া

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সিংহ রায়
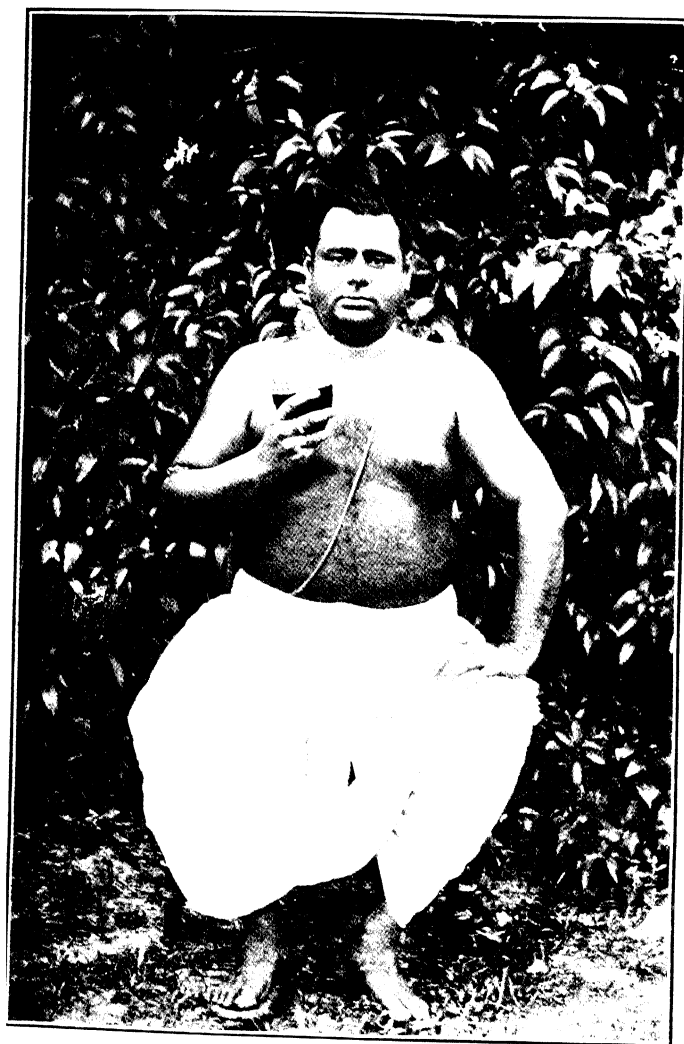
স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

শিরেন্দ্রবাবু,   সমীরেন্দ্রবাবু,   শচীন্দ্রবাবু

শিবেন্দ্রবাব ভোলাবাব শচীন্দ্রবাব

ন'কাসি-পাড়াবাটীর সম্মুখ দৃশ্য।
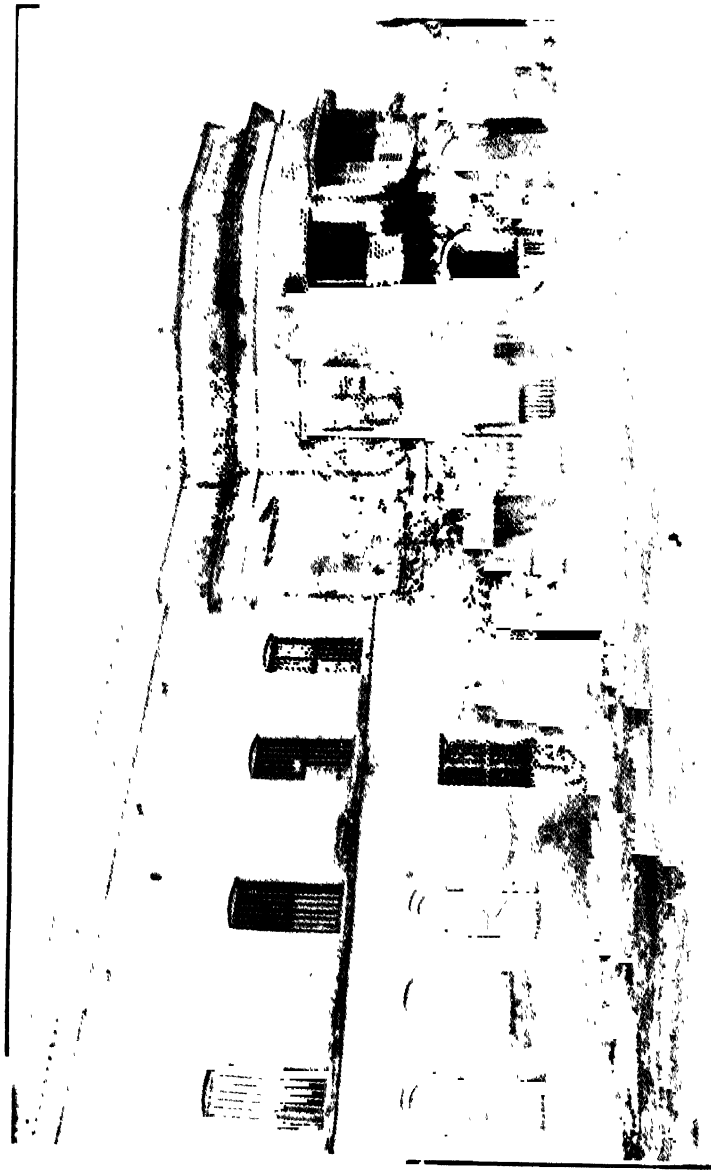
ধনাগারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তৎকালে তাঁহারা এ দেশে প্রসিদ্ধ ধনকুবের বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু কালের এমনই গতি যে, তখন হইতেই গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়। এই সময়ই নাকাশিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ কেশববাবুর সময়। কেশববাবু বাঙ্গালাদেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। বাঙ্গালাদেশে আবাল-বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কেশব বাবুর নাম জানিত। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ অশ্বারোহী বীরপুরুষ ছিলেন। তৎকালীন বিদ্রোহী পলাশী পরগণার সমুদয় মহাল তিনিই স্বয়ং দমন করিয়া এই দেশে শান্তি সংস্থাপন করেন। তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। তাহার এক একটী আশ্চর্য্য লড়াইয়ের কথা আবাল-বৃদ্ধ পর্য্যন্ত জ্ঞাত ছিল এবং অদ্যাপি বৃদ্ধদের মুখে তাহার অসাধারণ ক্ষমতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি প্রত্যহই অশ্বারোহণে ৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। তিনি নিজ হস্তে প্রত্যহই গঙ্গাস্নানান্তর শিব পূজা করিতেন। চল্লিশ পঞ্চাশটী হাতী, এক শত অশ্ব ও তিনশত পালোয়ান তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিত।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ দেওয়ান বাহাদুর স্বর্গীয় হরিনাথ রায় ও তাহার ভ্রাতা সবজজ স্বর্গীয় রায় বাহাদুর শ্যামচাঁদ রায় কেশব বাবুর দৌহিত্র। তাহারা শৈশবে এই নাকাশিপাড়াতেই লালিত পালিত হয়েন।

গৃহবিবাদের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বঙ্গাব্দ ১৮২৫সালে এই বিপুল সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং ১২৭৬ সালের মধ্যেই কেশব বাবুর খুল্লতাত-ভ্রাতা কেবলমাত্র ডোমনবাবু ভিন্ন অন্যান্য সকল অংশীদার নিঃস্ব হইয়া পড়েন। ঠিক এই সময়েই এই ডোমনবাবু অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তদীয় নাবালক পুত্র কৃষ্ণনাথ সিংহরায় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয় ও কাশিমবাজারের স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর সহায়তায় ও পরামর্শে তাঁহার সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিতে প্রয়াস পান। কৃষ্ণনাথ সিংহ রায় কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি

ছিল, তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। প্রতি বৎসর তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় নাকাশিপাড়ায় মাসাধিককাল অবধি একটা বিরাট হরিসভার অধিবেশন হইত। এই সভায় বহুদূর হইতে, এমন কি কাশী হইতে বহু পণ্ডিতের আমদানী হইত। তিনি সর্ব্বদা সাধু সঙ্গে বাস করিতে ভালবাসিতেন। ৺কাশীধামের স্বর্গীয় ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট তিনি প্রায়ই যাইতেন ও পরমার্থ শিক্ষালাভ করিতেন। তিনি ষট্‌চক্র, ভক্তি ও ভক্ত প্রভৃতি কতিপয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং ঐ পুস্তকগুলি তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার একমাত্র অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল এই জমিদারী পরিচালিত করেন। তিনি এই সময়ের মধ্যে তাঁহার পিতৃদত্ত সম্পত্তির আয় নিজ যত্নে দ্বিগুণের অধিক অবস্থায় পরিণত করেন। আধুনিক জমিদারদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় একবারে বিলাসিতাশূন্য বুদ্ধিমান কর্ম্মঠ ব্যক্তি অতি বিরল। তিনিও একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং ভারতবর্ষের বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক তীর্থেই বহু ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের ভোজনে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি নিজগ্রামে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার দুঃস্থ স্বজাতিদিগের শিক্ষার্থে এককালীন ৮০০০৲ টাকা দান করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজে ৩টী Free Studentship ও একটী Free Boardership প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কৃত-শিক্ষার্থীদিগের প্রতিও তাঁহার বহু যত্ন ছিল। তিনি এই কার্য্যে বহু মেডেল দান করিতেন। তিনি নবদ্বীপ Maternity House স্থাপনেও বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন ও তিনি তাহার একজন সভ্য ছিলেন। তাঁহার নিজ জমিদারীতে তিনি অনেকগুলি পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। তিনি নিজগ্রামের ও জমিদারীর উৎকর্ষসাধনে সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সহর কিংবা বিদেশবাস ভালবাসিতেন না।

তিনি লোকজনকে ভোজন করাইতে বড় ভালবাসিতেন। গো-সেবায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি দুঃস্থদিগকে সেবা ও সাহায্য করি-

তেন এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তাঁহার জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল এবং এই জন্যই তাঁহাকে বহুবার বিপন্ন হইতে ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতা কালীঘাটের গঙ্গাতটে ইহলীলা শেষ করেন। এই সময় তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শিবেন্দ্রনাথ ও শচীন্দ্রনাথ পর্য্যায়ক্রমে ২২ ও ২০ বৎসর বয়সে এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। ইঁহারা দুই ভ্রাতা গ্রাম্যস্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া পরে গৃহে পড়িয়া শিক্ষা শেষ করেন। বর্ত্তমানে ৺দেবেন্দ্র বাবুর প্রথম পুত্র শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ই এই জমিদারীর তত্ত্বাবধান করেন। তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য স্বগ্রামে একটী Agricultural Farm স্থাপন করিয়াছেন। তিনি নদীয়ার District Agricultural Associationএর একজন সভ্য। তাঁহার সদাশয়তার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে Hony. Magistrate নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি Nadia Local Board, District Board, Indian Red Cross Society প্রভৃতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দেশের ও দশের কার্য্যে তিনি সর্ব্বদা উৎসুক এবং তিনি খুব লোকপ্রিয়। তিনি তাঁহার প্রজাদের পশুচিকিৎসার জন্য নিজগ্রামে তাঁহার পিতাঠাকুরের নামে পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়েরও বহু উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত উদারচেতা। দানশীলতার জন্য তিনি ইতিমধ্যে প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বহু দীন ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ভদ্রবিধবা এবং দরিদ্র ছাত্রদের মাসোহারার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। গুপ্ত দানও তাঁহার অনেক আছে। তিনি সুচারুভাবে প্রজাপালন করিবার মানসে নিজগ্রামে স্থানীয় ভদ্র যুবককে লইয়া একটী সেবক-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। নদীয়ার Honourable Maharaja Bahadur, বিভাগীয় Commissioner ও Director of Agriculture প্রভৃতি মহোদয়গণ নাকাশিপাড়ায় আগমন করিয়া তাঁহার এই সমস্ত কার্য্যাবলী দর্শনে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নদীয়ার মহারাজাবাহাদুর তাঁহার এই সমস্ত কার্য্য দর্শনে এত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের হস্তের একটী অঙ্গুরী

খুলিয়া তাঁহার হস্তে পরাইয়া দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অশ্বারোহণ, টেনিস খেলা ও শিকার সম্বন্ধে খুব পারদর্শী। তিনি শিকারোপলক্ষে বঙ্গদেশের নানাস্থান, উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও আসাম প্রভৃতি প্রদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি তালচীড়, ঢেঙ্কানল প্রভৃতি রাজাদের সহযোগে বামড়ায় রাজঅতিথি হইয়া কয়েকটী Royal Tiger ও Bison এবং পুরীর রাজা ও নাটোরের কুমার বীরেন্দ্রনাথ রায়ের সহিত পুরীতে শিকার করেন ও তৎপূর্ব্বে উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্য ভাগে একটী Royal Tiger শিকার করিয়া উড়িষ্যায় Lieutenant Governor গেট সাহেবকে উহার চামড়া উপঢৌকন প্রদান করেন। তিনি নিজ হস্তে তাঁহার ছোট ভ্রাতা শচীন্দ্রনাথ ও জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভোলানাথ সিংহ রায়কে শিকার শিক্ষা দিয়াছেন ও বর্ত্তমানে একটী শিকার সমিতি সংগঠিত করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, তিনি বহু জেলার একজন সুদক্ষ শিকারী। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ অনুরক্ত। তিনি ২১ বৎসর বয়সে দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। তিনি সঙ্গীতে বিশেষ আস্থাবান। ইনি প্রফেসর সতীশচন্দ্র বাগচী মৃদঙ্গরত্ন মহাশয়কে রাখিয়া মৃদঙ্গ ও তবলা এবং প্রফেসর রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে রাখিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছেন। শিকার সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। তিনিও অনেক ব্যাঘ্র, হরিণ ইত্যাদি শিকার করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর সমস্ত জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিজের বিদ্যানুশীলন ও শিকার কার্য্যে রত থাকেন। বর্ত্তমানে শিবেন্দ্রবাবুর একটী পুত্র ও একটী কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শচীন্দ্রের একটী মাত্র কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে শিবেন্দ্রবাবুর বয়স ২৬ বৎসর। এই নাকাশিপাড়া ষ্টেটের বর্ত্তমান আয় অন্যূন ৮০ হাজার টাকা।

নাকাসি-পাড়া বাটীর অন্দর মহল

নাকাশিপাড়া জমিদার বংশের কুরচিনামা।
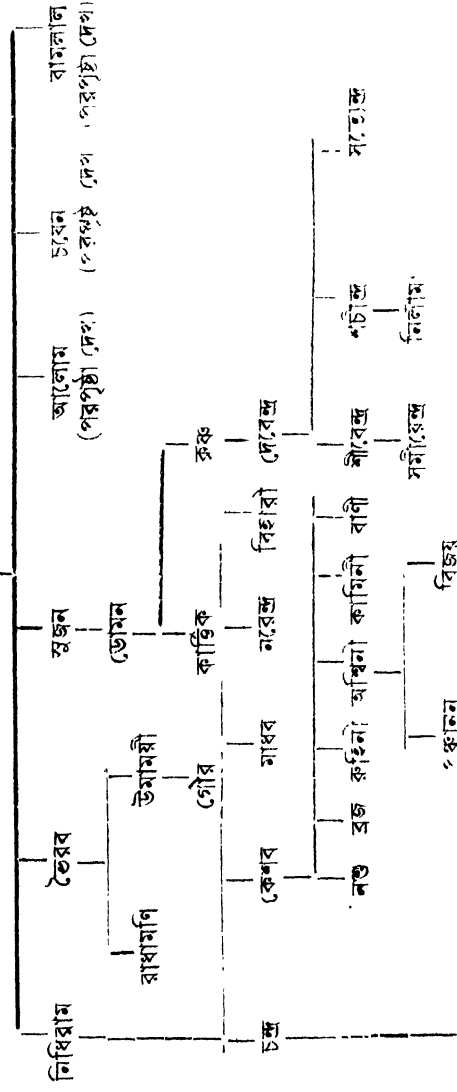
চৌদ্দরশীর জমিদার বংশ।

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত সহর হইতে ২৩ মাইল পূর্ব্বদিকে একটী পুলিশ ষ্টেশন, ষ্টেশনের নাম সদরপুর; সদরপুর ষ্টেশন, সতররশী গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। ঐ ষ্টেশনের সন্নিকটে দক্ষিণ দিকে পোষ্টাফিস, থানার উত্তর দিকে সাহার বন্দর নামে বহুকালের একটী বন্দর, বন্দরটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। ঐ বন্দরের উত্তরভাগে ভুবনেশ্বর নদ এককালে প্রবল ভাবে প্রবাহিত ছিল। এক সময়ে ফরিদপুর যাইবার ষ্টীমার লাইনের ঐ স্থানে একটী ঘাট ছিল, ভুবনেশ্বর কালে যখন রীতিমত প্রবাহিত ছিল তখন নানা স্থান হইতে বিবিধ প্রকার জিনিষপত্র নৌকাযোগে আমদানী রপ্তানী হইত, কিন্তু কালক্রমে ভুবনেশ্বর মজিয়া যাওয়ায় এখন আর ঐ অঞ্চলের সমৃদ্ধি নাই। যে নদ ভুবনেশ্বর কোন কালে মৎস্য কুম্ভীর ইত্যাদি জলজন্তু দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, আজ তাহার বক্ষে স্থানে স্থানে বিশাল চর পড়িয়া শস্য পূর্ণ চাষের জমি হইয়াছে। এখনও জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত নৌকা চলাচল হয়, কিন্তু তারপর জলাভাবে আর ঐরূপ সম্ভব হয় না! ভুবনেশ্বরের এই শোচনীয় পরিবর্ত্তনে দেশের অনেক প্রকার অসুবিধা সংঘটিত হইয়াছে।

উক্ত থানা ও বন্দরের পশ্চিম দিক দিয়া একটী রাস্তা পুখরিয়া পর্য্যন্ত যাইয়া ভাঙ্গা ষ্টেশন হইতে ফরিদপুরের বড় রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। সতেররশী গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে চাররশী, সতেররশী আটরশী, আড়াইরশী সাড়েসাতরশী প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। তাহার পশ্চিমে বাইশরশী থানার পশ্চিম দিয়া রাস্তাটী ঐ সকল গ্রামের প্রান্ত ও মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। থানা হইতে ১ মাইল

পশ্চিমে রাস্তার উপর একটী বাজার আছে, এই বাজারের প্রকাশ্য নাম চৌদ্দরশীর বাজার। বাজারটীতে দোকানপসার বেশ আছে, বাজারে দুগ্ধ মৎস্য তরিতরকারী ইত্যাদি যথেষ্ট পাওয়া যায়। ঐ বাজার বাইশরশীর বাবুদিগের উভয় হিস্যার এজমালী বাজার। বাজারের উন্নতিকল্পে বাবুদিগের সমবেত চেষ্টা বেশ আছে। ঐ বাজারে বর্ত্তমানে কাপড়ের দোকান, বেনে দোকান, মনোহারী দোকান, ময়রার দোকান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আবশ্যকীয় তৈজসের দোকান আছে। এই হাটে দেশীয় কারিকর ও তাঁতিদিগের তৈয়ারী বহু কাপড় আমদানী রপ্তানী হয়। এই বাজারটী থাকায় নিকটবর্ত্তী বহুগ্রামের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বহুকাল পূর্ব্বে ফরিদপুর জিলায় মকুটচর গ্রাম নিবাসী রঘুরাম সাহা নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে বরিশাল জিলার অন্তর্গত কালইয়া নামক স্থানে যাইয়া এক সামান্য মুদীর দোকান করিয়া ব্যবসায় করিতেন। এই স্থানটী তখন প্রায়ই গড়াবাদী জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং মানুষের বসতিও বিরল ছিল। জঙ্গলে বাঘ, জলে কুম্ভীর, হাঙ্গর প্রভৃতি জন্তুর উপদ্রবে, ঐ দেশে লোক খুব কমই যাইত। তখন ঐ অঞ্চলে ষ্টীমার চলাচল আরম্ভ হয় নাই। আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া এমন কি খাবার জল পর্য্যন্ত নৌকায় লইয়া নৌপথে ঐ অঞ্চলে এতদ্দেশের লোক কেহ কেহ ব্যবসাবাণিজ্য করিতে যাইতেন। সাহাজী মহাশয়ও সেখানে গিয়া ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন; তিনি শুধু দোকানে বসিয়া জিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, কালইয়ার নিকটবর্ত্তী যে সকল হাট ছিল, তথায় হাটবারে গিয়া মুদী দোকান করিতেন। তখন ঐ দেশে ব্যবসায়ে বেশ উপার্জ্জন ছিল, ভগবান কৃপায় তাঁহার দিন দিন বেশ উন্নতি হইতে লাগিল। কথায় বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এখানে তাহার বেশ প্রমাণ দেখা যায়।

কিছুদিন পরে সাহাজী মহাশয় তাঁহার বড় পুত্রটীকে তথায় লইয়া গেলেন, পুত্রের নাম উদ্ধব চন্দ্র সাহা। উদ্ধব চন্দ্রের চেহারা বড়ই সুন্দর ও মনোরম ছিল, তাঁহাকে দেখিলে সকলেরই ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। উদ্ধবকে লইয়া পিতা উৎসাহের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে যখন উদ্ধব চন্দ্র সে স্থানের বিষয় বেশ অবগত হইলেন, তখন সাহাজী কোন কোন দিন উদ্ধবকে দোকানে রাখিয়া অন্যত্র হাট করিতে যাইতেন।

মানুষের ভাগ্যচক্র কি ভাবে পরিবর্ত্তন হয় তাহা কিছুই বুঝিবার সাধ্য নাই। কালইয়ার দোকানের অনতিদূরে এক বটবৃক্ষ মূলে হঠাৎ একদিন তেজঃপুঞ্জশালী এক সন্ন্যাসীকে দেখা গেল। সন্ন্যাসী ধূনী জ্বালাইয়া দিন রাত্রি ঐ বটমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার নিকট লোক সমাগম হইতে লাগিল। আবাল বৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে দেখিতে যাইত এবং অনেকেই ইচ্ছা করিয়া ফল দুগ্ধ প্রভৃতি দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত। উদ্ধবের পিতা সন্ন্যাসীকে খুব ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার নিকট যাইবার সময় উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। পিতা পুত্রে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী উদ্ধবের দিকে সকরুণ নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন; সন্ন্যাসী লোকের সহিত বড় কথা বলিতেন না।

এক দিন উদ্ধবের পিতা দূরে হাট করিতে গিয়াছেন, উদ্ধব দোকানে একাকী; উদ্ধবের ইচ্ছা হইল যে একবার সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আসেন। উদ্ধব সন্ন্যাসীর নিকট পঁহুছিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী উদ্ধবকে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি আমার কাছে এস।" উদ্ধব ভাবিয়া চিন্তিয়া সন্ন্যাসীর নিকট গেলেন, সন্ন্যাসী অনিমেষ লোচনে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বাবা। তোমার ডাইন হাতখানা দেখি।" উদ্ধবচন্দ্র সভয়ে সন্ন্যাসীর কথা মত ডাইন হাত

প্রসারিত করিলে, হাত খানা ধরিয়া সন্ন্যাসী স্থির ভাবে সব দেখিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, "বাবা! তুমি বড়ই ভাগ্যবান, তোমার হাতে যে সব চিহ্ন দেখিলাম তাহা মহাপুরুষদিগেরই থাকে, তুমিও চেষ্টা করিলে কালে বিশেষ উন্নতি করিতে পারিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে সত্বর তোমার একটী কাজ করিতে হইবে, তোমার দীক্ষা হওয়া আবশ্যক, গুরু বিনা কোন কাজ সিদ্ধ হয় না। এ বিষয়ে আমি অধিক আর কি বলিব, বোধ হয় তোমার জন্যই আমার এই দুর্গমস্থানে আগমন হইয়াছে। অতএব আগামী কল্যই তুমি আমার নিকট দীক্ষিত হইবে। এজন্য তোমার বিশেষ কিছু যোগাড় করিতে হইবে, না, যাহা কিছু আবশ্যক তাহা আমিই করিয়া লইব, তুমি আজকার দিন নিরামিষ এক বেলা আহার করিবে; এ সম্বন্ধে তোমার পিতার নিকট কিছু প্রকাশ করিও না।"

উদ্ধব সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে দোকানে ফিরিয়া যাইলেন। উদ্ধব ভাবিতে লাগিলেন "আমি এই অল্প বয়সে দীক্ষিত হইয়া গুরুদেবের উপদেশ প্রতিপালন করিতে পারিব কি? দীক্ষা হইলে তো এ ভাবে যখন তখন খাওয়া চলিবে না, বাবাকে না বলিয়া কাজ করিতে হইলে সেই বা কেমন কথা।" এইরূপ চিন্তায় দিন অতিবাহিত হইল। সন্ন্যাসীর আদেশ অনুসারে নিজে নিরামিষ পাক করিয়া অপরাহ্নে আহার করিলেন। পিতা হাট হইতে আসিয়া রান্নার উদ্যোগ করিলে, উদ্ধবচন্দ্র বলিলেন "বাবা! আমার ক্ষুধা নাই, আমি আজ রাত্রিতে খাইব না। আপনার নিজের জন্য যাহা হয় কিছু পাক করুন।" তৎপরে তাহাই হইল।

রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় উদ্ধব এইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন—একটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ যেন তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতে আসিয়াছে, উদ্ধব যেন আর এখন সামান্য দোকানদার নহেন, যেন কত বড় একজন

ধনী, দোকানপসার খুব বাড়িয়াছে। জমিজমা যথেষ্ট হইয়াছে, এবং তিনি যেন একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া পড়িয়াছেন। এই দেখিতে দেখিতে উদ্ধবের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। স্বপ্নটা দেখা অবধি যেন উদ্ধবের মনে আরও কত কথা উদয় হইতে লাগিল, উদ্ধব তাহার কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না।

রাত্রি প্রভাত হইতে উদ্ধবের পিতা প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া তাগাদায় বাহির হইলেন এবং পুত্রকে বলিয়া গেলেন, "আজ একটু সকালেই হাটে যাইতে হইবে, তুমি আমার জন্য তাড়াতাড়ি কিছু সিদ্ধপোড়া করিয়া খাবার প্রস্তুত করিও, আমি তাগাদা হইতে আসিয়া আহার করিয়া যেন সকালেই হাটে যাইতে পারি।" উদ্ধবচন্দ্র পিতার আদেশ মত খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। পিতা তাগাদা হইতে আসিয়া স্নানান্তে আহারে বসিলেন এবং পুত্রকে বলিলেন, "তুমি কাল রাত্রে কিছু খাও নাই; এখন দুটো ভাত খাইয়া পরে বেলা হইলে দুবেলার উপযুক্ত রান্না করিয়া খাইও।" উত্তরে উদ্ধব সম্মতি জানাইয়া পিতার আচমনের জল, পান, তামাক ঠিক করিয়া দিয়া দোকান পসার গুটাইয়া ঠিক করিলেন। উদ্ধবের পিতা আচমনান্তে পান তামাক খাইয়া নৌকাযোগে হাটে চলিয়া গেলেন।

পিতা হাটে চলিয়া যাওয়ার পর উদ্ধব স্নান করিয়া শুভক্ষণে সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন। যাইবার সময় উদ্ধব মনে মনে চিন্তা করিলেন "গুরুদেব আমাকে মন্ত্র দিয়া আমার দেহ পবিত্র করিবেন, আমি গুরু দক্ষিণা কি দিব!" এই চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ স্মরণ হইল—"অনেক দিন হইল বাবা, আমাকে মিঠাই খাইবার জন্য একটা টাকা দিয়াছিলেন, সেই টাকাটা আমি গুরু দক্ষিণা দিব"। এই স্থির করিয়া বাক্স খুলিয়া একটা নেকড়ায় বাঁধা সেই টাকাটা লইয়া অতি আনন্দে সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "আমি তোমাকে না দেখিয়া এতক্ষণ

বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলাম।” উদ্ধব চন্দ্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “দেব। পিতাঠাকুর এই মাত্র হাটে গিয়াছেন, তাঁহার জন্যই আমার আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে।” এই কথার পর সন্ন্যাসী বলিলেন “তোমার আসিবার পূর্ব্বেই আমি তোমার এদিকের কাজ সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, তুমি আমার পাশে এসে বসো, শুভক্ষণে তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিব।” উদ্ধব চন্দ্র ধীর পদবিক্ষেপে যাইয়া সন্ন্যাসীর পার্শ্বে বসিলেন এবং সন্ন্যাসী শুভযোগে উদ্ধবের কর্ণমূলে বীজ মন্ত্র প্রদান করিলেন।

সন্ন্যাসী এই উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ রোপণ করিয়া কতক্ষণ ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া পরে উদ্ধবকে তাঁহার কর্ত্তব্য বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া সব বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন “তুমি এই মন্ত্র স্মরণ রাখিতে বিশেষ সাবধান হইবে, যেন কোন মতে বিস্মরণ না হও, আমি এখানে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না। আমি তোমাকে যে উপদেশ দিয়া যাইতেছি, তাহা উপযুক্তভাবে প্রতিপালন করিয়া কাজ করিতে পারিলে তুমি বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে। আজ হইতে তুমি ঐহিক, পারমার্থিক যে কোন বিষয়ে যত্ন করিবে তাহাই ভগবান কৃপায় তোমার সিদ্ধ হইবে। তুমি মুখে যাহা বলিবে তাহাই ঠিক হইবে। এমন কি পশু, পক্ষী, প্রভৃতি জীব জন্তুও তোমার কথা মানিবে, মানুষ কোন্ ছার।” এই বলিয়া সন্ন্যাসী একটী কমণ্ডলু দিয়া উদ্ধবকে বলিলেন “বাবা এই নদী হইতে এক কমণ্ডলু জল আন।” উদ্ধব বলিলেন, “গুরুদেব! পিতাঠাকুর আমাকে নদীতে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কেননা এখানে নদীতে ভয়ানক কুম্ভীরের ভয়।” সন্ন্যাসী বলিলেন, “যাও বাবা! কোন ভয় নাই। কুম্ভীর দেখিলে সরিয়া যাইতে বলিও।” উদ্ধব গুরুবলে বলীয়ান ও সাহসী হইয়া জল লইয়া গুরুদেবের নিকট আসিলেন। সেই জল দ্বারা উদ্ধবকে মুক্তি স্নান করাইয়া দিয়া নানারূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিলেন, “বাবা! উদ্ধব! নিতান্ত ভাগ্য প্রসন্ন

না হইলে এরূপ কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। কোন কারণে যদি এই মহামন্ত্র তোমার ভুল হইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি ঘোর বিপদে পড়িবে। আমি শীঘ্রই এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, আমার থাকার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, আমার সঙ্গে তোমার পুনরায় দেখা হওয়াও অসম্ভব। তবে তোমাকে একটী কথা বলিয়া যাইতেছি, তুমি কোন সময়ে কোন বিপদে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও, তাহা হইলে যে কোনভাবে প্রতিকারের উপায় হইবে। তোমাকে যে মন্ত্র দিয়াছি, তুমি স্থিরভাবে মনে মনে স্মরণ করিতে থাক, আমি এখানে থাকিতে কোনরূপ ভুল হইলে পুনরায় বলিয়া দিব।"

উদ্ধব গুরুদেবের উপদেশানুসারে সেই স্থানে বসিয়া মন্ত্রটী মনে মনে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে সন্ন্যাসী বলিলেন "এখন এভাবে তোমার এখানে আর বসিয়া থাকার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে প্রণাম করিয়া বাসায় যাও, বেলা অধিক হইয়াছে, ঘরে যাইয়া আহারাদি কর।" উদ্ধব এই কথা শুনিয়া গুরুদেবের চরণপ্রান্তে সেই টাকাটী রাখিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, প্রণামান্তে আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য লইয়া যখন উদ্ধব দাড়াইলেন, তখন সন্ন্যাসী বলিলেন "এই নির্ম্মাল্য একটী কবচ করিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিও। সাবধানে কাপড়ে বাঁধিয়া রাখ।" সেই মহাবস্তু উদ্ধব অতি সাবধানে কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিলেন। তখন সন্ন্যাসী উদ্ধবকে প্রসাদ স্বরূপ কিছু ফল মূল দিলেন। উদ্ধব প্রসাদ লইয়া বাসায় ফিরিবেন এমন সময় সন্ন্যাসী বলিলেন "উদ্ধব! এই টাকাটী কেন?" উত্তরে উদ্ধব বলিলেন "গুরুদেব, আপনি দয়া করিয়া আমার এই পাপ দেহ পবিত্র করিলেন, আমি সাধ্যহীন, তাই একটী টাকা দক্ষিণা স্বরূপ দিয়াছি, দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।" সন্ন্যাসী বলিলেন "উদ্ধব! আমি গুরুদক্ষিণার লোভে কি মন্ত্র দান

করিয়াছি? তা নয়, বাবা! সংসারে কৃষকগণ যেরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ বপন করিয়া সুফল লাভ করে এবং সেই ফলে ভবিষ্যতে সহস্র সহস্র লোকের উপকার হয়, সেইরূপ আমিও তোমাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া মন্ত্র দান করিলাম। বাবা উদ্ধবচন্দ্র! তুমি ছেলে মানুষ এখনও তুমি বিশেষ কিছু বুঝ না, দেখ বাবা! স্বর্ণকার যেমন উত্তম স্বর্ণ পাইলে তাহাতে হীরা, মণি, মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্যবান পাথর বসাইয়া সোণার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া বহুমূল্যবান জিনিষ প্রস্তুত করতঃ আপন শিল্প-কৌশলতার পরিচয় দিয়া থাকে, সন্ন্যাসীরাও সেইরূপ উর্ব্বর মানব দেহ চিনিয়া তাহাতে যত্নপূর্ব্বক উপযুক্ত বীজ বপন করেন। কৃষক ও স্বর্ণকার যেমন নিজ নিজ স্বার্থের জন্য কাজ করিয়া থাকে, সন্ন্যাসীরা সেরূপ করেন না। তাঁহারা বিরাগী, অনাসক্ত-ভাবে আপন কর্ত্তব্য বোধে জগতের উপকার করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তাই আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছি তাহার জন্য আমার তো কোন অর্থের কামনা নাই, তবে তোমার টাকাটী দিবার প্রয়োজন কি?" এবম্প্রকার নানা উপদেশ দিয়া উদ্ধবকে টাকাটী নিতে বলিলেন। উদ্ধব তাহা না শুনিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আবার টাকাটী দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস উদ্ধব! দক্ষিণা দিবার যখন তোমার ঐকান্তিক বাসনা তখন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এই বলিয়া টাকাটী স্পর্শ করিয়া বলিলেন "বাবা! এই আমি গ্রহণ করিলাম। উদ্ধব তুমি এখনও বালক। তুমি এখন কিছু বুঝিতে পারিবে না। সূর্য্যের কিরণে তিমির নাশ না হইলে যেমন সূর্য্য উদয় হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না, এও সেই প্রকার, সময়ে বুঝিতে পারিবে। আমার আর বেশী বলিবার কিছু নাই, তোমার বাবা শুভক্ষণে মিঠাই খাবার এই টাকাটী তোমায় দিয়াছিলেন, তাই ছিল বলিয়া আজ এই অমূল্য মিঠাই লইতে সেই টাকাটী আনিয়াছ। তোমার

মনের শান্তির জন্য টাকাটা গ্রহণ করিলাম, বেলা ৩য় প্রহর অতীত প্রায়, সত্বর বাসায় যাও।" উদ্ধব সেই শক্তিসম্পন্ন গুরুদেবের অমৃত-সদৃশ উপদেশ বাক্যে আনন্দে পূর্ণ হইয়া ভক্তি সহকারে প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

উদ্ধব যে যোগভ্রষ্ট মহাত্মা, কামনাবশে নশ্বর মানব দেহ ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সন্ন্যাসীর প্রদত্ত এই মহামন্ত্র উদ্ধবের তেজঃপূর্ণ দেহে প্রবেশ করিয়া যথাসময়ে শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

গুরুদেবের নিকট বিদায় লইয়া মন্ত্রটী স্মরণ করিতে করিতে উদ্ধব আনন্দিত মনে দোকানে পঁহুছিলেন। গুরু দেবের প্রদত্ত ফলাদি প্রসাদ কতক তাঁহার পিতৃদেবের জন্য পৃথক ভাবে রাখিয়া ভক্তি সহকারে অবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তৎপরে পিতার আদেশানুরূপ পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। পাকশেষ করিয়া তাহা হইতে রাত্রির আহারোপযোগী অন্ন ব্যঞ্জন পৃথক ভাবে রাখিয়া নিজে আহার করিলেন। এই ভাবে দিনটী কাটিয়া গেল। রজনী সমাগত প্রায়, উদ্ধব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "গুরু দেবের আদেশমত আমার মন্ত্র-গ্রহণ বিষয়ে পিতৃদেবকে বলা হইবে না; তবে যে নির্ম্মাল্য কবচে পূরিয়া ধারণ করিতে বলিয়াছেন তাহা তো না জানাইয়া করা যাইবে না, যে কোন ভাবেই হউক বাবা তাহা জানিতে পারিবেন, বিশেষ গোপনভাবে করিতে গেলে বাবার মনে খারাপ ধারণা আসিবে, সুতরাং এই কার্য্যটী বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে আমার জানান কর্ত্তব্য।" উদ্ধব দোকানে সান্ধ্য প্রদীপ দিয়া ধূপ পোড়াইয়া একাকী বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাত্রিতে উদ্ধবচন্দ্র একাকী বসিয়া এই সব চিন্তা করিতেছেন এমন সময় তাঁহার পিতাঠাকুর হাট হইতে আসিয়া ঘাটে নৌকা

লাগাইলেন। উদ্ধব তাড়াতাড়ি ঘাটে গিয়া পিতার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে জিনিসপত্র আনিয়া ঘরে যথা স্থানে রাখিলেন। উদ্ধবের পিতা হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য শেষ করিয়া আহারে বসিলেন। আহার করিতে করিতে বলিলেন, "বাবা উদ্ধব, আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলে কি? আজ হাটে যাওয়ার সময় সন্ন্যাসীকে মানসা করিয়া গিয়াছিলাম, তাঁহার কৃপায় আজ হাটে যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। তাই তাঁহাকে দিবার জন্য তরমুজ, ফুটী, সবরী কলা প্রভৃতি ফল আসিয়াছি। কাল কিছু দুগ্ধ লইয়া গিয়া ফলাদি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দিয়া আসিতে হইবে।"

উদ্ধব বলিলেন "বাবা! আপনি হাটে যাওয়ার পর আমি একবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকট গিযাছিলাম। তখন অন্য লোক কেহ ছিল না। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম করিলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য ও খাবার কিছু ফল দিয়া বলিলেন 'এই নির্ম্মল্যটী কবচে ভরিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিও, ইহার প্রভাবে তোমার সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল হইরে।' বাসায় আসিয়া সেই ফলগুলি আপনার জন্য কিছু রাখিয়া আমি খাইয়াছি আর সেই বস্তুটী এখনও আমি সাবধানে রাখিয়াছি।" উদ্ধবের কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা ববিলেন, "বেশ তো বাবা। এই সন্ন্যাসী ঠাকুর সহজ লোক নহেন, তাঁহার কৃপায় সবই হইতে পারে। আচ্ছা, আমি তোমাকে সোণার কবচ প্রস্তুত করাইয়া দিব। সে জন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না। এইরূপ কথা বলিতে বলিতে আহারাদি শেষ করিয়া আচমনান্তে পান তামাক খাইয়া পিতাপুত্রে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া উদ্ধবের পিতা তাগাদায় বাহির হইয়া গেলেন এবং যথাসময় কিছু দুধ ও একটী পাঁকা কাঁঠাল সহ ঘরে ফিরিলেন, তৎপর পিতাপুত্রে স্নান করিয়া একত্রে

দুগ্ধ ও ফলাদি সহ সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকট যাইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া ফলাদি ও দুগ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট দিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী ঐ সকল দ্রব্য দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি হে বাপ্ আজ এত আয়োজন কেন? কোন মানসা আছে বুঝি।" "আজ্ঞে হাঁ তাই ছিল, আপনি দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে বড়ই সুখী হইব। শুনিলাম আপনি কাল দয়া করিয়া এ গরীবের ছেলেটীকে কি মহাবস্তু কবচে ধারণ করিতে দিয়াছেন, আমার নিতান্ত সৌভাগ্য না হইলে আপনার মত মহাপুরুষের কৃপা হইবে কেন, আপনি নিজ গুণে যখন এতদূর করিয়াছেন, তখন আপনার ভক্তের বাসনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।"

সন্ন্যাসী সহাস্য বদনে বলিলেন "ভক্তের বাসনা ভগবান অবশ্য পূর্ণ করিবেন, তোমরা এখানে উপবেশন কর।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর ফলগুলি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধ সহ ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া দিলেন এবং তাহা হইতে নিজে কিছু গ্রহণ করিয়া বাকী সমস্ত উদ্ধব ও তাঁহার পিতাকে দিয়া বলিলেন, "তোমরা এখানে বসিয়াই প্রসাদ পাও।" সন্ন্যাসীর আজ্ঞানুসারে তাহাই হইল। পরে সন্ন্যাসী উদ্ধবের পিতাকে বলিলেন, "রঘুরাম! তুমি ভাগ্যবান লোক না হইলে এমন রত্ন লাভ হইবে কেন? তুমি কিছু বুঝিতে পার নাই যে উদ্ধব তোমার কি অমুল্য রত্ন। তাহা তোমার বুঝিবার শক্তি হইবে না। উদ্ধব পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে এই জঙ্গলময় দেশ ইহার সৌরভে আমোদিত হইবে। আমি ইহাকে যে বস্তুটী দিয়াছি তাঁহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে পারিলে সর্ব্ববিষয়ে আশানুরূপ ফল লাভ হইবে।" এই কথার পর পিতা পুত্রে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণান্তর বাসায় ফিরিলেন।

পিতাপুত্রের মনে বড়ই শান্তি ছিল, তাই রাত্রিতে উভয়ে গাঢ় নিদ্রায়

অভিভূত হইলেন। রাত্রি প্রায় তিন প্রহরের সময় উদ্ধব এইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন "পিতার সহিত হাটে যাইবার সময় হঠাৎ নদীর অতল জলে তাঁহাদের নৌকাখানি ডুবিয়া গেল, পিতাপুত্রে বহু কষ্টে হাবু ডুবু খাইয়া কোন মতে সাঁতরাইয়া কুল পাইলেন।" অকস্মাৎ এই অভাবনীয় দুঃস্বপ্নে উদ্ধব বিছানায় বসিয়া গুরুদত্ত মূল মন্ত্র স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন। উদ্ধব বারংবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু মন্ত্রটী আর মনে হইল না। বহুক্ষণ বসিয়া চেষ্টা করা সত্ত্বেও যখন মন্ত্র মনে করিতে পারিলেন না, তখন উদ্ধবের মনে এক অসহ্য উদ্বেগ উপস্থিত হইল।

রাত্রি প্রভাত হইলে উভয়ে শয্যাত্যাগ করিলেন। উদ্ধবের পিতা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দোকানে আসিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। সে দিন সকালে তিনি কোন স্থানে বাহির হইলেন না। পিতা, উদ্ধবের রাত্রির ঘটনা কিছুই অবগত নহেন। তিনি অভ্যাসমত উদ্যম সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উদ্ধব স্বপ্ন দেখা অবধি মন্ত্রটী ভুলিয়া বিষম চিন্তায় পড়িয়াছেন, তবে তাঁহার মনে একটু ভরসা আছে যে গুরুদেবের নিকট গেলে তিনি পুনর্ব্বায় মন্ত্র বলিয়া দিবেন। একটু বেলা হইলে উদ্ধব তাঁহার পিতার নিকট বলিলেন "বাবা! আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিয়া আসি।" পিতা বলিলেন "আচ্ছা বাবা! দেখে এসোগে।" এই কথা বলিলে উদ্ধবচন্দ্র বড় আশায় বুক বাঁধিয়া সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন।

যেখান হইতে সেই বটমূল বেশ দৃষ্ট হয়, উদ্ধব সেই স্থানে যাইয়া বিশেষ লক্ষ্য করিয়া গাছের মূলে দৃষ্টি করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীকে তথায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন উদ্ধব একবার মনে করিলেন, গুরুদেব হয়ত শৌচাদি হেতু কোথায় গিয়া থাকিবেন, কিংবা গাছের অপর দিকে গিয়া বসিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে

করিতে ক্রমে যাইয়া সেই বট মূলে পঁহুছিলেন। চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন সন্ধান পাইলেন না। বুঝিলেন, গুরুদেব নিশ্চই কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। গুরুদেবকে না দেখিয়া উদ্ধবের মনের উদ্বেগ শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। তখন কি করিবেন স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানের নিকটে গিয়া নিরাশচিত্তে বসিয়া পড়িলেন। মনের উদ্বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উদ্ধব একাকী কান্দিতে লাগিলেন, পরে শান্তিময়ীর ইচ্ছায় শান্ত হইয়া এদিক ওদিক চাহিবামাত্র একটী ত্রিখণ্ডী বিল্বপত্র দেখিতে পাইলেন। তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, বটমূলে বিল্বপত্র কেন? বালোচিত চাঞ্চল্য বশতঃ বিল্বপত্রটী তুলিতে গিয়া দেখেন যে তাঁহার দত্ত সেই গুরু দক্ষিণার টাকাটি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার উপর একটী সিন্দূর বিন্দুমাত্র। তখন অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিয়া নানারূপ চিন্তা করিয়া উক্ত বিল্বপত্র এবং টাকাটী একত্রে কাপড়ের আঁচলে বাঁধিয়া ধীরে ধীরে দোকানে ফিরিলেন। দোকানে পঁহুছিলে তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখে এলে, তিনি কিছু বলিলেন কি?" উদ্ধব নিস্পন্দ নিস্তব্ধ—কোন উত্তর না দেওয়ায় পিতা বলিলেন, "তবে বুঝি তুমি সন্ন্যাসীর নিকট যাও নাই। উত্তরে উদ্ধব বলিলেন, "বাবা সেই বটমূলে গিয়াছিলাম, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বাবা! কি আশ্চর্য্য তিনি যেখানে ধূনী জ্বালাইয়া কয়েক দিন ছিলেন, সেখানে তাঁহার ধূনীর ভস্মের চিহ্নটী পর্য্যন্ত নাই। কেবল মাত্র সিন্দূরের ফোটা দেওয়া বিল্বপত্রে ঢাকা একটী টাকা ছিল। তাহা আমি আনিয়াছি।" শুনিয়া উদ্ধবের পিতা চমকিয়া উঠিলেন, "বল কি! সন্ন্যাসী চলিয়া গিয়াছেন। তা বটে! এসব মহাপুরুষ সর্ব্বদা এক স্থানে অধিক দিন থাকেন না। কি জন্য যে

এখানে তিনি আসিয়াছিলেন তাহা কে বলিবে ?" এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে পুনরায় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

আজ দূরের হাটে যাইতে হইবে, সকালেই পাক হইল। স্নান করিয়া সাহাজী মহাশয় আসিয়া খাইতে বসিলেন, উদ্ধবকে বলিলেন, "তুমিও ভাত লইয়া খাও।" উদ্ধব বলিলেন, আমি একটু পরে খাইব।" সাহাজী আহারাদি সমাপন করিয়া নৌকাযোগে হাটে চলিয়া গেলেন। উদ্ধব চন্দ্রের চিন্তায় দিবস অবসান হইল। তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা বলিয়া কোনই উদ্বেগ নাই। রাত্রি হইলে তাঁহার পিতা হাট হইতে আসিলেন এবং দোকান পশার সব উঠাইলেন। আজ উদ্ধব পিতার কোন সাহায্য করিলেন না। উদ্ধবের পিতা বড়ই সহিষ্ণু লোক ছিলেন, বিশেষ, অপত্যস্নেহ উদ্ধবের উপর কিছু বেশী ছিল। তিনি কখন কাজ কর্ম্মের জন্য পুত্রকে পীড়াপীড়ি করিতেন না। দোকানে আসিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্য শেষ করিয়া বিশ্রামান্তে রন্ধন করিতে গেলেন। কিন্তু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, যে পরিমাণ ভাত পুত্রের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে ভাত সেই ভাবেই আছে। তখন উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ভাত খাও নাই কেন" ? উদ্ধব বলিলেন,"আমার শরীর যেন কেমন খারাপ বোধ হইতেছে, আমি এ বেলাও খাইব না" এই কথা শুনিয়া উদ্ধবের পিতা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "বাবা, তোমার কি অসুখ ?" উদ্ধব বলিলেন, "আমার যে কি অসুখ তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, শরীর যে কেমন হইয়াছে তাহা বলিবার শক্তি নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র সাহাজী চিন্তিত হইলেন, দুপুর বেলার যাহা ছিল তাহা কোন মতে গলাধঃকরণ করিয়া আচমন করতঃ আসিয়া উদ্ধবের গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, শরীর তেমন গরম নয়, অথচ চক্ষু লালবর্ণ, যেন কি এক প্রকার ভাব। এই ভাব দেখিয়া পিতা পুত্রে এক স্থানে শয়ন করিলেন। উদ্ধবও পিতার পার্শ্বে শয়ন করিলেন

বটে, কিন্তু তাঁহার আর নিদ্রা আসিল না। মৃতপ্রায় শয্যায় গা ঢালিয়া অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে উদ্ধবের পিতা জাগিবামাত্র দেখিলেন স্নেহের পুত্র উদ্ধবের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; অধিকন্তু দেখিতে পাইলেন বায়ুগ্রস্ত লোকের মত একা বসিয়া কি যেন নিজ মনে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছেন, কথাগুলি অপষ্ট, কিছুই বুঝা যায় না, আর মানুষ দেখিলে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকেন, যদিও কোন কথার উত্তর দেন, তাহা অনেক অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া বায়ুগ্রস্ত বা ভূতাবিষ্ট বলিয়া অনেকে অনুমান করিলেন। সাহাজী মহাশয় ভাল ওঝা আনিয়া পুত্রের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। তাহাতে কোন ফল না পাইয়া এবং পুত্রের অবস্থা একই দেখিয়া সাহাজী নিতান্ত উদ্যমভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। সময়মত আহার নাই, নিদ্রা নাই, এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। উদ্ধবের অত্যন্ত কাতর অবস্থা দেখিয়া সাহাজী মহাশয় একদিন একাকী বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আর নিজের কর্ম্মের জন্য ধিক্কার দিতেছেন— "কেনই বা নাবালক ছেলেকে এই জনশূন্য স্থানে আনিলাম।" উদ্ধব ঐ ক্রন্দন শুনিয়া একাকী বলিতেছে "গুরুদেব! আমাকে ভাল করিতে আসিয়া আমার কর্ম্ম দোষে কি করিয়া গেলেন।" এই কথাটি উদ্ধবের পিতা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে সে প্রকৃতিস্থ এবং তাহার ভাষায় কোন অসংলগ্নতা নাই। তখন সাহাজী মহাশয় উদ্ধবের নিকট গিয়া বলিলেন, "বাবা! স্থির হইয়া বলতো সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার কি ভাল করিতে আসিয়া কি মন্দ করিয়া গিয়াছেন? কি জন্য তোমার এ দশা ঘটিয়াছে?" উদ্ধব ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "বাবা! আপনার নিকট না বলিয়া আমি কোন কার্য্য করিয়াছি, তাহার পাপে বোধ হয় আমার এ হেন দশা ঘটিয়াছে।" তখন উদ্ধবের পিতা বলিলেন "তুমি কি কার্য্য

করিয়াছ যে আমাকে এত দিন বল নাই ?" উদ্ধব কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন "বাবা! আমায় ক্ষমা করিবেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে আপনার নিকট বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি বলি নাই।" তখন সাহাজী মহাশয় মিষ্টবাক্যে উদ্ধবকে বলিলেন, "বাবা উদ্ধব! তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার নিকট সমস্ত খুলিয়া বল।" উদ্ধব ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে বলিলেন "বাবা! সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে দীক্ষা মন্ত্র দিয়াছিলেন, ঐ মন্ত্রটী ভুলিয়া গিয়া আমার এই দশা হইয়াছে।" শুনিয়া সাহাজী চমকিত হইয়া বলিলেন "এতদিন আমাকে একথা বল নাই কেন ?" উদ্ধব বলিলেন,"আপনাকে বলিলে আপনি কি করিতেন ; সেই সন্নাসী ভিন্ন আর কেহ আমার এ ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারিবেন না।" "উদ্ধব, সন্ন্যাসী তোমাকে মন্ত্র দিয়া আর কিছু বলিয়াছিলেন কি ? তিনি কোথায় থাকেন, তাঁহার নাম কি ? এসব কিছু জানিতে পারিয়াছ কি ?" উদ্ধব বলিলেন, "এসব কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে গুরুদেব আমাকে মন্ত্র দান করিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি সাবধানে এই মন্ত্র স্মরণ রাখিতে যত্ন করিও, মন্ত্র ভুলিলে বিষম বিপদে পড়িবে; আমার থাকার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই ; আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব ; তবে তুমি কোন বিপদে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও, তাহা হইলে যে কোন ভাবে বিপদের প্রতিকার হইবে।" মহাত্মা মহাপুরুষদের বাক্য কখন মিথ্যা হয় না ; এই বিশ্বাসে সাহাজীর নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল, এক্ষেত্রে তিনি কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে স্মরণ করাই এক মাত্র সার চেষ্টা স্থির করিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন।

সাহাজী মহাশয় সারাদিন অনাহারে থাকেন এবং ছেলের অসুখ ভাল না হইলে খাইব না—সঙ্কল্প করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রথমত নতজানু হইয়া পরে ক্রমে সাষ্টাঙ্গে ধরায় লুটাইয়া পড়িলেন। তৎপরে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উদ্ধকে বলিলেন "বাবা! উদ্ধব

তুমিও একাগ্রচিত্তে তোমার গুরুদেবকে স্মরণ কর, তিনি অবশ্য তোমার প্রতি দয়া করিবেন।” তখন পিতার বাক্যে উদ্ধব যেন চৈতন্য লাভ করিয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, সাহাজী মহাশয়ও সন্ন্যাসীর নামে হত্যা দিয়া রহিলেন, রাত্রি প্রায় তিন প্রহর এমন সময় উদ্ধবের একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছে তখন উদ্ধব দেখিলেন যেন তাঁহার শিয়রে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতেছেন, “বাবা উদ্ধব তুমি মূল মন্ত্র হারাইয়া এইরূপ হইয়া পড়িয়াছ। বৎস, উদ্ধব! বাবা, তোমার কোন ভয় নাই। তোমার সেই মন্ত্র সাবধানে স্মরণ করিতে থাক; মন্ত্র তোমার আর কখন ভুল হইবে না।” উদ্ধব স্বপ্নে গুরুদেবকে ও তাঁহার দত্ত মন্ত্র পাইয়া, অতি আনন্দে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য হঠাৎ মস্তক উত্তোলন করিয়া “গুরুদেব! গুরুদেব! গুরুদেব!” বলিয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অন্ধকার গৃহে সেই বিরাট মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে শিয়রে উপবিষ্ট বলিয়া স্বপ্ন দেখায় তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল; ইহা স্বপ্ন হইলেও তাঁহার কার্য্য প্রত্যক্ষ-স্বরূপ, তিনি মন্ত্রটী স্মরণ করিতে করিতে সভয়ে পিতাকে ডাকিলেন এবং কোন সাড়া না পাইয়া নিজেই ঘরে আলো জ্বালিয়া দেখেন যে পিতা সংজ্ঞা-শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তখন গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন “বাবা! বাবা!” এমন সময় চমকিয়া সাহাজী মহাশয় জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, “বাবা! উদ্ধব!” উদ্ধব বলিলেন “উঠুন গুরুদেব দয়া করিয়াছেন।” এই কথা শুনিয়া সাহাজী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তৎপক্ষে কি ভাবে হারানিধি প্রাপ্ত হইলেন উদ্ধবের মুখে শুনিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কথোপকথনে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। তখন পিতা-পুত্রে একত্রে অতি সাবধানে গুরু-মন্ত্র জপ করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ

করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বাহিরে আসিয়া পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া সূর্য্য দেবকে প্রণামান্তর হাত মুখ ধৌত করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দোকান ঘরে বসিলেন। তখন উদ্ধব বলিলেন "বাবা আমার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া সাহাজী মহাশয়, তাড়াতাড়ি হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া উদ্ধবকে খাইতে দিলেন। পরে সাহাজী মহাশয় স্বয়ং আহার করিলেন। সপ্তাহাধিক কাল অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় উভয়েরই শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; আহারান্তে এক শয্যায় উভয়েই শান্তির সহিত নিদ্রিত হইলেন। বেলা অবসানে উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া হাত মুখ ধুইয়া নিজ নিজ কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

পরদিন হইতে সাহাজী মহাশয় যথারীতি হাট বাজার করিতে লাগিলেন, উদ্ধব বাসায় থাকিয়া সাধ্যমত পিতার সাহায্য করিতে লাগিলেন, এইরূপে কয়েক দিন পর ভগবানের কৃপায় উদ্ধবের শরীর সুস্থ হইল। উদ্ধব এখন প্রয়োজনমত পিতার সহিত হাট বাজার করেন। মা কমলার কৃপায় দিন দিন তাঁহাদের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ হইতে লাগিল। উদ্ধব যখন যে কাজে হাত দেন তাহাতেই আশাতীত ফল লাভ করেন। অল্পদিন মধ্যে তাঁহাদের বিশেষ উন্নতি হইয়া উঠিল, ক্রমে ক্ষুদ্র দোকানের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া গোমস্তা কর্ম্মচারী রাখিলেন। একবৎসর পৌষ মাসে যথাকালে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল রাখিয়া ভগবানের কৃপায় তাহাতে যথেষ্ট লাভবান হইলেন। এই প্রকারে দিন দিন সর্ব্ব বিষয়ে বানের জলের ন্যায় অর্থাগম হইতে লাগিল। মানুষের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সময় এইরূপেই দৈব সহায় হয়।

উদ্ধব চন্দ্র একজন প্রিয়দর্শন পুরুষ ছিলেন তাহাতে আবার দৈবশক্তিসম্পন্ন হওয়ায় যেন মনিকাঞ্চণ যোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার

শরীরের জ্যোতিঃ শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইল, তাঁহাকে একবার দেখিলে মন আপনিই মুগ্ধ হইত। উদ্ধব চন্দ্র মুখে যাকে যে কথা বলিয়া দেন তাহাই সিদ্ধ হয়, ক্রমে তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এমন কি জলের কুম্ভীর, জঙ্গলের বাঘ, মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত তাঁহার কথায় বাধ্য হইত। উদ্ধবের এবম্প্রকার প্রতিভা দিন দিন ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে প্রচার হইতে লাগিল। পুত্রের এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া সাহাজী মহাশয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। উদ্ধব বয়োপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার বুদ্ধি পরিচালনায় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। সাহাজী মহাশয় পুত্রের উপর তথাকার কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া দেশে আসিয়া পুত্রের শুভ বিবাহের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে পাত্রী দেখিতে লাগিলেন, অনতিকাল বিলম্বের পর যথা সময় সুপাত্রী দেখিয়া শুভ কার্য্যের দিন নির্দ্ধারিত করিলেন এবং উদ্ধবকে দেশে আনিয়া শুভ বিবাহের বিশেষ আয়োজন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভগবৎ কৃপায় শুভকার্য্য অতি আমোদ আহ্লাদের সহিত সম্পন্ন করিয়া আবার পিতা পুত্রে উভয়ে একত্রে কার্য্যস্থলে গমন করিলেন।

সাহাজী মহাশয়ের চারিটী পুত্র। তন্মধ্যে ১ম উদ্ধবচন্দ্র, ২য় রূপনারায়ণ, ৩য় গোকুলচন্দ্র, ৪র্থ যাত্রাবর। উদ্ধবচন্দ্র দোকানের কাজ কর্ম্ম পূরা উদ্যমে চলাইতে লাগিলেন, দোকান পশার প্রভৃতিতে ঐ অঞ্চলে তিনি একজন বড় ধনী ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য হইলেন। এই সময়ে উদ্ধবের মনে এক নূতন খেয়াল চাপিল, মানুষ ব্যাবসায়ে যেমন হঠাৎ উন্নতি লাভ করে, আবার অবনতির আশঙ্কাও তদ্রূপ। কত বড় বড় ব্যবসায়ী উঠিতেছে পড়িতেছে, কিন্তু যাঁর জমি জমা বিষয় সম্পত্তি আছে তাহার পতন তত শীঘ্র ঘটে না।

সেই সময় ঐ সব দেশে লোকের বসতি বিরল ও অধিকাংশই ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল ; ব্যাঘ্র, মহিষ, শূকর, হরিণ প্রভৃতি বন্য জন্তুর উৎপাতে স্থানে স্থানে যে সকল ভূমি আবাদী ছিল তাহাও লোকে ভয়ে ছাড়িয়া যাইত। ঐ সমস্ত গড়াবাদী ভূমির অধিক স্থান গবর্ণমেণ্টের খাষমহাল ছিল। উদ্ধব নিজ নামে আমলনামা লইয়া গবর্ণমেণ্ট ও জমিদারদিগের নিকট হইতে অনুমতিক্রমে আবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ; ভূমি আবাদ করিতে পারিলে ১০ বৎসর পর আবাদী ভূমি প্রতি বিঘা।০ চারি আনা নিরীখে খাজনা বন্দোবস্ত হইবে এই মর্ম্মেই আমলনামা লিখা হইয়াছিল। আমলনামা প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধব আবাদের জন্য লোক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশেষ চেষ্ট করিয়া লোক সংগ্রহ করিলেন বটে, কিন্তু কৃষকগণ বন্য পশুর ভয়ে আবাদ করিতে সাহস করে না প্রাণের আশা সকলেরই আছে, কে সাধ করিয়া বাঘের মুখে দাঁড়ায়। যদিও আবাদ করা যায়, তাহা মহিষ, শূকর, হরিণ প্রভৃতি বন্য পশুতে নষ্ট করিয়া দিবে। এই সমস্ত প্রস্তাব করিয়া সকল কৃষক উদ্ধব চন্দ্রের নিকট করযোড়ে দাঁড়াইল। উদ্ধব সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "বাপু সকল, তোমরা কোন চিন্তা করিও না, পশু তাড়াইবার বিধান আমি নিজে করিব ; আমার সঙ্গে এস।" উদ্ধব অসম্ভব একটা কথা বলিলেও তাহার প্রতি কাহারও কোন প্রকার দ্বিধা বা সন্দেহ হইত না। জলের কুম্ভীর ও জঙ্গলের বাঘ যে তাঁহার কথা মানে তাহা ঐ অঞ্চলের প্রায় সকলেই অবগত আছে। উদ্ধব বহু কৃষক সঙ্গে করিয়া সেই গড়াবাদী জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলেন, জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া চারি কোণে চারিটী নিশান পুতিলেন এবং তত্রস্থ ব্যাঘ্র, মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণকে বলিতে লাগিলেন "আমি এই জঙ্গলটুকু আবাদ করিব, তোমরা অন্য দিকে সরিয়া যাও, আমার কৃষক প্রভৃতি লোক জনের উপর তাহাদের অর্জ্জিত শস্যের

প্রতি কোনরূপ অনিষ্ট করিও না।” এই কথা অনেকেই গল্প বলিয়া মনে করিতে পারেন, বাস্তবিক তাহা নহে, কথাটী সম্পূর্ণ সত্য। দৈবশক্তি সম্পন্ন লোকের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। তাহার পর হইতে জঙ্গল আবাদ আরম্ভ হইল; প্রকৃত প্রস্তাবে সেই জঙ্গল মধ্যে ঐ সকল হিংস্র জন্তু আর দেখা গেলনা; ক্রমে লোকের উৎসাহ ও সাহস দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রথম বৎসর বহু জমির জঙ্গল মারিয়া চাষাবাদ হইলে যথা সময় ঈশ্বরের কৃপায় প্রচুর পরিমাণ ধান্য হইল। শস্যের অবস্থা দেখিয়া কৃষকগণ বিশেষ উৎসাহিত হইল। যাহাদের দূরে বাড়ী ছিল তাহারা আবাদের সুবিধার জন্য ক্রমে আসিয়া ঐস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল। কালক্রমে তাহারা ঐ স্থানের বাসিন্দা হইয়াছে। জমি আবাদ করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত উৎপন্ন শস্য কৃষকগণ বিনা করে ভোগ করিলে পর উদ্ধবচন্দ্র ইচ্ছানুসারে ঐ সমস্ত জমি বন্দোবস্ত করিলেন।

প্রথম বৎসরের আবাদের কথা শুনিয়া নানা স্থান হইতে বহুলোক আসিয়া জমি আবাদ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। লোকজন সহ উদ্ধব জঙ্গলে গিয়া নিশান পুতিয়া জমি চিহ্নিত করিয়া দিয়া ঘরে ফিরিলেন; কৃষকগণ বিশেষ উদ্যমের সহিত আবাদ আরম্ভ করিল। ভগবানের কৃপায় এবৎসরও বিশেষ রকম শস্য জন্মিল দেখিয়া বহুদূর হইতে লোক আসিয়া স্থানে স্থানে ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিয়া আবাদে প্রবৃত্ত হইল। এই ভাবে ১০।১২ বৎসরে প্রায় লক্ষাধিক বিঘা জমি আবাদ হইল।

অবস্থার পরিবর্ত্তনে এখন আর জঙ্গল নাই, এখন সে স্থানে বহু লোকের বসতি হইয়াছে। মালিকগণের সহিত আমলনামার চুক্তি অনুসারে ক্রমে অনেক জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। উদ্ধব সত্যের অপলাপ করিয়া কাহাকেও বঞ্চনা

করিবেন এরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না বলিয়া লোকে তাঁহাকে বিশ্বাস করিত এবং তাঁহার মুখের কথায় ও ব্যবহারে সকলেই বাধ্য থাকিত।

এদিকে আবাদী ভূমি প্রজাদিগের সহিত ক্রমান্বয়ে যেমন বন্দোবস্ত হইয়া কর ধার্য্য হইতে লাগিল, অমনি আদায় তহশীলের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া সুবিধার্থে স্থানে স্থানে কাছারী বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইলেন। নিজ খামারের জমি হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণ ধান্য আনিয়া গোলাজাত করিতে লাগিলেন। প্রজারাও সন সন যথা সময়ে খাজানা দিতে লাগিল; কাজ কর্ম্ম উভয় দিকেই সুবন্দোবস্ত হইল। উদ্ধবের প্রতিভা ও প্রতিপত্তিতে দেশময় একটা যশের বাতাস বহিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না উদ্ধব তখন ও দেশের রাজা। কোন স্থানে কোন প্রকার গোলমাল নাই, নিজের তত্ত্বাবধানে সব চলিতে লাগিল। তৎপরে তাঁর সন্ন্যাসী প্রদত্ত সম্পত্তিতে ক্রমেই উন্নতি, উদ্ধবের নাম করিয়া যে যাহা মানস করে তাহাই সিদ্ধ হয়, কত শত ব্যাধিগ্রস্থ বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় মুক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা অসাধ্য। লোকের কামনা সিদ্ধি হইলে যে যাহা মানস করিত তাহা আনিয়া সাহাজীকে দিয়া যাইত। প্রতিদিন নানা স্থান হইতে এই প্রকার কত হাজত আসিত তাহার সীমা নাই। মানসিক হাজত আসিলে তাহা উদ্ধব ব্রাহ্মণকে দান করিতেন, নিজে কিছু গ্রহণ করিতেন না। হাজত সম্বন্ধে সেই সময়ই ভ্রাতাগণের নিকট বলিয়া রাখিলেন, আমি অভাবে আমার নাম করিয়া কোন লোক হাজত দিলে তাহা সমুদয়ই ব্রাহ্মণদিগকে দিতে হইবে, শূদ্রে বা অন্য জাতিতে এবং আমাদের বংশের কেহ ইহা কোন কালেই গ্রহণ করিতে পারিবে না। সেই নিয়ম

অদ্যাপিও চলিতেছে। উদ্ধব একজন স্বার্থত্যাগী পরোপকারী লোক ছিলেন, সেই জন্য সাধারণের চক্ষে তিনি দেব তুল্য লোক হইলেন। তিনি নানা প্রকার সদ্‌গুণ বিশিষ্ট লোক বলিয়াই তাঁহার প্রতি জন সাধারণের হৃদয়ের টান ছিল, তাই তিনি জমিদারদিগের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকার প্রজার উপর আধিপত্য করেন বটে, কিন্তু উদ্ধবচন্দ্র লোক নির্ব্বিশেষে সকলের উপরই নিজগুণে এই বিপুল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

লোকের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সকল দিকের ব্যবস্থাই হইয়া থাকে, উদ্ধব চন্দ্রের দেশের বাড়ী ঘর উপযুক্ত মতই হইয়াছে, উদ্ধবের পিতা সাহাজী মহাশয় এই সময় মধ্যে উদ্ধবের কনিষ্ঠত্রয়ের শুভপরিণয়-কার্য্য যথাসময়ে অতি আমোদ আহ্লাদের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। সাহাজী মহাশয় এখন বাড়ীতে থাকিয়া ছেলেদের ছেলে মেয়ে পুত্র-বধূগণ সহ সর্ব্বদা সুখ শান্তিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল, তৎপর সাহাজী মহাশয় ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পুত্র দিগকে বাড়ীতে আনাইলেন। সাহাজী মহাশয় আসন্নকাল সমাগত-প্রায় বুঝিতে পারিয়া পুত্রদিগকে ডাকিয়া একদিন অনেক কথা বলিয়া নানা প্রকার উপদেশ দিয়া পুত্র উদ্ধবের হস্তে ছোট ভাইদের দিয়া বলিলেন,তুমি ইহাদের বড়,তোমার হাতে ইহাদের সমর্পণ করিলাম, ঘর বাড়ী বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তোমার করে অর্পণ করিলাম। সাবধান যেন আমার শান্তির ঘরে অশান্তি প্রবেশ না করে। আমি অভাবে মাতৃআজ্ঞানুসারে কার্য্য করিবে। কয়েকদিন পরে তিনি পরলোক গমন করিলেন। চারি ভাই উৎসাহের সহিত উপযুক্ত ব্যয় করিয়া পিতৃ-দেবের ঔর্দ্ধ দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। উদ্ধব বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সংসারের গুরু ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং পিতা অভাবে সে ভার

বহন করিতে কষ্ট বোধ করিলেন না। বাড়ীর কাজ কর্ম্ম সমাধা করিয়া উদ্ধবচন্দ্র পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া যাইলেন।

এই সময়ে একটী নূতন ঘটনা ঘটিল। তাঁহার জঙ্গল আবাদী স্থান মধ্যে পূর্ব্বে যাহাদের জমি জমা ছিল এবং যাহা ঋণদায়ে উদ্ধবের নিকট আবদ্ধ ছিল ঐ সকল প্রজা উদ্ধবের নিকট আসিয়া প্রতিকার মানসে আবেদন করিতে লাগিল। উদ্ধব সেক্ষেত্রে তাহাদের দলীল প্রমাণ গ্রহণ করিয়া আপত্তি সত্য বিবেচনায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিনা অর্থে অনেকের জমি ছাড়িয়া দিলেন। এই প্রকারে বহু লোকের জমি জমা ছাড়িয়া দিলেন; কয়েক বৎসরে বহু পরিমাণ জমি উদ্ধব চন্দ্রের অনুগ্রহে বহু লোকে খালাস পাইল, তাহাতে উদ্ধব চন্দ্র লোক সমাজে আরও ধন্য হইলেন। এই প্রকারে জমি ছাড়িয়া দেওয়ায় দখলী জমির প্রায় ୵০ আনা কমিয়া গেল। তিনি ন্যায় ও ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যের কখনও পোষকতা করিতেন না, যাহা সত্য বলিয়া জানিতেন তাহা করিতে নিজের ইষ্টানিষ্ট একটুও চিন্তা করিতেন না। সেই জন্যই তিনি হৃদয়ে কোন রূপ অশান্তি বা অনুতাপ বোধ করিতেন না।

উদ্ধব দলিল পত্র দেখিয়া যে সকল লোকের জমি জমা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেক চরিত্র হীন লোক, দলিল জাল করিয়া, জাল দলিল দেখাইয়া নিজ নিজ কার্য্য সিদ্ধ করিল; উদ্ধব তাহাদের অভিসন্ধি বেশ বুঝিতে পারিয়া এইরূপ সরল ভাবে আর কাহারও জমি জমা ছাড়িয়া দেওয়া হইবেনা বলিয়া এক ঘোষণা করিলেন। তিনি আরও প্রকাশ করিলেন "আমা কর্ত্তৃক যদি কাহার জমি জমা যখল হইয়া থাকে তবে বিনা মোকর্দ্দমায় উহা ছাড়িয়া দিব না।" তখন তাঁহার সে দেশে এত প্রতাপ বা প্রতিপত্তি ছিল যে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এমন সাধ্য কাহারও ছিল না। মিথ্যাবাদী, শঠ, কুচক্রী, জালিয়াৎ লোকের প্রবঞ্চনায়

এবং তাহাদের কার্য্য দ্বারায় ভাল লোকের সুবিধা ধ্বংস হইয়া গেল।

সাহাজী মহাশয়ের এলাকা মধ্যে এখন কোন প্রকার গোলযোগ নাই, সুশৃঙ্খলার সহিত আদায় ওয়াশীল কার্য্য চলিতেছে। ভ্রাতৃগণ ও আমলাগণ তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্টচিত্তে উৎসাহের সহিত কাজকর্ম্ম করিতেছে। দেশের বাড়ীতে পরিবারবর্গের মধ্যে কোনরূপ ঝগড়া বিবাদ অশান্তি নাই। ভগবৎকৃপায় উদ্ধব সাহাজী মহাশয় যখন এমত অবস্থায় সুখ শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছেন তখন তাঁহার দৈবশক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই তিনি স্বনামধন্য পুরুষ বলিয়া, লোকে তাঁহার নাম ধরিয়া কেহ কোন কথা বলিতেন না; শুধু "সাহাজী" শব্দ উচ্চারিত হইলেই তাঁহাকে বুঝাইত। আজ পর্য্যন্ত "সাহাজীর গদী" বলিয়া লোকে কত মান্য করে। সাহাজী মহাশয় এতদ্দেশে একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি বলিয়া এখনও সুপরিচিত। তাঁহার বংশধরগণ "হরির লুট" দিতে হইলে "সাহাজীর লুট" সঙ্গে না দিয়া হরির লুট দেন না।

ভগবৎকৃপায় সাহাজী মহাশয় চারটী পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন, ১ম পুত্রের নাম চন্দ্র সাগর, ২য় পুত্রের নাম জগন্নাথ, তৃতীয় পুত্রের নাম, হরেকৃষ্ণ, চতুর্থ কৃষ্ণপ্রসাদ। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা রূপ নারায়ণ সাহার এক মাত্র পুত্র ছিল, তাঁহার নাম মুচিরাম। সাহাজী মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও নিজের ছেলেদের শিক্ষার জন্য যত্নের কোন ত্রুটী করেন নাই। তৎপর যথা যোগ্য বয়সে তাঁহাদের বিবাহাদি দিয়া বিশেষ আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন। এই সময়ে সাহাজী মহাশয়ের মাতৃদেবী বৃদ্ধাবস্থায় স্থবির দেহ লইয়া অশক্তাবস্থায় জীবিত ছিলেন মাত্র হঠাৎ একদিন বার্দ্ধক্য জনিত পীড়ায় পীড়িত হইয়া পরলোক গমন করিলেন। তিনি পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে কাজ কর্ম্ম শিক্ষা দিবার

জন্য দক্ষিণ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। সাহাজী অতিশয় সমদর্শী ছিলেন তাঁহার নিকট কোন পক্ষপাতিত্ব কি স্বার্থপরতা ছিলনা। এই কারণেই তাঁহার পরিবারস্থ সকলের মনেই শান্তি ছিল। সংসারে আর কোন প্রকার কষ্ট নাই, কষ্টের মধ্যে কেবল ভ্রাতা গোকুলচন্দ্র ও যাত্রাবরের কোন সন্তান সন্ততি জন্মিল না; ভ্রাতৃদ্বয়ের এই কষ্টের জন্য সাহাজী মহাশয় সময় সময় অনুতাপ ভোগ করিতেন।

সাহাজী মহাশয় বাড়ীতে ও যেখানে যথা সম্ভব সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্রতী ছিলেন, যথা সাধ্য অতিথি সেবা, দরিদ্রকে যথাযোগ্য দান, বিপন্ন জনের উপকার, দেব দ্বিজে ভক্তি—ইহাই তাঁহার জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। কোন উপলক্ষে বিবিধ প্রকার খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অকাতরে লোকজনকে খাওয়াইয়াছেন, উভয় স্থানে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করাইয়া মহোৎসব করিয়াছেন,সাধ্যানুসারে এসকল কার্য্যে তাঁহার কোন ত্রুটি নাই। সাহাজী মহাশয় বয়োধিকতা হেতু ঘরে বসিয়া বসিয়াই কাজ কর্ম্ম দেখিতেন এবং গুরুদেব প্রদত্ত ইষ্ট মন্ত্র জপ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। এই সময় তথাকার সমুদয় কারবার ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেশে আসিলেন। এই ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল, একদিন রাত্রি তৃতীয় প্রহরে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখিলেন যে "ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান, মাথায় দীর্ঘ জটা, শরীরে ভস্মমাখা, হাতে ত্রিশূল মহাতেজঃপুঞ্জশালী এক ব্যক্তি তাঁহার শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন—উদ্ধব! তোমার বাসনা পূর্ণ হয় নাই কি? আর কতদিন এইভাবে থাকিবে, সময় অতি নিকট, তুমি প্রস্তুত হও।" পরদিন প্রাতে সাহাজী বিশেষ যত্নের সহিত সর্ব্ব প্রকার কাজ কর্ম্মের বিধি বিধান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে কার্য্যস্থল হইতে ভাই, পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে বাড়ী আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। যথা সময় তাঁহারা সকলে বাড়ী পৌঁছিলেন। সকলকে একত্র সমবেত করিয়া যথা বিহিত উপদেশ দিয়া বলিলেন "আমি অভাবে এসমস্ত কার্য্যের ভার সকলই তোমাদের স্কন্ধে পড়িবে, অতএব তোমরা মনোযোগ সহকারে সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লও, কারণ আমার সময় প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ি যেখানে যাহা কিছু অন্যের অজ্ঞাতভাবে ছিল তাহা সাহাজী মহাশয় ভ্রাতা ও পুত্রদিগের সমীপে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য সিন্দুক খুলিবার চাবি তাঁহার স্ত্রীর নিকট দিয়া বলিলেন 'সমস্ত এখানে লইয়া আইস।' নিজহাতে যাহাকে যাহা দিবার দিয়া বলিলেন "আমি জীবনের এই সময় মধ্যে বহু পরিশ্রম করিয়া তোমাদের জন্য যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, আমার অভাবে তাহা তোমরা সদ্ভাবে সকলে উপভোগ করিতে সমর্থ হও ইহাই ভগবানের নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা। যত সত্বর সম্ভব তোমরা আমার আত্মীয় স্বজন সকলকে আমার সহিত দেখা করার জন্য আনিতে পাঠাও।" সাহাজী মহাশয় তাঁহার টাকাকড়ি ধন সম্পত্তি সমস্তই ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এদিকে তাঁহার ইষ্টদেবের চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন কাজ রহিল না। সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার ইষ্টমন্ত্র জপ করেন এবং সৎকার্য্যানুষ্ঠানে ব্রতী থাকেন। সাহাজী মহাশয়ের শরীরে কোন ব্যারাম ছিল না, কিন্তু স্বপ্নটী দেখা অবধি তাঁহার শরীরের বল ও লাবণ্য কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। সাহাজী মহাশয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার সেই স্বপ্নের ফল ফলিবার অধিক দিন বাকী নাই। অতএব অল্প সময় মধ্যে যাহা কিছু সৎকার্য্য করা দরকার তাহার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, হরিনাম কীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ,

বৈষ্ণব ভোজন, দরিদ্রে দান ইত্যাদি নিত্য চলিতে লাগিল এবং আত্মীয় বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে সংবাদ দিয়া আনিয়া তাঁহাদের নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

সাহাজী মহাশয়ের এবম্প্রকার "চির বিদায়" সংবাদ অল্প সময় মধ্যেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িলে নানা স্থানের বহু লোক নিত্য নিত্য তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। সাহাজী মহাশয় চির অভ্যাসগুণে ইহাতে কোনরূপ বিরক্ত না হইয়া সকলের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়িত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

সাহাজী মহাশয় হঠাৎ একদিন ভ্রাতা ও পুত্রদিগকে ও কর্ম্মচারী-বর্গকে ডাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি সামান্য একটী মুদি দোকান হইতে অধ্যবসায়গুণে ভগবান কৃপায় এই ধন সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছি, তোমরা রক্ষা করিতে পারিলে বংশ পরম্পরায় ইহা দ্বারা সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতে পারিবে। সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিয়া আমার পথ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিও। স্বার্থপরবশ হইয়া কেহ কখনও বঞ্চনার কার্য্য করিও না; স্বর্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, অলসতা, অভিমান প্রভৃতি যাহাতে তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তৎপ্রতি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। সকলের সমবেত চেষ্টাই সংসারে উন্নতির একমাত্র উপায়। এই সকল অভাব হইলে ক্রমে কলহ বিবাদ সৃষ্টি হইয়া তোমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, অতএব তোমরা সকলেই তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সাবধান হইবে। মা কমলার প্রকৃতি চঞ্চল; বিশেষ, কলহ বিবাদ হিংসা দেখিলে তিনি অচিরেই সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যাহাতে সকলে একবুদ্ধি, একপ্রাণ হইয়া বিষয় সম্পত্তির উন্নতিসাধন করিতে পার, একান্ত মনোযোগী হইয়া সেইরূপ কার্য্য করিবে। প্রজানির্ব্বিশেষে পরিবারস্থ সকলের প্রতি সমদর্শী হইয়া নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিও।

অধিক স্থলে স্ত্রীলোকের প্ররোচনায় ভাই ভাই মনোমালিন্য হেতু ভাগভিন্ন হইয়া লোক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তোমরা সেজন্য বিশেষ সতর্ক হইবে। যে কাজে যাঁর বেশী অধিকার সে কাজ তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রাখিবে। কর্ম্মচারী প্রভৃতির প্রতি কোন প্রকার অসদ্-ব্যবহার করিবে না; কর্ম্মচারীগণও স্বার্থপরবশ হইয়া মালিককে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিবে না, সকলে একমত হইয়া মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিবে, বাড়ীতে এবং বিদেশে কাছারী বাড়ীতে বার্ষিক ক্রিয়া কর্ম্ম যাহা আছে তাহা যাহাতে বজায় থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। অধিক আর কথা বলিতে সাধ্য নাই ক্রমেই শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, এখন আর কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। তবুও তোমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এই সব উপদেশ দিলাম। সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে মঙ্গল হইবে।"

২।১ দিন মধ্যেই বোধ হয় তাঁহার এই দেহ ত্যাগ করিতে হইবে ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়া পরিবারস্থ লোকের নিকট বলিলেন "তোমরা ২।৩টী হরিসংকীর্ত্তনের দল আনিয়া আগামী কল্য ভোর হইতে হরিনাম কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত কর। আমার বোধ হয় আগামী কল্য দিবা মধ্যে আমার দেহত্যাগ হইবে। অন্যান্য যাহা যোগাড় করিতে হয় তাহা সমুদয় করিয়া রাখ।"

তদানুসারে একটী পঞ্চবটী প্রস্তুত করিয়া ভোর হইতে তথায় হরিনামকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, এবং সাহাজী মহাশয়ের আদেশানুসারে সেখানে একখানি শয্যাও করা হইল। সাহাজী মহাশয় সকলকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা কেহ আমার জন্য অধীর হইওনা, বেলা ৯টার মধ্যে আহারাদি ক্রিয়া সমাপনের উদ্যোগ কর।" এই কথা বলিয়া তিনি অতি ধীরপদবিক্ষেপে পঞ্চবটী মূলে যাইয়া পৌছিলেন, পঞ্চবটী ঘিরিয়া সমস্ত লোকে সমস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে

লাগিল। সাহাজী মহাশয় সেই পঞ্চবটী মূলে শেষ শয্যায় উপবেশন পূর্ব্বক স্থিরভাবে মালা জপ করিতে লাগিলেন। বেলা অনুমান ১০টা, তখন তিনি পরিবারস্থ লোকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন "আর সময় নাই, তোমরা সকলে এখানে এসো এবং আমার মুখে গঙ্গাজল দাও।" ক্রমে সকলেই তাঁহার মুখে গঙ্গাজল দিতে আরম্ভ করিলে তখনি বিছানায় শয়ন করিয়া 'হরিবল, হরিবল' বলিতে বলিতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া চির দিনের মত নিদ্রিত হইলেন।

আত্মীয় বন্ধু, শত্রু, মিত্র সকলেই উদ্ধবের অভাবে যে কি ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন, তাহা ভাষায় অব্যক্ত বলিয়াই সকলে নির্ব্বাক অবস্থায় ব্যথিত হৃদয়ে বসিয়া রহিলেন। যথা সময়ে অতি সমারোহের সহিত তাঁহার ঔর্দ্ধ দৈহিক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

উদ্ধবের জীবিতাবস্থায় পরিবারস্থ অনেকের মনেই বিষবৃক্ষের বীজ স্থাপন হইয়াছিল, কেবল সুযোগ প্রতীক্ষায় অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। পরে পারিবারিক অন্তর্ব্বিপ্লব নিবারণে অনন্যোপায় বুঝিয়া কর্ত্তারা ঘরবাড়ী জিনিষপত্র বিভাগ করতঃ পৃথকান্ন হইয়া গেলেন, কিন্তু সম্পত্তি ব্যবসায়াদি সমস্ত এজমালীতে রাখিলেন।

উদ্ধবচন্দ্রের অভাবের পর হইতে সকলের সমবেত যত্নে কিছুদিন এষ্টেটের কাজকর্ম্ম পূর্ব্ববৎ চলিতেছিল। এখন পৃথকান্ন হওয়ায় সেই টুকুরও ক্রমে হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল।

এষ্টেটের উন্নতির দিকে তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্ন ক্রমশঃই শিথিল হইয়া আসিতেছিল, এই সময় মধ্যে তেজারতী ব্যবসা অনেক খর্ব্ব হইয়াছে, জমিদারীতেও পূর্ব্বের মত পাঁচরকমের বাজে আয় ছিল না সুতরাং পূর্ব্বের তুলনায় আয় অনেক কমিয়া গিয়াছিল।

সাহাজী মহাশয়গণ বৎসরে একবার কাছারীতে যাইতেন, তথায় গিয়া নিজ নিজ সংসারের প্রয়োজনীয় ধান চাউল, টাকাকড়ি ইত্যাদি

সংগ্রহ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতেন। কর্ত্তা মহাশয়েরা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মচারীগণ তাহা যোগাড় করিয়া রাখিতেন সুতরাং সে স্থানে থাকিয়া আর অধিক দিন কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইত না।

সাহাজী মহাশয় জীবদ্দশায় অনেক সময় বলিতেন "আমার এই এষ্টেটের টাকা যিনি ইহলোক বঞ্চনা করিয়া আত্মসাৎ করিবেন তাঁহার কিছুই থাকিবেনা।" এ বিষয়টী কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া সাবধান হইয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ উদ্ধব চন্দ্রের সেই কথা মনে করিয়া আসল ভাঙ্গিয়া খাইতে সাহস পান না।

দেশে ভাগ বণ্টনের কিছুকাল পরে একটা অসুবিধা উপস্থিত হইয়া সংসার সমধিক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সাহাজী মহাশয়দিগের ভদ্রাসন বাড়ীর উত্তরে নদ ভুবনেশ্বর ক্রমে ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের সেই বহুকালের বাড়ী নদীগর্ভে গ্রহণ করিলে তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া গ্রামান্তরে বাড়ী ঘর করিলেন। সেই পরিবর্ত্তনে উদ্ধব চন্দ্রের বংশধরগণ কতক আটরশীগ্রামে ও রূপনারায়ণের পুত্র মুচিরাম সাহা বাইশরশী গ্রামে বাড়ী করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইভাবে নূতন বাড়ীঘর করিতে সকলেরই যথেষ্ট ব্যয় বাহুল্য হইল। ভগবৎ কৃপায় ক্রমে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি জন্মিয়া পরিবার বৃদ্ধি হওয়ায় সংসারের খরচ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এষ্টেটের উপযুক্ত তত্ত্বাবধান না থাকায় আয় ক্রমেই খর্ব্ব হইয়া আসিল। ব্যয়াধিক্যতা হেতু অবস্থা পূর্ব্বের মত থাকা সম্ভব নহে। অবস্থানুসারে সংসারিক প্রয়োজন মত খরচ, সম্পত্তির লাভে কুলান না হওয়ায় কেহ কেহ ঋণ গ্রস্থ হইয়া পড়িলেন।

এইভাবে কিছুদিন গত হইল, উদ্ধবের বংশধরগণের আটরশীর বাড়ীতে সকলের বসত-বাসে অসুবিধা হওয়ায় দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথ

ও তৃতীয় পুত্র হরেকৃষ্ণ বাইশ রশী গ্রামে আসিয়া পৃথক পৃথক বাড়ী করিলেন। জগন্নাথ কার্য্যখ্যাতি অনুসারে "লালা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদবধি ইঁহার বংশধরগণ "লালা" ও হরেকৃষ্ণ "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হেতু তাঁহার বংশধরগণ "রায়" উপাধি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। উদ্ধব চন্দ্রের ১ম পুত্র সাগর চন্দ্র সাহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না কেবল মাত্র একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল। ২য় পুত্র জগন্নাথ লালার পুত্র বৈদ্যনাথ লালা তাঁহার পুত্র রামনাথ লালা। রামনাথ লালার পুত্র কন্যা না হওয়ায় দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই দত্তক-পুত্রের নাম দীননাথ লালা, দীননাথ লালার পুত্র দ্বারকানাথ লালা, ইনি বর্ত্তমানে মধ্যমহিস্যায় বাউকল কাচারীর খাজাঞ্চী। পূর্ব্বে এই লালাদিগের অবস্থা উন্নত ছিল। বাউকলে ইঁহাদের বিষয় সম্পত্তি ব্যবসা ইত্যাদি ছিল; বাড়ীতে বার্ষিক দোল দুর্গোৎসব হইত, বাড়ীতে গৃহাদি উপযুক্তমতই ছিল; লালাদিগের সেই উন্নতির চিহ্ন স্বরূপ বাড়ীসংলগ্ন পূর্ব্বদিকস্থ বৃহদাকার পুষ্করিণী এখন বর্ত্তমান আছে; যাহা বাবু মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় খরিদ করিয়াছেন। এখন কালসহকারে তদ্রূপ কিছুই নাই, তবে মোটামুটী মধ্যবিত্ত অবস্থায় একরূপ আছেন। তৃতীয় পুত্র হরেকৃষ্ণ রায়, তাঁহার পুত্র মৃত্যুঞ্জয়, রামজয়, ধনঞ্জয়, রতনজয় রায়। ধনঞ্জয় ও রতনজয় রায় নিঃসন্তান ছিলেন, ১ম পুত্র মৃত্যুঞ্জয় রায়ের ২টী পুত্র, ভৈরবচন্দ্র ও রাস-বিহারী রায়। ভৈরবচন্দ্রের ২টী পুত্র ঈশানচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র রায়। রাসবিহারী রায়ের একমাত্র পুত্র রাধিকানাথ রায়, ঈশানচন্দ্র রায়ের ১টী মাত্র পুত্র শ্রীশচন্দ্র রায়, বর্ত্তমানে তিনি স্কুলে পড়িতেছেন। মহেশচন্দ্র রায়ের পুত্র হরেন্দ্রচন্দ্র রায় ও যোগেশচন্দ্র রায়। বর্ত্তমানে ইঁহারা সকলেই ৮ রশীর বাড়ীতে বসবাস করেন। রাসবিহারী রায় মহাশয়ের পুত্র রাধিকানাথ রায় নিঃসন্তান; তিনি বর্ত্তমানে খানখানাপুর ষ্টেশনের

নিকটবর্ত্তী খোলাবাড়িয়া নামক স্থানে নিজ বাড়ীতেই আছেন। হরেকৃষ্ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র রামজয়; রামজয়ের দুইটী পুত্র; প্রথম পুত্রের নাম বৈকুণ্ঠ রাম রায় ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম নীলকণ্ঠ রায়। তাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধিবলে জমিদারী কার্য্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন; তাঁহাদের কার্য্য প্রভায় তাঁহারা "রায় চৌধুরী খ্যাতিলাভ করেন। সেই হইতে তাঁহাদের বংশধরগণ "রায় চৌধুরী" বলিয়া পরিচিত। বৈকুণ্ঠরাম রায় চৌধুরী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী ও কন্যা রাধারাণী চৌধুরাণী। ফরিদপুর টাউনের নিকট গোয়াল চামট নিবাসী জমিদার হরিনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত রাধারাণীর বিবাহ হয়; চৌধুরী মহাশয় অপুত্রক বিধায় এক দত্তক পুত্র রাখেন; তাঁহার নাম কৈলাসচন্দ্র চৌধুরী, তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নাম কিশোরীলাল চৌধুরী ও ননীগোপাল চৌধুরী। বর্ত্তমানে কিশোরী বাবুর দুইটী পুত্র ও এক কন্যা মাত্র। ননী বাবু স্কুলে পড়িতেছেন। মহিমাচন্দ্র পিতার একমাত্র পুত্র, ভাগ্যক্রমে তাঁহার কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই, একটী মাত্র কন্যা সন্তান জন্মে, তাঁহার নাম শ্রীমতী মুঞ্জরী সুন্দরী, ঢাকা জিলায় নয়াবাড়ীর জমিদার মেঘনাদ সাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী সংসারে অপুত্রক বিধায় দত্তক গ্রহণে বাধ্য হন; ঐ দত্তক পুত্রের নাম মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী। মহেন্দ্র বাবুর চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা সন্তান লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম অবিনাশচন্দ্র, দ্বিতীয় ভূপতিশ্চন্দ্র, তৃতীয় সুকুমার, চতুর্থ গৌরগোপাল; কন্যাদ্বয়ের নাম প্রিয়বালা ও স্বর্ণবালা। বাবু মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী তিন পুত্র ও দুইটী কন্যার যথাকালে যোগ্যস্থানে বিবাহ দিয়াছেন। অবিনাশ বাবুর একটী কন্যা রামরঙ্গিনী ও ভূপতিশ্চন্দ্র বাবুর একটী কন্যা এবং দুইটী পুত্র; প্রথম ননীগোপাল ও ২য় খোকাবাবু। মহেন্দ্রনারায়ণ বাবু উপযুক্ত ঘরে কন্যা দুইটীকে বিবাহ

দিয়াছিলেন। ভাগ্যদোষে কন্যা দুইটী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

রামজয় রায়ের দ্বিতীয় পুত্র নীলকণ্ঠ রায় চৌধুরী, নীলকণ্ঠ রায় চৌধুরীর দুইটী মাত্র পুত্র, প্রথম রাজেন্দ্রচন্দ্র; দ্বিতীয় দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, কন্যা মুক্তারাণী ও জগৎরাণী চৌধুরাণী। রাজেন্দ্র বাবুর ক্রমে সাতটী কন্যা জন্মে; কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। পরিশেষে তিনি দত্তকগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম রমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী। দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অপুত্রক অবস্থায় অকালে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহারও দত্তক রক্ষা হইয়াছে। তাঁহার নাম দক্ষিণারঞ্জন রায় চৌধুরী। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন বয়সে বড়। দক্ষিণা বাবুর দুইটী কন্যা, প্রথম কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। রমেশ বাবুর দুইটী পুত্র প্রথমটীর নাম রামচন্দ্র, দ্বিতীয়টীর নাম খোকাবাবু।

রঘুরাম সাহার তৃতীয় পুত্র গোকুলচন্দ্র সাহা; তাঁহার একমাত্র পুত্র নরোত্তমবাবু। ইনি কার্য্যগতিকে "বাবু" উপাধিতে খ্যাত হন। তদবধি ইহাঁর বংশধরগণ "বাবু" বলিয়া পরিচিত। নরোত্তম বাবুর পুত্র জীবনকৃষ্ণ বাবু, জীবনকৃষ্ণ বাবুর পুত্র বিশ্বম্ভর বাবু; বিশ্বম্ভর বাবুর একমাত্র পুত্র রাজবল্লভ বাবু। রাজবল্লভ বাবু বর্ত্তমানে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন।

রঘুরাম সাহার দ্বিতীয় পুত্র রূপনারায়ণ সাহা, রূপনারায়ণ সাহার পুত্র মুচিরাম সাহা শিকদার। মুচিরাম কোন কারণে শিকদার উপাধি লাভ করেন। সেই হইতে ইহাঁর বংশধরগণ "শিকদার" বলিয়া পরিচিত। মুচিরামের দুই পুত্র ১ম সাফলচাঁদ ২য় হুকুমচাঁদ শিকদার। হুকুমচাঁদ শিকদারের দুই পুত্র প্রথম গোপীনাথ ও দ্বিতীয় দুর্গাপ্রসাদ শিকদার। গোপীনাথের একমাত্র পুত্র—হরিনারায়ণ শিকদার, তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদ শিকদার

মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শশীভূষণ শিকদার, তাঁহার একমাত্র পুত্র ননীভূষণ শিকদার ও কন্যা গৌরী দাসী। গৌরী দাসীর বিবাহ যথাকালে ফরিদপুর গোয়াল চামট হরেন্দ্রচন্দ্র সাহার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

মুচিরামের প্রথম পুত্র সাফলচাঁদ শিকদারের একমাত্র পুত্র ব্রজনাথ শিকদার, ব্রজনাথের পুত্র আনন্দচন্দ্র শিকদার। ইহারা চারি সহোদর ছিলেন, আর তিনটী অবিবাহিত অবস্থায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আনন্দচন্দ্রের তিনটী পুত্র ১ম যোগেন্দ্র চন্দ্র, ২য় উপেন্দ্র মোহন, ৩য় সুরেন্দ্রমোহন শিকদার, ইহারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভ্রাতা বর্ত্তমান আছেন। প্রথমটীর অকালে মৃত্যু হয়, তাঁহার কেবলমাত্র একটী কন্যা-সন্তান বর্ত্তমান আছে। উপেন্দ্রমোহনের দুই পুত্র ১ম জ্ঞানেন্দ্রমোহন ২য় নৃপেন্দ্রমোহন শিকদার ও কন্যা খুকী বর্ত্তমান আছে। সুরেন্দ্রমোহনের দুই পুত্র ১ম অবণীমোহন, ২য় সুরেশচন্দ্র শিকদার। উপেন্দ্রমোহন বর্ত্তমানে চৌদ্দরশী বড় হিস্যা জমিদারী ষ্টেটে মুন্সী পদে ও সুরেন্দ্রমোহন কলিকাতা হাটখোলা বড় হিস্যার গদী বাড়ীর মোকামী পদে কার্য্য করিতেছেন!

"রায় চৌধুরী বংশ"

অনেক কাল পরে উদ্ধবচন্দ্র হইতে তিন পুরুষ অন্তে রামজয় রায়ের বংশে ক্রমে দুইজন ভাগ্যবান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। রামজয়ের এই পুত্র দুইটীর মধ্যে প্রথমটীর নাম বৈকুণ্ঠরাম ও দ্বিতীয়টীর নাম নীলকণ্ঠ। দুইটী ভাই অতি সুচেহারা সম্পন্ন ছিলেন, তদ্দর্শনে রায় মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত পুত্রদ্বয়কে লালন পালন করিয়া লেখাপড়া শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। বাল্যকাল হইতেই বৈকুণ্ঠরাম অতিশয় শান্ত, ধীর প্রকৃতিপূর্ণ এবং নীলকণ্ঠ চঞ্চল, তেজস্বী,

উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় তৎকালোচিত লেখাপড়া যথাসম্ভব শিক্ষা করেন। শিক্ষা বিধানে ভ্রাতৃদ্বয়ের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছে; এখন দুই ভাই বয়োপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

নীলকণ্ঠ বাল্যকাল হইতেই অতি নির্ভীক, আলস্য হীন, উদ্যমপূর্ণ ছিলেন। কোন কাজ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহার হাবভাব সন্দর্শনে অনেক জ্ঞানী লোকে তখন বলিয়াছেন যে এই ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে ইহা দ্বারা "সাহাজীর" বংশের নাম পুনঃ উজ্জ্বল হইবে।

বহু সরিকের স্থলে বিষয় সম্পত্তির যে দশা ঘটিয়া থাকে, এস্থলে সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে সরিকদিগের মধ্যে অনেকের অবস্থাই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে; তবে নিতান্ত সৌভাগ্য বলিয়া রামজয় রায় মহাশয়ের অবস্থা তেমন খারাপ নয়, তিনি এ পর্য্যন্ত সকল দিক বজায় রাখিয়া চালাইয়া আসিয়াছেন।

এ বৎসর নীলকণ্ঠ রায় চৌধুরী মহাশয় প্রথম বরিশাল জেলায় তাঁহাদের জমিদারী এলাকা পরিদর্শন করিতে যাইবেন, পূর্ব্বেই এই সংবাদ তথাকার সদর কাছারীর প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট জ্ঞাপন করা হইয়াছে, কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আগমন উপলক্ষে যথাযোগ্য ভাবে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইলে নির্দ্দিষ্ট সময় তথায় পৌছিয়া শুভক্ষণে কাছারীতে শুভাগমন করিলেন। নীলকণ্ঠ বাবুর প্রতাপ, আমলা কর্ম্মচারিগণ পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন, আজ তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া সেই সকল কথা প্রত্যেকের মনেই জাগিতে লাগিল। তিনি সদর কাছারীতে থাকিয়া অন্যান্য সকল কাছারীর কর্ম্মচারিগণকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য আদেশ করিলেন। সংবাদ পাইয়া কর্ম্মচারিগণ যথাসময়ে তথায় আসিয়া উপযুক্তভাবে দেখা করিতে লাগিলেন।

নবাগত মালিক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া তাঁহাদের মনে কেমন একটা ভাবের উদয় হইল। নীলকণ্ঠবাবু কেবল কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। মহলে মহলে প্রজাবৃন্দকে সাক্ষাৎ করার জন্য ঘোষণা করা হইল। প্রজাগণ সংবাদ পাইয়া যথাসময়ে সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। তাহাদের সহিত যথাযোগ্যভাবে মিষ্ট আলাপ করিয়া বিদায় করিলেন বটে, কিন্তু আলাপ কালে তাঁহার শরীরস্থ তেজস্বিতার তাড়িৎ তাহাদের হৃদয়ে পুরিয়া দিতেন ; সুতরাং সাক্ষাৎ আলাপে প্রত্যেকের মনেই যেন একটা ভয়-ভীতির সঞ্চার হইত। অল্পদিন মধ্যেই কর্ম্মচারীদিগের ও প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে নীলকণ্ঠবাবুর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইল। নীলকণ্ঠবাবু মনের ভাব গোপন রাখিয়া কাজ করিতে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে আমলাগণের সহিত মিশিয়া কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সদর মফঃস্বলের আভ্যন্তরিক অবস্থার গোপন সন্ধান লইতে লাগিলেন। আমলাগণ তাঁহার এই গুঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্ববৎ ভাবেই কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। অন্যান্য মালিকগণ তথায় গিয়া পূর্ব্ববৎ নিজ নিজ কাজ কর্ম্ম করিয়া বাড়ী ফিরিলেন, কিন্তু নীলকণ্ঠ বাবু আর বাড়ী ফিরিলেন না। তিনি বৎসরকাল সেখানে থাকিয়া তথাকার সমুদয় সন্ধান লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। তথাকার কর্ম্মচারীরা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, নীলকণ্ঠ বাবু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, সুযোগ পাইলেই জ্বলিয়া উঠিবেন। এই ভয়ে কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। নীলকণ্ঠ বাবু এতদিন আত্ম-গোপন করিয়া নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া সকল বিষয় সংগ্রহ করিতেছিলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। কর্ম্মচারিগণ এতদিন অনুকূল বায়ুতে পাল তুলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, এখন বাতাস ঘুরিয়াছে ; সুতরাং তাহারা উপায়হীন অবস্থায় বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন।

নীলকণ্ঠ বাবু বাড়ী ফিরিলেন, তাহাতে আমলাগণের যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।

নীলকণ্ঠ বাবু প্রথমে ও দেশে নিজের এলাকা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, নজর বাজে জমা ইত্যাদিতে যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন বাড়ীতে পৌছিয়া তাহা পিতা মাতার নিকট দিলেন। উদ্ধব চন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে একাল পর্য্যন্ত কেহই এরূপ দক্ষতার সহিত প্রজার নিকট হইতে বাজে জমা করিয়া টাকা আনিতে পারেন নাই। আজ পুত্রের দ্বারা এইরূপ অভাবনীয় ব্যাপার জানিতে পারিয়া রামজয় রায় মহাশয় বিপুল আনন্দ অনুভব করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

নীলকণ্ঠ বাবু কিছু দিন বাড়ীতে থাকিয়া পুনরায় কাছারীতে হঠাৎ যাইয়া পৌঁছিলেন। কর্ম্মচারিগণ তাঁহার এরূপ আগমন বার্ত্তা শ্রবণে আশঙ্কিত হইলেন। যথা সময় কাছারীতে গিয়া উঠিলেন। পথশ্রান্ত হেতু কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া একদিন তথাকার প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া নানা কথা আলাপ করিয়া পরে বলিলেন, মালেক কাছারীতে উপস্থিত থাকিলে প্রজাবর্গের বিচারাদি যাহা কিছু দরবার হইবে সমস্তই তাঁহার সাক্ষাতে হওয়া উচিত। আপনারা এখন হইতে সেই ভাবে কার্য্য করিবেন। আমার অজ্ঞাতে প্রজার বিচারাদি কি কোন বন্দোবস্ত করিবেন না। যাহা কিছু কাজ কর্ম্ম আমাকে জানাইয়া করিবেন। তিনি কর্ম্মচারিগণের প্রতি প্রথম আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। কর্ম্মচারিগণ বিবেচনা করিয়াছিলেন "ছেলে মানুষ আমাদের সাহায্য ব্যতিত কোন কাজ করিতে পারিবেন না।" কিন্তু কয়েক দিন মধ্যেই তাঁহাদের ভ্রম দূর হইল। নীলকণ্ঠ বাবু প্রজাদিগের যতপ্রকার আবেদন নিবেদন তাহা নিজে শুনিয়া বিচার মীমাংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। বিচার বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্য পদ্ধতি এবং দক্ষতা সন্দর্শনে কর্ম্মচারিরা সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। নীলকণ্ঠ বাবু এমন তেজের

সহিত কাজ চালাইতে আরম্ভ করিলেন যে তাহা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। আমলা কর্ম্মচারিগণ ও প্রজাবৃন্দ সকলেই অবস্থানুসারে নূতন ভাবে গঠিত হইতে আরম্ভ হইল। নীলকণ্ঠবাবু এই অল্প বয়সে বিষয় কার্য্যে এতদূর ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন ইহা নিতান্তই অচিন্তনীয় ব্যাপার। তাঁহার কাজ কর্ম্ম হাবভাব দেখিয়া অনেকেই মনে করিত ইনিও বোধ হয় উদ্ধবের মত কোন দৈবশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উদ্ধবের ন্যায় দৈবশক্তি সম্পন্ন না হইলেও তাঁহার ভিতরে যে শক্তি আছে তাহাও কম নহে। তিনি জন্মান্তরের সংস্কার বশে অল্প সময় মধ্যে বিষয় কার্য্যে এতদূর শক্তি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি এত রাজনৈতিক কার্য্য কৌশল শিক্ষা না করিয়া কেমন করিয়া এত দক্ষতা লাভ করিলেন? তাঁহার কার্য্যের ভেদ নীতি বুঝিয়া উঠা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। প্রজাদিগের মনে যাহাতে ভয় ভক্তি দুই থাকে, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

চতুর্দ্দিকে তাঁহার এই অসাধারণ দক্ষতা ও প্রতিপত্তির জ্যোতিঃ পরিব্যাপ্ত হইলে লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে যাইতে ভীত হইতেন। মামলা মোকদ্দমা দাঙ্গা ফৌজদারীতে নীলকণ্ঠ বাবুর বিশেষ রুচি ছিল। তিনি ঐ সব ছাড়িয়া একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তখনকার দিনে একটী কথা কার্য্যে বেশ পরিণত হইত; কথাটী এই "যাঁর লাঠী তাঁরই মাটী" অর্থাৎ "জোর যাঁর মুল্লুক তাঁর"। নীলকণ্ঠ বাবুর ঐ মহাবাক্য কণ্ঠস্থ ছিল। কোন স্থলে কার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ সঙ্ঘর্ষণ বাধিলে যে কোন প্রকারেই হউক তাঁহাকে পরাস্ত না করিয়া ছাড়িতেন না। একারণ ষ্টেটের যথেষ্ট টাকা বাজে খরচ হইত, তৎপ্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি আপন বুদ্ধিতে সব করিতেন, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহার কোন কথা শুনিতেন না।

অন্ত সরিকগণ এ বিষয়ে নীলকণ্ঠের বাবু ভয়ে কোন প্রতিবাদ করিতেন না।

কালচক্রে সময়ে সরিকগণ মধ্যে অনেকরই অর্থ প্রয়োজনে সম্পত্তি বিক্রয় করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। নীলকণ্ঠ বাবু সুবিধা ও সুযোগ মত ক্রমে তাহা খরিদ করিতে লাগিলেন। মাতা রাজলক্ষ্মীর অনুগ্রহে নীলকণ্ঠ বাবুর উত্তরোত্তর সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া ঐ দেশে তিনি একজন গণ্যমান্ত ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে কিছুকাল অতীত হওয়ার পর অবশিষ্ট সরিকগণও নানারূপ অসুবিধা মনে করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি নীলকণ্ঠ বাবুকে দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। এখন এদিকের সকল সরিকের অংশই তাঁহার হস্তগত হইয়াছে; বিত্ত মধ্যে আর কোন সরিক নাই।

রাম জয় রায় মহাশয় বর্ত্তমানে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। নীলকণ্ঠ বাবু দক্ষিণ দেশের কাজকর্ম্ম লইয়াই থাকিতেন। বিশেষ প্রয়োজন মত বাড়ীতে আসিতেন মাত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বৈকুণ্ঠ রাম রায় মহাশয় দেশের কাজ কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। বৈকুণ্ঠ বাবু বাল্যকাল হইতেই নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নিজ অধ্যবসায় গুণে জমিদারী ও তেজারতী কাজকর্ম্ম বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধীয় কাজ কর্ম্ম বিষয় কাগজ পত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অধিকার ছিল। ইনিও অনেক সময় প্রয়োজনমত দক্ষিণ দেশের কাছারীতে যাইয়া ভ্রাতার কাজ কর্ম্মের সাহায্য করিতেন। তত্রস্থ কর্ম্মচারীদিগের হিসাব নিকাশ করার সময় এবং জটিল কোন মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তখন দাদার প্রয়োজন হইত। ষ্টেট সংক্রান্ত কোন জটিল বিষয় মীমাংসা করিতে হইলে, নীলকণ্ঠ বাবু দাদার সহিত পরামর্শ মতে কার্য্য করিতেন। উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও ভক্তি ভালবাসা যথেষ্ট ছিল। দেশের কাজ কর্ম্ম

সম্বন্ধে যাহা কিছু করা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে দাদার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল। যখন যাহা কর্ত্তব্য মনে করিয়া বৈকুণ্ঠ বাবু যে কাজ করিতেন, নীলকণ্ঠ বাবু সে বিষয়ে কখনও দ্বিরুক্তি করিতেন না। "মা কমলার" কৃপায় দু ভাই মিলিয়া মিশিয়া উভয় দিকের কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন।

এই সময় মধ্যে রামজয় রায় মহাশয় যথাকালে পুত্রদ্বয়ের বিবাহ দেন। এখন বার্দ্ধক্য হেতু সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম্মের ভার পুত্রদ্বয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি সর্ব্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। রাম জয় রায় মহাশয় এইভাবে কিছুকাল সংসার সুখ উপভোগ করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই পুত্রদ্বয় সংসার ভার গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন; সুতরাং পিতা অভাবে সেই প্রকার কোন কষ্টে পড়িতে হইল না। দুই ভাই পরামর্শ করিয়া যথাসম্ভব ব্যায়াদি করিয়া পিতৃদেবের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পান্ন করিলেন। এখন হইতে বৈকুণ্ঠ বাবুর শিরে দেশের সমস্ত কার্য্যের ভার বিশেষভাবে চাপিয়া পড়িল। বৈকুণ্ঠবাবু বাড়ী থাকিয়া সুবিধা ও সুযোগ মত তালুক জোত জমা ইত্যাদি সম্পত্তি ক্রমে খরিদ করিয়াছেন এবং এখনও তাহার সেই ইচ্ছা সর্ব্বদা প্রবল, সুবিধা মত বিত্ত পাইলে ক্রয় না করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না। ক্রমে ক্রমে ইনিও দেশের মধ্যে জমিদারী এলাকা বিস্তারিত করিতে লাগিলেন।

বৈকুণ্ঠ ও নীলকণ্ঠ বাবুর এখন উপযুক্ত ভাবে ঘর বাড়ী প্রস্তুত করার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আটরশীর যে বাড়ীতে তাঁহারা নদী-বিস্তৃতির পর আসিয়াছিলেন, সেখানে উপযুক্তভাবে বাড়ী করার স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায়, বিশেষ ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে হইলে অন্য সরিকদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটে ইত্যাদি কারণে, উক্ত বাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১২৭০ সালে বাইশরশী গ্রামে নূতন এক বাড়ী করিয়া

ইমারত প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। ১২৭১ সনে উক্ত আটরশির বাড়ী ত্যাগ করিয়া সপরিবারে নূতন বাড়ীতে আসিলেন।

এই বাড়ীতে আসিবার পূর্ব্বে ১২৫২ সনে বৈকুণ্ঠবাবুর প্রথম পুত্র মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫৮ সনে নীলকণ্ঠ বাবুর প্রথম পুত্র রাজেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় পুত্র দেবেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী ১২৬৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহার দুইটি কন্যা জন্মে। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে মুক্তারাণী ও জগতরাণী রাখা হইয়াছিল। বাইসরশীস্থ নূতন বাড়ী আসিবার কালে মহিমবাবু ১৯।২০ বৎসর রাজেন্দ্র বাবু ১৪।১৫ এবং দেবেন্দ্র বাবু ৮।৯ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। দেশে যেরূপ সম্পত্তি করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিবার জন্য বৈকুণ্ঠ বাবুর সর্ব্বদাই বাড়ী থাকিতে হইত। এখন আর তিনি দক্ষিণ দেশে প্রায়ই যাইতেন না। যথাসময়ে পুত্রের ও ভ্রাতুষ্পুত্র-দিগের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য যত্নের কোন ত্রুটি করেন নাই। এই বাড়ীতে আসিয়া ৺ দোল, দুর্গোৎসব করিয়া প্রতি বৎসর যথোপযুক্ত ব্যয় বিধান করিতেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত উক্ত বার্ষিক ক্রিয়াদি রীতিমতভাবে চলিতেছে।

বৈকুণ্ঠবাবু ও নীলকণ্ঠ বাবু দুইজন একে অন্যের বিরুদ্ধ প্রকৃতির লোক হইলেও উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের কোন অভাব ছিল না। নীলকণ্ঠ বাবুর দাদার প্রতি উপযুক্ত ভয়, ভক্তি ও অন্তরের টান ছিল। তিনি নিজ ক্ষমতায় দক্ষিণ দেশে বহু ধন সম্পত্তি বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া দাদার নিকট কোনরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই কিংবা দাদাকে বঞ্চনা করার কোনরূপ বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। সংসার করিতে যে দুই প্রকার প্রকৃতির লোকের প্রয়োজন ভগবানের কৃপায় এ সংসারে তাহাই বর্ত্তমান, বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে উভয়দিক চলিয়াছে।

যে কারণে সংসারের ভাই ভাই পৃথকান্ন হইতে হয়, ইহাদের সংসারে সে ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে। বৈকুণ্ঠরাম যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, ভাগ্যগুণে তাঁহার সহধর্ম্মিণী জয়কিশোরী চৌধুরাণীও সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন। নীলকণ্ঠ বাবুর সহধর্ম্মিণী আনন্দময়ী চৌধুরাণীর প্রকৃতি স্বামীর সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য ছিল, সংসার বিছিন্নকারী ম্যালেরিয়া নীলকণ্ঠ বাবুর প্রতাপে বিস্তারিত হইতে না পারিয়া একরূপ লুপ্ত ছিল।

গৃহ বিচ্ছেদের কারণ সময়ে নীলকণ্ঠ বাবুর কর্ণ গোচর হইত; কিন্তু তাহাতে তিনি কোনরূপ সহানুভূতি প্রদান করিতেন না। স্ত্রীলোকের উত্তেজনায় বিব্রত হইয়া ভাই ভাই ভাগ ভিন্ন হওয়া তৎকালের পুরুষের পক্ষে একটা লজ্জাকর বিষয় ছিল, বিশেষতঃ এইপ্রকার কার্য্যকে নীলকণ্ঠ বাবু বড়ই ঘৃণা করিতেন। বৈকুণ্ঠ বাবু সর্ব্বদা বাড়ী থাকিয়া পারিবারিক অশান্তি দূর হওয়ার কোনই উপায় ঠিক করিতে না পারিয়া সময়ে ধৈর্য্য চ্যুত হইয়া পড়িতেন। সময়ে সময়ে নীলকণ্ঠ বাবুকে বলিতেন, "ভাই! পারিবারিক কলহে সময়ে তোমাকে বিশেষ অশান্ত ভোগ করিতে হয়। যখন স্ত্রীলোকদিগের পৃথকান্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে তখন যতদিনে হউক ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে। অতএব যাহাতে, এই অশান্তি দূর হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করাই কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত। ইহার উত্তরে নীলকণ্ঠ বাবু বলিয়াছেন "দাদা! আমি স্ত্রীলোকের কথায় বাধ্য হইয়া পৃথকান্ন করিয়া দিব একথা কখনও মনে স্থান দিবেন না। একান্নে থাকিতে যদি কাহার তেমন অসুবিধা বোধ হয়, তবে তিনি পৃথক ভাবে থাইতে পারেন, আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন কিছুই ভাগ বণ্টন করিব না।" বৈকুণ্ঠ বাবু কনিষ্ঠের এতাদৃশ ভক্তি ও মমতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন।

এই দেশে যে বৎসর নূতন বাড়ী ঘরের সংস্কার হইতে লাগিল তাহার পূর্ব্বেই নীলকণ্ঠ বাবু সে দেশে বিশেষ ভাবে কাছারী বাড়ী প্রস্তুতের ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার এলাকা মধ্যে প্রত্যেক কাছারীর দরজা উপযুক্ত রূপে নির্ম্মাণ করাইয়া বাউকল সদর কাছারীতে একটী দালান ও অন্যান্য গৃহাদি প্রস্তুত করাইয়া দিঘী, পুষ্করিণী কাটাইয়া, নানাপ্রকার বৃক্ষাদিতে শোভিত বাগান প্রস্তুত করাইয়া উপযুক্ত কাছারী বাড়ী করিয়া তুলিয়াছেন। এখন সর্ব্ববিষয়ে কাছারী বাটী নীলকণ্ঠ বাবুর উপযুক্ত যোগ্য কাছারী হইয়াছে।

ষোল আনা সম্পত্তি নীলকণ্ঠ বাবুর হস্তগত হওয়ার পর হইতে তিনি সমধিক উদ্যমে কাজ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ বাবুর শাসনেও ভয়ে দেশ কম্পিত; ভিন্ন এলাকার প্রজারাও নীলকণ্ঠ বাবুর নামে চমকিয়া উঠিত। তাঁহার এই দুর্দ্দান্ত শাসন হইতে ভিন্ন এলাকার প্রজারও নিস্তার ছিল না। কি ভাবে শাসন সংরক্ষণ করিতে হয়, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন। এরূপ শাসন ও বিচারাদি করিয়া বহু টাকা বাজে জমা করিতে তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন।

নীলকণ্ঠ বাবুর এলাকা মধ্যে বগা কালইয়া প্রভৃতি প্রধান বাণিজ্য স্থান। এস্থানে বহু সাহা জাতির বড় বড় ধনীর কারবার; এখনও বহু ধনীর সেখানে বাণিজ্য স্থান। ঐ ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে নীলকণ্ঠ বাবুর আত্মীয় কুটুম্বও অনেক ছিল। একদা নীলকণ্ঠ বাবু এক ভেদ নীতি খাটাইয়া কালইয়া বন্দরের বড় ধনী ব্যবসায়ী নীলকণ্ঠ বাবুর শ্বশুর গোড়াচাঁদ পোদ্দার মহাশয়কে কোন এক অভিযোগে তলপ দিয়া বিচারান্তে ৫০০৲ শত টাকা অর্থ দণ্ড করিলেন। দণ্ডের টাকা না দিয়া যাইতে পারিবেন না ইহাও রায়ে প্রকাশ করিলেন। রায় শুনিয়া পোদ্দার মহাশয় লজ্জায় অভিমানে নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন। পোদ্দার মহাশয়কে মুক্তি করার জন্য তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টায়ও কোন সুফল

ফলিল না, নীলকণ্ঠ বাবু আরও বলিলেন আজ এক্ষেত্রে তাঁহার সহিত প্রজা মুনিব সম্বন্ধ; অন্য সম্পর্ক ভুলিয়া উপস্থিত কার্য্য করিতে পোদ্দার মহাশয়কে বলুন; অন্যথায় আত্ম-সম্মান রক্ষা হইবে না।

পোদ্দার মহাশয় জামাতার এবম্প্রকার ব্যবহারে অর্থ দণ্ড অনিবার্য্য বুঝিয়া লোক দ্বারা দোকান হইতে ৫০০৲ টাকা আনিয়া জামাতাকে জরিমানা যৌতুক দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে দোকানে যাইলেন। শ্বশুরের প্রতি এরূপ ব্যবহার ও সুশাসনের কথা অল্প সময় মধ্যে মহাজনদিগের শ্রুতিগোচর হইল। এই কঠোর শাসন দেখিয়া ভয়ে সকলের আত্মা কাঁপিয়া উঠিল। পোদ্দার মহাশয় লজ্জা, অভিমানে ও টাকার শোকে সেদিনে স্নান আহার করিলেন না, তিনি কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন; বলা বাহুল্য এইরূপ ভাবনায় দিন কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে নীলকণ্ঠ বাবু জনৈক লোক পাঠাইয়া অতি গোপনে শ্বশুর মহাশয়কে কাছারীতে আসিতে আদেশ করিলেন। প্রেরিত লোকে আদেশ জ্ঞাপন করা মাত্র পোদ্দার মহাশয় যেন স্পন্দন-হীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রেরিত লোকে বলিল, "নূতন আর কোন চিন্তার কারণ নাই। আপনি অতি গোপনে সত্বর আসুন, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।" পোদ্দার মহাশয় আর চিন্তা করিতে সময় পাইলেন না। ঐ অবস্থাতে নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রেরিত লোক সঙ্গে জামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। নীলকণ্ঠ বাবুর শ্বশুর মহাশয়কে যথাযোগ্য আসন দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর নীলকণ্ঠ বাবু শ্বশুর মহাশয়কে বলিলেন "আপনি আমার ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এই কার্য্য করিয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" এই বলিয়া পোদ্দার মহাশয়কে সেই ৫০০৲ শত টাকা দিয়া বলিলেন, আপনি এই টাকা লইয়া অতি গোপনে দোকানে চলিয়া যান। এই বিষয় যেন

ঘুণাক্ষরে কোথাও প্রকাশ না হয়; তদপ্রতি বিশেষ সাবধান থাকিবেন।" পোদ্দার মহাশয় অন্ধকারে একাকী জামতার আদেশ মত টাকা লইয়া বাসায় পৌছিয়া গোপনে টাকা সিন্দুকে রাখিয়া দিলেন। শ্বশুরের প্রতি এরূপ আচরণ অল্প সময় মধ্যেই সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছিল। তাহাতে সকলেই ভয়ে স্তম্ভিত হইল; শ্বশুরের প্রতি যিনি এরূপ আচরণ করিতে পারেন, তাঁহার নিকট আর অন্য কাহার অনুগ্রহের আশা নাই। ইহার পর হইতে স্বজাতি ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে আচার বিচারে কাহারও জরিমানার টাকা আদায় করিতে আর বেগ পাইতে হয় নাই। কাহার নামে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি পরিমাণ মত একটা তোড়ায় টাকা বান্ধিয়া বাসায় রাখিয়া নীলকণ্ঠ বাবুর সমীপে বিচারার্থে যাইতেন, যেন আবশ্যক হইলে লোক পাঠান মাত্র টাকা লইয়া যাইতে পারে।

ফৌজদারীতে নীলকণ্ঠ বাবু চির অভ্যস্থ ছিলেন। বহুদিন যাবৎ নানারূপ ফৌজদারী মামলা মোকদ্দমা করিয়া আসিতেছেন, একাল প্যর্যন্ত ভগবৎ কৃপায় কোনস্থলে অপদস্থ হন নাই বলিয়া দিন দিন তাঁহার সাহস বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। সেই সময়ে একটী দাঙ্গা করিয়া নীলকণ্ঠ বাবু ফৌজদারীতে আসামী হইলেন। নীলকণ্ঠের অত্যাচার উৎপীড়নে বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। নীলকণ্ঠকে কোন কায়দায় পাইলে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিবেন, পূর্ব্ব হইতেই সে ষড়যন্ত্র ছিল। এইবার এই মোকদ্দমায় সেই আশা মিটাইবার অভিপ্রায়ে মোকদ্দমাটী বিচার জন্য নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। ভাবগতিক দৃষ্টে নীলকণ্ঠ বাবু বুঝিতে পারিলেন, এবার সাহেব আমাকে সহজে ছাড়িবে না। অতএব ইহার একটা প্রতিকার করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় তিনি অনেক তদ্বির করিলেন, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল।

ব্যাঘ্র পিঞ্জরে আবদ্ধ হইলে তাহার স্বভাব ভুলিয়া কখনও সাম্যভাব ধারণ করে না। পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল মাত্র। নীলকণ্ঠ বাবু উপযুক্তরূপে মোকদ্দমার তদ্বির করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কোন ফল ফলিল না। সাহেব সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ পূর্ব্বক নীলকণ্ঠের ৩ মাসের কঠিন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। নীলকণ্ঠ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া জেলে যাইতে বাধ্য হইলেন। তদপর অবিলম্বে কাগজপত্রের নকল লইয়া ঢাকায় আপীল দায়ের করা হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর নীলকণ্ঠের প্রতি এই কঠোর আদেশ প্রদান করিয়া নিজ পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র মুক্ত হইলে প্রতিহিংসা সাধন করিবে একথা সুনিশ্চিত। তখন আমার পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। অতএব সত্বর বদলী হইয়া স্থানান্তরে যাওয়া ব্যতীত অন্য আর কোন উপায় নাই। সাহেব এই সব আলোচনা করিয়া তদপর দিবস বদলীর প্রার্থনায় ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট আবেদন করিলেন। সাহেব বুঝিলেন, আপীলে নীলকণ্ঠ বাবু খালাস পাইবে। তবে যে কয়দিন জেলে আছেন, তাহাতে এমন করিয়া দেওয়া চাই যেন বাকী জীবনে তাহা স্মরণ থাকে। তদপর দিবস পাকা সড়কের সুরকী দুরমুস্ করিতে নীলকণ্ঠ বাবুকে সাহেব আদেশ দিলেন। সেই কাজে নীলকণ্ঠ বাবু নিযুক্ত হইলেন।

জেলের কর্ম্মচারিগণ সকলেই নীলকণ্ঠ বাবুকে জানেন, সুতরাং তাঁহারা সকলে যথাসাধ্য তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। জেলের কর্ম্মচারিগণ যে নীলকণ্ঠ বাবুর বাধ্য হইবে ইহা সাহেব বুঝিতে পারিয়া নিজেই নীলকণ্ঠ বাবুর কার্য্য পরিদর্শন করিতে যাইতেন।

দিবা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যদেবের প্রখর তাপে ধরণীবক্ষ উত্তপ্ত হইয়াছে,

এই সময় নীলকণ্ঠ বাবু দুরমুজ হাতে করিয়া রাস্তার উপর রাজ আদেশ পালন করিতে বসিয়াছেন। নীলকণ্ঠ বাবুর হেপাজতের জন্য জেলের জনৈক সিপাহী সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। ঘুষের লোভে সিপাহী নিজের যে ছাতা ছিল, তদ্দ্বারা নীলকণ্ঠ বাবুকে ছায়া প্রদান পূর্ব্বক রৌদ্র নিবারণ করিতেছে। সাহেব এই ব্যাপার দূর হইতে দেখিয়া অতি সন্তর্পণে হঠাৎ সিপাহীর পশ্চাৎদিকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব নিকটে পৌঁছিলে, তাঁহার পদশব্দে সিপাহী পিছনে চাহিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সিপাহী সেলাম দিবার সঙ্গে সঙ্গে সাহেব সবেগে নিকটে গিয়া হস্তস্থিত বেতের ছড়ি দ্বারা প্রথম সিপাহীকে কয়েকটী কশাঘাত করিয়া বলিলেন—"ড্যাম! তোম্ এয়ছা মাফিক কাম কিয়া!" এই ব্যাপার দেখিয়া নীলকণ্ঠ বাবু তখন নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং হস্তস্থিত দুরমুজ অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সাহেবের প্রতি ধাবিত হইয়া "আগাড়ী তোম্‌কো দুরমুজ করেগা" বলিতে বলিতে আক্রমণ করিলে পর, সাহেব বেগতিক বুঝিতে পারিয়া সরিয়া পড়িলেন। নীলকণ্ঠ বাবু ক্রোধে অধীর হইয়া সাহেবের পশ্চাদ্ধাবমান হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে অন্য লোক আসিয়া তাঁহাকে বারণ করিলে ক্রোধ সম্বরণ হইল। সাহেব যাইয়া তাঁহার এজলাসে বসিলেন।

সাহেব এতদিন দূর হইতে নীলকণ্ঠের তেজস্বীতার কথা শুনিয়াছেন বটে, আজ স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল। বাঙ্গালী হৃদয়ে যে তেজবীর্য্য আছে বলিয়া সাহেবের বিশ্বাস ছিল না, আজ নীলকণ্ঠের সংহার মুর্ত্তি দেখিয়া সাহেবের সে ধারণা দূর হইল। তিনি এজলাসে বসিয়া অন্যান্য লোকের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলে, তাঁহারা সকলেই বলিলেন "সাহেব! কাজটী বড় ভাল হয় নাই। নীলকণ্ঠ রায়ের অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই; আপনি সর্ব্বদা বিশেষ সাবধান না

হইলে বিপদ অনিবার্য্য।" সাহেব ইহার পর কুঠীতে যাইয়া উপযুক্ত পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত পূর্ব্বক তথায় কাজ করিতে থাকিলেন। কয়েকদিন পরে সাহেবের বদলীর হুকুম আসিয়া পৌছিলে, সাহেব সত্বর চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া অবিলম্বে বরিশাল জেলা ত্যাগ করিলেন। সাহেবের বদলীর কথা শ্রবণে নীলকণ্ঠ বাবু অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন।

সাহেব চলিয়া যাওয়ার দুই দিবস পরই আপীলের মোকদ্দমার সংবাদ পৌছিল, "নীলকণ্ঠ রায় বেকসুর খালাস"। সাহেব জিলা ত্যাগ করিয়া বদলী হওয়াতে নীলকণ্ঠ বাবু মুক্তি সংবাদে তেমন সুখী হইলেন না। নীলকণ্ঠ বাবু জীবনে অনেক ফৌজদারী মামলা করিয়াছেন, সমস্তই গ্রহবলে পার হইয়া আজ এবার সাহেবের চেষ্টায় তাঁহার জীবনে একটা দাগ পড়িল। জীবনে দাগ পড়িল বলিয়া তাঁহার অণুমাত্র উদ্যম ভঙ্গ হইল না; বরং আরও পুনঃ উদ্যমে কাজ চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিতেন, জেল-হাজত পুরুষের জন্য—স্ত্রীলোকের জন্য নহে, জেল যে ভয় করে সংসারে সে কাজ করিতে পারে না। কারণ কাজ করিতে গেলে ভাল মন্দ হইয়াই থাকে।

অন্য এক সাহেব বরিশালে ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন। এই সাহেব ভূতপূর্ব্ব সাহেবের বদলীর কাহিনী শ্রবণে পরিণাম চিন্তা করিয়া অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন।

নীলকণ্ঠের সংঘর্ষণে অনেক ধনী ধনবিত্ত হারাইয়া বিব্রত হইয়াছেন। সুতরাং সহজে কেহ তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে অগ্রসর হইত না। নীলকণ্ঠবাবু ছলে বলে কলে কৌশলে নিজ কার্য্য উদ্ধার করিতে চির-অভ্যস্ত ছিলেন। নিজ এলাকার [illegible] বন্দোবস্ত করিয়া বহু টাকা জমা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। [illegible] ব্যক্তিক [illegible] কয়েকটা বাজে জমা বসাইলেন। আদায় তহশীল করিতে যাহা কিছু বিধি বিধান করা আবশ্যক, তাহার উপযুক্ত [illegible] নির্দ্ধারিত করিলেন।

বহু চেষ্টায় নীলকণ্ঠবাবু তাঁহার উন্নতির মাত্রা প্রায়ই পূর্ণ করিয়াছেন। ৺উদ্ধবচন্দ্রের মৃত্যুর পর আজ প্রায় শতাব্দী বর্ষের পর এই বংশে বৈকুণ্ঠবাবু ও নীলকণ্ঠবাবু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নামে এখনও হাজত সিন্নি আসিতেছে। উদ্ধবচন্দ্র অস্তমিত হইলে তিন পুরুষ ক্রমে তাঁহার প্রতিভা ক্ষীণ হইয়া তিমিরাচ্ছন্ন প্রায় হইয়াছিল। তৎপর শুভক্ষণে সেই বংশে বৈকুণ্ঠ, নীলকণ্ঠবাবু দুইটী রত্ন জন্মগ্রহণ করায় সেই অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। স্বর্গীয় উদ্ধবচন্দ্র হইতে ও দেশে ইঁহাদের হাওলা, নিম হাওলা ও সোদ হাওলা প্রভৃতি সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু খারিজা তালুক খুবই কম ছিল। নীলকণ্ঠবাবু ওদেশে যাওয়া অবধি মনে মনে সর্ব্বদা এই আকাঙ্ক্ষা করিতেন যে, "এদেশে একটা জমিদারী পাইলে খরিদ করিতাম।" বরিশাল জিলার উজিরপুর গ্রাম নিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব ঈশ্বরচন্দ্র রায় কালিকাপুর পরগণার জমিদারীর জমিদার ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সেই সম্পত্তি বাকি খাজনায় পড়িয়া নিলাম হওয়ায় নীলকণ্ঠবাবু তাহা সর্ব্বোচ্চ মূল্যে কালেক্টরের প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করিলেন। সেই হইতে ওদেশে জমিদার বলিয়া ইঁহারা পরিচিত।

এখন উভয় দেশেই ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি মান গৌরব দিন দিন শশী-কলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্ব হইতেই ইঁহাদের ষ্টেটে আমলা কর্ম্মচারিগণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যবংশীয় ভদ্রলোকই থাকিতেন, ইঁহারা সাহা বংশীয় বড়লোক, জমিদার হইলেও ইঁহাদের ভদ্রলোকের সহিত ঘনিষ্টতা বেশী; চিরকাল ঐ সব ভদ্র জাতিকে ইঁহারা যথোচিত সম্মান করিতেন, ভদ্রবংশীয় প্রতিবাসীদিগের সহিত ইঁহাদের বিশেষ সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহার আছে। এই সকল সদ্গুণে ইঁহারা ভদ্রলোকের নিকট আদরণীয় ছিলেন।

তিনি পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিয়া সংসারের মায়া পরিত্যাগ

পূর্ব্বক পুত্রদ্বয়কে দাদার হাতে সমর্পণ করিয়া ১২৭১ সনে অগ্রহায়ণ মাসে জ্বররোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

এই প্রকারে শোকাকুলভাবে মাস পূর্ণ হইয়া আসিলে বৈকুণ্ঠবাবু অতি বিষাদচিত্তে কর্ত্তব্যপালনে বাধ্য হইলেন। যথাকালে নীলকণ্ঠ বাবুর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যথাযোগ্যরূপে সম্পন্ন হইল। বৈকুণ্ঠবাবু জ্যেষ্ঠ হইলেও বিষয় কার্য্যের গুরুভার তাঁহাকে বহন করিতে হয় নাই; এখন নীলকণ্ঠবাবুর অভাবে সকল দিকের ভারবোঝা তাঁহার শিরে আসিয়া চাপিল।

বৈকুণ্ঠ বাবু চিরদিনই শান্তিপ্রিয় লোক বটে, কিন্তু এতদিনে ঝঞ্ঝাট আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যথাসাধ্য উভয় দিকের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নীলকণ্ঠ বাবু দক্ষিণ দেশস্থ জমিদারীতে যেরূপ শাসন বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতিভা শীঘ্র অন্তর্হিত হইবে না। সুতরাং আমলা কর্ম্মচারী-গণ দ্বারাই এক প্রকার সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। নীল-কণ্ঠ বাবুর পুত্র দুইটী নাবালক, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার আব্দারই জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় রক্ষা করেন। বাহিরের কাজকর্ম্ম সুশৃঙ্খল ভাবেই চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু পারিবারিক গোলযোগের শান্তি নাই। নীলকণ্ঠের শাসনে সকলে নীরব ছিলেন, এখন আর সে ভয় নাই; সুতরাং এ ক্ষেত্রে সে গতি রোধ করা বৈকুণ্ঠ বাবুর পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িল। পরে তিনি নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া পৃথক হইতে বাধ্য হইলেন।

নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের সময় ভবিষ্যৎ বিবেচনা পূর্ব্বক দুই ভ্রাতার বাস উপযোগী পৃথক পৃথক দালান প্রস্তুত করাইয়া দুইটী চতুশালা নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। পশ্চিমদিকের খণ্ডে বৈকুণ্ঠ বাবু ও পূর্ব্ব দিকের খণ্ডে নীলকণ্ঠবাবু বসবাস করিতেন; উপস্থিত বণ্টকে বাড়ীর

মধ্যের চতুঃশালা তদবস্থায় থাকিল, তৈজস পত্র ইত্যাদি যথারীতি বণ্টক করা হইয়াছিল। বার্ষিক ক্রিয়াদি দেবার্চ্চনা এজমালে থাকিল, বর্হির্বাটী ও তদসংলগ্ন স্থান বিভাগ হইল না। স্বদেশে ও বিদেশে বিষয় সম্পত্তি ও নগদ টাকা অংশানুসারে বৈকুণ্ঠ বাবু নিজের নীলকণ্ঠ বাবুর পুত্র দ্বয়কে অর্দ্ধাংশ বণ্টক করিয়া দিয়া দিলেন, কিন্তু সম্পত্তির আদায় ওয়াশীলের কার্য্য একত্র থাকিল, তহশীল কর্ম্মচারী ও ক্রমে পৃথক পৃথক করা হইল। ১২৭৩ সালে এই ভাবে ভাগ বণ্টক করিয়া দিয়া বৈকণ্ঠ বাবু পারিবারিক অশান্তি দূর করিলেন।

বিভাগ হইয়া যাওয়ার পর হইতে বাড়ীতে দেওয়ান পেস্কার প্রভৃতি আমলা কর্ম্মচারীও পৃথক ভাবে উভয় হিস্যায় রাখিয়া কার্য্য চালাইতে থাকিলেন। বাড়ীতে ঘর দরজা ইত্যাদি নিজ নিজ প্রয়োজন মত নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইল। বৈকুণ্ঠ বাবুর পুত্রটী এখন বয়োপ্রাপ্ত হইয়াছেন, নীলকণ্ঠ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্র বাবু এখনও নাবালক; সুতরাং পৃথকান্ন হইলেও তাঁহাদের জন্য তাঁহার নিশ্চিন্ত থাকিবার সম্ভব ছিল না। বৈকুণ্ঠ বাবু পিতৃহীন নাবালক ভ্রাতষ্পুত্রদ্বয়কে বাল্যকাল হইতেই পুত্রবৎ স্নেহে লালন পালন করিয়া আসিয়াছেন। এখনও তাঁহার পূর্ব্ব ভাবের কোন অভাব হয় নাই, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছেন।

কিছুকাল এই ভাবে বৈকুণ্ঠ বাবুর তত্ত্বাবধারণে ষ্টেটের কাজ কর্ম্ম চলিতে লাগিল, কিন্তু সেই ব্যবস্থা বেশী দিন স্থির রাখিতে পারিলেন না। নীলকণ্ঠ বাবুর গৃহিণী শক্তিরূপা আনন্দময়ী চৌধুরাণী স্বয়ং জমিদারী পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আনন্দময়ী চৌধুরাণী বুদ্ধিমতি, সাহসী ও তেজস্বিনী ছিলেন, ইঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই বাটীস্থ সকলে খুব ভয় করিত। তিনি ভগবানকে স্মরণ করিয়া স্বর্গীয় স্বামীর পথ অনুসারে বিষয় কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। নরমভাবে চলিলে যে

বিষয় কার্য্য চলে না, তাহা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ধারণা ছিল; যে কৌশলে কার্য্য সিদ্ধ হয় তাহাও তিনি বেশ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সমস্ত নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার চালাইতে লাগিলেন। আমলা কর্ম্মচারী হইতে সাধারণ চাকর চাকরাণীগণ তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। পুত্রদ্বয়ের বাবুগিরী আবদার রক্ষা করিতেন বটে, কিন্তু তাড়নায় তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিয়া শিক্ষা বিধান দেওয়াইতেন। সংসারের আয় ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে, স্বদেশ বিদেশ প্রভৃতি স্থানের খরচ বাদে বার্ষিক যে টাকা আয় হইবে, তাহা প্রতিবৎসর বাড়ীর সিন্দুকজাত না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। অনেক সময় আয় ব্যয় সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আত্মীয় কর্ম্মচারীর নিকট গোপন অনুসন্ধান লইয়া দেওয়ানের নিকট কৈফিয়ত তলব করিয়া তাহা মীমাংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না; সর্ব্বদা প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিতেন, "আমি স্ত্রীলোক বলিয়া আমাকে গোপন করিয়া আপনারা কোন কার্য্য করিবেন না। বিশেষ বিশেষ কার্য্যে আমার অনুমতি ভিন্ন কখনও কোন হুকুম দিবেন না।"

সংসারের গুরুভার বহন করা বড়ই কষ্টকর, কোনরূপ উপলক্ষ থাকিলে এই ভার বহন করিতে অগ্রসর হয় এমন লোক সংসারে বিরল। বৈকুণ্ঠবাবু জীবিত আছেন, ষ্টেটের কাজকর্ম্ম তদ্দ্বারাই চলিতেছে, পুত্র মহিমা চন্দ্র রায় চৌধুরী অতি [illegible] আনন্দে দিন কাটাইতেছেন। মহিম বাবু পিতার একমাত্র পুত্র, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার আদরই পিতার রক্ষা করিতে হইত। মহিম বাবু ইচ্ছা করিয়া যে কোন কাজ করিতেন, তাহাতেই পিতা সন্তুষ্ট থাকিতেন। মহিম বাবু বড়ই পিতৃমাতৃ ভক্ত ছিলেন। মহিম বাবু অতি [illegible] সম্পন্ন স্নিগ্ধ কান্তি [illegible]

[illegible]

রক্ষা করিয়া চলা তাঁহার শৈশব হইতেই অভ্যাস ছিল। বৈকুণ্ঠ বাবু এখন পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঢাকা জিলার কাঞ্চনপুর গ্রামনিবাসী ৺বদনচন্দ্র সাহার কন্যা শিবসুন্দরী চৌধুরাণীর সহিত ১২৭৪ সনে কার্ত্তিক মাসে মহিম বাবুর শুভ পরিণয় কার্য্য শুভযোগে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ উপলক্ষে বৈকুণ্ঠ বাবু যথোচিত ব্যয় বিধান করিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন। এই বিবাহ দিয়া বৈকুণ্ঠ বাবু বেশী দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। রাজেন্দ্র বাবু বিবাহের জন্য পাত্রী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছু দিন চেষ্টার পর নয়াবাড়ী গ্রামনিবাসী বাউল চন্দ্র সাহার কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া উপযুক্ত ব্যয় বিধান করিয়া ১২৭৫ সনে রাজেন্দ্র বাবুর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। রাজেন্দ্র বাবু কর্ম্ম বৈগুণ্য দোষে এই বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিলেন না। বিবাহের কিছু কাল পরেই তাঁহার স্ত্রীকে উৎকট ব্যাধিতে আক্রমণ করিল। বহুদিন পর্য্যন্ত নানারূপ চিকিৎসাদি করিয়া কিছুই ফল পাইলেন না। এই অসুবিধায় কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল, পরে ১২৮২ সনে ফরিদপুর নিবাসী জমিদার বৈকুণ্ঠ নাথ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা কামিনী সুন্দরী চৌধুরাণীকে বিবাহ করিলেন। শেষবার দ্বার পরিগ্রহের পর প্রথম পরিণয়ের স্ত্রী পূর্ব্ব ব্যাধিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

নীলকণ্ঠ বাবু পরলোকগত হওয়ার পর হইতেই বৈদেশিক সম্পত্তির কার্য্য একরূপ চলিতেছে বটে, কিন্তু বাজে আয় ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পড়িল। উপযুক্তভাবে পরিদর্শন অভাবে এইরূপ আয় কমিয়াছে আনন্দময়ী চৌধুরাণী ইহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। বাড়ী থাকিয়া তিনি তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন এমত কোন আশা নাই বিবেচনায় তত্রস্থ কর্ম্মচারিগণ দ্বারাই কোনমতে একাল পর্য্যন্ত তথাকার কাজ চালাইয়াছেন। আনন্দময়ী চৌধুরাণী অবস্থা বুঝিয়া

পূর্ব্ব হইতেই পুত্রদ্বয়কে উপযুক্তভাবে গঠন করিতে ত্রুটী করেন নাই। এখন হইতে রাজেন্দ্র বাবুকে বাউফল পাঠাইবেন এইরূপ পরামর্শ চলিতে লাগিল। রাজেন্দ্র বাবু পিতৃবৎ সাহসী ও তেজপুঞ্জশীল ব্যক্তি ছিলেন। বিদেশে যাইবেন বলিয়া মনে কোনরূপ চিন্তা ভাবনা করিলেন না; বরং স্বীয় জমিদারীর এলাকা পরিদর্শনে যাইবেন বলিয়া হৃদয়ে আনন্দ উপস্থিত হইল। আনন্দময়ী চৌধুরাণী পুত্রকে বাউফল পাঠাইবেন এসম্বন্ধে বৈকুণ্ঠবাবুর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া তথাকার প্রধান কর্ম্মচারীকে রাজেন্দ্র বাবুর আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করাইলেন। রাজেন্দ্র বাবুর আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া তথাকার কর্ম্মচারীবর্গ উপযুক্তভাবে প্রস্তুত থাকিলেন। একদিন শুভলগ্নে রাজেন্দ্র বাবু সঙ্গীয় লোকজন সহ বজরা নৌকা যোগে বাউফল যাত্রা করিলেন। যথাসময় বাউফল কাছারীর ঘাটে রাজেন্দ্র বাবুর বজরা গিয়া পৌছিল। তাঁহার বজরা ঘাটে পৌছিয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক আসিয়া কাছারীর ঘাটে উপস্থিত হইল। আমলাগণ যথারীতি অভ্যর্থনাপূর্ব্বক শুভক্ষণে তাঁহাকে কাছারীতে লইয়া চলিলেন। কিন্তু দর্শকবৃন্দ ভেদ করিয়া রাজেন্দ্র বাবুর যাওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য হইয়াছিল; অতি কষ্টে কাছারীতে পৌছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু কাছারাতে পৌছিয়া উদ্ধবচন্দ্রের উদ্দেশ্যে গদী প্রণাম করতঃ নিজ আসনে উপবেশন করিলেন।

প্রথম দিন তথাকার সকল কাছারীর আমলা কর্ম্মচারিগণ যথাযোগ্য অর্থ নজর দিয়া ক্রমে নবাগত বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজেন্দ্র বাবু তৎকালোচিত লেখা পড়া যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন; তদনুপাতে তাঁহার লোক সমাজে আলাপ করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। তিনি এই অল্প বয়সে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে বেশ শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া সকলে আশাতীত

সন্তোষ লাভ করিলেন। পরদিবস প্রজাবৃন্দ যথাযোগ্য অর্থ নজর প্রদান পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে রাজেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেলাম জানাইয়া গেল। নীলকণ্ঠ বাবুর পুত্র আসিয়াছেন, তিনি কেমন ইহা দেখিবার জন্য নিঃসম্পর্কীয় অনেক ভদ্রাভদ্র ব্যক্তি সমাগত হইত; বাবু ছেলে মানুষ হইলেও তাঁহাদের সহিত যথাযোগ্যভাবে আনন্দ করিতে ক্রটী করিতেন না। রাজেন্দ্র বাবু ছেলে মানুষ হইলে কি হইবে? তাঁহার আলাপ ব্যবহারে জনসমাজে তিনি বেশ উপযুক্ত ছেলে বলিয়াই অল্পসময় মধ্যে রাষ্ট্র হইল।

রাজেন্দ্র বাবু আত্মগোপন করিয়া তত্রস্থ কর্ম্মচারীদিগের ভাবগতি ক্রমে দেখিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর হইল নীলকণ্ঠ বাবু পরলোক-গত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অদ্যাপিও তাঁহার ভীষণ শাসন প্রতিভা বিলুপ্ত হয় নাই, প্রজাগণের ভয়ভীতি যথেষ্ট আছে। তাঁহার বিধি বিধান প্রজাগণ অবনত মস্তকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। তবে আমলাগণ সময় বুঝিয়া স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছেন; দেখিবার উপযুক্ত লোক অভাবে এরূপ দশা ঘটিয়াছে। ইহা নিবারণ করা সহজ নয়, বিশেষ সময় সাপেক্ষ। রাজেন্দ্র বাবু তথাকার অবস্থা যাহা বুঝিতে পারিলেন তাহা কিছুই কাহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। এই ভাবে কয়েক মাস গত হইল, এখন তিনি বাড়ী আসিতে ইচ্ছা করিলেন, তদনুসারে উদ্যোগ আয়োজন করিয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইলেন।

ভগবানের কৃপায় রাজেন্দ্র বাবু নিরাপদে বাড়ী আসিয়া পৌছিলেন, স্নেহময়ী মাতা অনেকদিন পরে প্রাণাধিক পুত্রকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। রাজেন্দ্র বাবু [illegible] বাটীর নজর প্রভৃতি বাবুকে

পাইয়াছি"। মাতা আশাতীত অর্থ দেখিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এ দিকে যেমন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভাসিতে লাগিলেন, এমন সময় অন্যদিকে একটী ভীষণ দারুণ শোক তাঁহার মনে উদয় হওয়ায় অশ্রুনীরে দুইচক্ষু পূর্ণ হইয়া আসিল। মনে মনে নানা কথার উদয় হইতে লাগিল। পতির কথা স্মরণ করিয়া বিশেষ ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রাজেন্দ্র বুঝিতে পারিলে তাঁর মনে কষ্ট হইবে; সেই জন্য তিনি অতিকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া স্বহস্তে টাকাগুলি লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন এবং অন্যান্য জিনিষ পত্র রাখিবারও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

রাজেন্দ্র বাবু কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় মাতা আনন্দময়ী খাওয়ার উপযুক্ত জিনিষাদি রাখিয়া সেখানে বসিয়া আছেন, যথাসময় রাজেন্দ্র বাবু আহার করিতে বসিলেন; তখন মাতা কাছে বসিয়া বাউফলের সমস্ত কথা তুলিলেন। মাতা পুত্রে অনেক কথাই হইতে লাগিল। তথাকার প্রজার ভয় ভক্তি, কর্ম্মচারিগণের ব্যবহার সবিশেষ মার নিকট বলিলেন।

রাজেন্দ্র বাবুর কথা শুনিয়া মাতা বলিলেন, নিজের কাজ পরের হাতে থাকিলে এবং কেহ সেখানে দেখিবার উপযুক্ত লোক না থাকিলে এইরূপই হইয়া থাকে। রাজেন্দ্র! এই অল্প বয়সে আমি তোমাকে বিদেশে পাঠাইয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছি। তুমি সেজন্য মনে কিছু করিও না! যেদিন তোমরা বাল্যে পিতৃহীন হইয়াছ, সেই দিনই তোমার জীবনের একটা সুখের আশা নষ্ট হইয়াছে। এই বিশাল সংসারের গুরুভার এখন তোমার শিরে ন্যস্ত হইয়াছে; সুতরাং তুমি [illegible] করিলে চলিবে না। বিশেষ যত্নের সহিত সকল কার্য্যই

ইহাই অমৃতবৎ মনে করিবে। আমি যেরূপ যাহা করিতেছি তাহা তোমাদের মঙ্গলের জন্য।"

পৃথকান্ন হইয়া যাওয়ায় পর উভয় হিস্যার বাহির বাটীতে দুইটী বৈঠকখানা এবং বাড়ীর দক্ষিণ দিকে দুইটী পুষ্করিণী খনন করিয়া পাকা ঘাট তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পৃথক হওয়ার পর হইতে নিজ নিজ হিস্যায় সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন চলিতেছে। এই সময় নীলকুঠীর সাহেবর ডিহি সদরদী ও ডিহি নগর কান্দাগং দুইটী পত্তনি মহাল বাকী করে নিলাম বিক্রয় হওয়ায় তাহার মধ্যে নগরকান্দা ডিহি বৈকুণ্ঠ বাবু ও সদরদী ডিহি ভাঙ্গা থানা এলাকাধীন ভাঙ্গার বন্দর সহ পত্তনী মহাল আনন্দময়ী চৌধুরাণী খরিদ করিলেন। এই উভয় পত্তনীর মালেক মহারাজা স্যার যতীমোহন ঠাকুর কে টি মহোদয়। এই পত্তনী মহলে বহু বড় বড় ধনী জোতদার ভদ্রলোকের বসতি। উভয় পত্তনী উভয় হিস্যায় খরিদের পর হইতে দেশের মধ্যে ইহাদের প্রতিপত্তি ক্রমে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পূর্ব্ব বৎসর রাজেন্দ্র বাবু বাউফল গিয়াছিলেন, এ বৎসর মহিম বাবু বাউফল যাইবেন বলিয়া পিতার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বৈকুণ্ঠ বাবু উপযুক্ত আয়োজন পূর্ব্বক একখানা বজরা নৌকাযোগে লোকজন অমাত্যবর্গসহ তাঁহাকে বাউফল পাঠাইলেন। তথাকার কর্ম্মচারিগণকে মহিম বাবুর আগমন বার্ত্তা পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করা হইয়াছিল, আমলাগণ তদনুসারে প্রজামহলে ঘোষণাপূর্ব্বক মহিমবাবুর আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। আমলাগণও উপযুক্ত ভাবে মহিম বাবুকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যথা সময় তাঁহার বজরা বাউফলের কাছারী ঘাটে উপস্থিত হইল। আমলাবর্গ তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া শুভক্ষণে কাছারীতে উঠাইলেন।

মহিম বাবুর "বজরা" বাউফল ঘাটে পৌছিয়াছে শুনিয়া বহু ভদ্র-

লোক ও প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহিম বাবু যথাসময় কাছারীতে উঠিয়া "৺উদ্ধব সাহাজীর" উদ্দেশে গদীতে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। কয়েম মাস কাল বাউফল ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিয়া বাড়ীতে আসিয়া পৌছিলেন। মাতৃদেবীর আদেশানুসারে এবারও রাজেন্দ্র বাবুকে বাউফল যাইতে হইয়াছে। বাউফল গেলেই বিবিধপ্রকার আয়ের সম্ভাবনা, দ্বিতীয়তঃ আমলাদিগের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করা বিশেষ প্রয়োজন; তাঁহারা একেবারে ভয়ভীতি শূন্য হইলে স্বার্থ পরবশ হইয়া মালিকের অনিষ্ট করিবেন ইত্যাদি কারণে রাজেন্দ্র বাবুকে পাঠান সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। মাতা ঠাকুরাণীর এই যুক্তি রাজেন্দ্র বাবু সঙ্গত বিবেচনা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এতদিন পর্য্যন্ত নীলকণ্ঠ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথাই সকলের নিকট বলিতেছি, এখন কনিষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্র বাবুর কথা জ্ঞাপন করিতেছি। দেবেন্দ্র বাবু বাল্যে পিতৃহীন হইয়াও মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যত্নে কোন-রূপ অভাব অনুভব করিতে পারেন নাই। তিনি শৈশবাবস্থা হইতেই বড় চঞ্চল প্রকৃতি ও স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। দেবেন্দ্র বাবুকে কলিকাতা পাঠান হইল। তিনি সেখানে থাকিয়া তত্রস্থ স্কুলে পড়েন বটে, কিন্তু লেখা পড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার চালচলন বিলাসিতাতে বেশ অভ্যস্থ হইলেন। দেবেন্দ্র বাবু শৈশব হইতেই দৃঢ় প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যের যুক্তি তর্ক, বুদ্ধি কার্য্যকারী হইত না। ভাবগতি বুঝিয়া মাতা ও ভ্রাতা দেবেন্দ্র বাবুর লেখা পড়া শিক্ষার জন্য চেষ্টায় বিরত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবু কলিকাতায় বাস করিয়া বাবুগিরী বিলাসিতা প্রভৃতি বেশ শিক্ষা করিয়াছেন এবং কলিকাতাস্থ সমবয়স্ক অনেক রাজা মহারাজা বড় লোকের সহিত পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছে। কলিকাতায় যে বড় লোকের বাসস্থান, তাঁহার

সে ধারণা বেশ জন্মিয়াছে। তিনি সর্ব্বদা কলিকাতায় থাকিতে ভাল-বাসিতেন; বাড়ীতে বড় আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন না। দেবেন্দ্র বাবু বাল্যকাল ও কৈশোর অবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। এ দিকে মাতা ও ভ্রাতা বিশেষ চেষ্টানুসন্ধান করিয়া ঢাকা জিলার অন্তর্গত কলাকোপা নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র সাহার মঞ্জরী সুন্দরী নাম্নী পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত দেবেন্দ্র বাবুর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাঁহাকে বাড়ী আনাইলেন।

এই বিবাহে নৃত্যগীত ও বাদ্য প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ যথেষ্ট হইয়াছিল। ইহা ব্যতিত লোকদিগকে ভোজন করাইবার বিশেষ বন্দোবস্ত, দরিদ্রকে অর্থ বস্ত্র দান প্রভৃতি বিবিধ প্রকার যশস্কর সৎ-কার্য্যানুষ্ঠান হইয়াছিল। ১২৭৯ সালে দেবেন্দ্রবাবুর শুভ পরিণয় কার্য্য মঞ্জুরী চৌধুরাণীর সহিত সম্পন্ন হইল। তথাকার কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে নববধূসহ দেবেন্দ্র বাবু নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। নববধূ দর্শনে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। দেবেন্দ্র বাবু বৎসরের অধিক সময়েই কলিকাতায় বাস করিতেন। দেবেন্দ্র বাবুকে বাড়ী রাখিয়া মাতা আনন্দময়ী বিষয় কার্য্যে প্রবেশ করার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাতে কোন সুফল লাভ করিতে পারেন নাই। সংসারের এই ভীষণ ভার শিরে না লইয়া ইচ্ছানুসারে চলিতে পারিলে যে বিশেষ শান্তি, তাহা দেবেন্দ্র বাবু বেশ বুঝিতেন। দেবেন্দ্র বাবু অনেক সময় বন্ধু বিশেষ লোকের নিকট বলিতেন, "যখন দাদা ষ্টেটের কাজকর্ম্ম দেখিয়া করিতেছেন, ইহার মধ্যে আমি প্রবেশ করিলে হয়ত তাঁহার সহিত মতান্তর উপস্থিত হইয়া অমূল্য ভ্রাতৃভাব নষ্ট হইতে পারে, অতএব আমার ইহার ভিতর প্রবেশ না করাই সঙ্গত।" দেবেন্দ্র বাবু কলিকাতা হাটখোলা গদী বাড়ীতে থাকিয়া নিজের ইচ্ছামত বিলাসিতা ও বাবুগিরীতে [illegible] বাৎসরিক বহু টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। অবস্থা বুঝিয়া দেবেন্দ্র বাবু ও মাতা আনন্দ-

শ্বয়ী বিশেষ চিন্তিত হইয়া ইহার প্রতিবিধান কল্পে অনেকরূপ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই দেবেন্দ্র বাবুর গতিরোধ করিতে পারিলেন না। দেবেন্দ্র বাবু মনের স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

মহিমবাবু এখন বৃদ্ধ পিতার উপর বৈষয়িক কার্য্য সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া নিজেই বিষয় সম্বন্ধীয় কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিশেষ জটিল কার্য্য উপস্থিত হইলে পিতার নিকট গিয়া পরামর্শ অন্তে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কার্য্য করিতেন। সাধারণের চক্ষে বাইশ রশীর বাবুগণ বড়ই সুখী বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু ইহাদের সংসারে যে একটা গুরুতর অশান্তির সূচনা হইয়াছে তাহা বাহির হইতে অনেকেই অবগত নহেন। মহিম বাবু ও রাজেন্দ্র বাবু উভয়েই অপুত্রক ছিলেন এবং দেবেন্দ্র বাবুর অকাল মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার কোন সন্তানই জন্মে নাই। এই যে একটী গুরুতর অশান্তি তাহা অন্যে বুঝিবার শক্তি নাই। মহিম বাবুর মাত্র একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছেন, তাঁহার নাম মুঞ্জরী সুন্দরী চৌধুরাণী, মুঞ্জরী সুন্দরীর বয়স যখন বিবাহের যোগ্য, তখন নানা স্থানে উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধানে লোক পাঠান হইল। অনতিবিলম্বে ঢাকা জিলায় জাফরগঞ্জ (নয়া বাড়ী) নিবাসী মেঘনাথ সাহার সহিত মুঞ্জরী সুন্দরী চৌধুরাণীর শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। মহিম বাবু একটী পুত্র সন্তানের জন্য সমস্তই শূন্য বোধ করিতেছেন। পুত্রের অভাবাবস্থায় ম্রিয়মান দেখিয়া বৃদ্ধ পিতা বৈকুণ্ঠবাবু মহিম বাবুকে দত্তক রক্ষার আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে যথাবিধানে মহিমা চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ১২ বৎসর বয়স্ক একটি দত্তক পুত্র রাখিলেন, ঐ পুত্রের মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী নামকরণ হইল। মহিম বাবু পিতার আদেশানুসারে সংসার রক্ষার জন্য এই কার্য্য করিয়া তাঁহাকে অপত্য স্নেহে লালন পালন করিয়া শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করিলেন।

বাবু বৈকুণ্ঠরাম রায় চৌধুরী মহাশয় এখন বার্দ্ধক্য দশাতে পতিত

হইয়াছেন। ১২৮৬ সালের ভাদ্র মাসে ৭৯ বৎসর বয়সে উপযুক্ত পুত্রের হস্তে বিষয় সম্পত্তি সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়া বাত রোগে বৈকুণ্ঠ বাবু পরলোক গমন করিলেন।

ক্রমে মাস পূর্ণ হইল, যথোপযুক্ত ব্যয়াদি করিয়া মহিমাবাবু পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। অবস্থানুসারে এখন হইতে মহিমা চন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয় বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এখন উভয় হিস্যাতেই প্রাচীন কর্ত্তার অভাব; সুতরাং ইহারা কি ভাবে ষ্টেট পরিচালন করিবেন সকলেই সে জন্য চিন্তিত হইলেন। তখন উভয় হিস্যাতেই উপযুক্ত লোক রাখিয়া তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সুচারু-রূপে ষ্টেটের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বিশেষ বুদ্ধিমান ও কৌশলী লোক ছিলেন, তাহার কৌশল ভেদ করা বড় সহজ নয়। তাই তাঁহার নিকট অনেককেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। তিনি বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা সহকারে যাবতীয় কাজ কর্ম্ম পরিচালন করিতেছেন। পুত্র মহেন্দ্র বাবুকে লিখা পড়া শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে কখনও ত্রুটী করেন নাই। তৎপর নাগরপুরনিবাসী রাধাকান্ত দালাল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শরৎকালী চৌধুরাণীর সহিত মহেন্দ্র বাবুর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ১২৮৭ সনে মাঘ মাসে অতি সমারোহের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া বাইশরশী নিজ ধামে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া পর দিবস দান দাতব্য করিয়া, লোকজনদিগকে বিশেষরূপে আহারাদি করাইয়া বিশেষ শান্তি লাভ করেন। মহেন্দ্র বাবুর বিবাহের পর এ প্রকার আমোদ উৎসবে আর কোন বিবাহ কার্য্যই এ পর্য্যন্ত বাইশরশী ধামে হয় নাই।

মহিম বাবু ও রাজেন্দ্র বাবু উভয়ের মধ্যে ভিন্ন ভাবের বা স্বার্থ-পরতার বীজ অবশ্যই অঙ্কুরিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে নানাকারণে মনো-

মালিন্যের সূত্রপাত হওয়ায়, আলোচ্য বর্ষে এজমালীতে ৺শারদীয়া পূজা বন্ধ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে উভয় হিস্যায় পূজা করা হয়। আপাততঃ এ বৎসর প্রত্যেক হিস্যায় কোনমতে পূজার কার্য্য চালাইলেন ; তৎপর এজমালী মণ্ডপ ও চিলছত্র ভাঙ্গিয়া পৃথক পৃথক হিস্যায় দুইটা পূজার তথনা প্রস্তুত করতঃ যথাস্থানে চণ্ডীমণ্ডপ দালান প্রস্তুত করাইয়া অঙ্গ স্থান বিশেষ নাট মন্দির, আমলাদের থাকার ঘর, পাকের ঘর, অতিথ্যশালার ঘর, বৈঠকখানা দালান প্রস্তুত করাইয়া বাড়ী কৃত চিহ্নিত মতে দ্বি বাটী করিয়া স্থায়ীভাবের প্রাচীর দেওয়া হইল। মহিম বাবু বয়োজ্যেষ্ঠ হেতু তাঁহাকে সকলে বড় বাবু বলিয়া জানেন এবং তাঁহার হিস্যা হুকারে হিস্যা। রাজেন্দ্র বাবু ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে মধ্যম সেই হেতু তাঁহাকে মেজ বাবু ও দেবেন্দ্র বাবু সর্ব্বকনিষ্ঠ বিধায় তাঁহাকে ছোট বাবু বলিত। রাজেন্দ্র বাবু ও দেবেন্দ্র বাবু একান্নভুক্ত ছিলেন বলিয়া রাজেন্দ্র বাবু ও দেবেন্দ্র বাবুর এক হিস্যা বিধায় মধ্যম হিস্যা আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে।

রাজেন্দ্র বাবু প্রত্যেক বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে বাউফল যাইয়া বৎসরের অধিক সময় তথায় থাকিতেন। দেবেন্দ্র বাবু প্রায়ই কলিকাতা বাস করায় নানারূপ অনিয়মে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া ক্রমে কঠিন ব্যাধিতে আক্রমণ করে। কনিষ্ঠের এতাদৃশ ব্যারামের সংবাদ পাইয়া রাজেন্দ্র বাবু অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কলিকাতা পৌছিলেন। তখন দেবেন্দ্র বাবুর অবস্থা অতীব শোচনীয়, রাজেন্দ্র বাবু ভাল ভাল ডাক্তার কবিরাজ আনাইয়া বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহাতে সুফল ফলিল না। দেবেন্দ্র বাবু ১২৮৭ সনে ১৭ই ভাদ্র তারিখে ২৫ বৎসর বয়সে অকালে কাল কবলে পতিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবুর অকাল মৃত্যুতে রাজেন্দ্রবাবু অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে মাসকাল পূর্ণ হইল, যথানিয়মে ভ্রাতৃ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করাইয়া ভ্রাতৃবধু দ্বারা ভাইয়ের শেষ কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন।

১২৮৯ সনের চৈত্র মাসে ৩২ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্র বাবু হঠাৎ চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। মানসিক অশান্তিতে প্রায় বৎসরকাল কাটিয়া গেল, এমন সময় স্নেহময়ী বৃদ্ধ'র [illegible] আনন্দময়ী চৌধুরাণী ১২৯০ সনের ১লা মাঘ তারিখে ইহধাম ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন। রাজেন্দ্রবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা তার স্বর্গার্থে দান সাগর শ্রাদ্ধ করিয়া বহু ব্যয় বিধান করিলেন উরাজেন্দ্র বাবু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি কম থাকায় আজ কাল মেজাজ বড়ই উগ্র এবং সর্ব্বদাই লোকের [illegible] কার্য্যের উপর সন্দিহান হইয়া কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

রাজেন্দ্র বাবু মনের ভাব গোপন রাখিয়া কার্য্য করিতে বড়ই অভ্যস্থ ছিলেন। তাঁহার কল্পনা কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বড় প্রকাশ পাইত না। রাজেন্দ্রবাবু ভ্রাতৃহারা হইয়া মনে যে অশান্তি পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অব্যক্ত; এমতাবস্থায় ভ্রাতৃবধূর কথা মনে করিয়া তিনি সর্ব্বদা ম্রিয়মান অবস্থায় কালযাপন করেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার উপযুক্ত আর কিছুই নাই; যদি একটী দত্তক পুত্র রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে তাঁহাকে লালন পালন করিয়া কতকটা শান্তিতে থাকিতে পারিবেন বিবেচনায় ভ্রাতৃবধূর অনুমতিক্রমে ১২৯৫ সনের ২৬শে মাঘ তারিখে যথাবিধানে একটী দত্তক পুত্র রাখিয়া দেন, ঐ দত্তক পুত্রের নাম দক্ষিণারঞ্জন রায় চৌধুরী রাখা হইল। রাজেন্দ্র বাবুর ঘরে এ পর্য্যন্ত কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই, ভাগ্যক্রমে তিনি ক্রমান্বয়ে পাঁচটী কন্যা সন্তান লাভ করেন। এ জন্য তিনি সর্ব্বদা একটা অমানুষিক চিন্তায় চিন্তিত থাকিতেন। অবস্থানুসারে তাঁহার আর কোন পুত্র সন্তান হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। কাজে কাজেই রাজেন্দ্রবাবুকে

বাধ্য হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের পথ অনুসরণের আবশ্যক হইয়াছে। রাজেন্দ্রবাব ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন, "আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে একজন নিঃসন্তান, দাদার একটীমাত্র কন্যা সন্তান; আমারও কয়েকটীমাত্র কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে, ইহার মধ্যে যখন একটীও পুত্র সন্তান জন্মিল না, তখন আমাকেও অপুত্রক হইতে হইবে, আমাদের বংশে বোধ হয় আর পুত্র সন্তান জন্মিবে না; অতএব শীঘ্রই পরিণামের বিধান করা কর্ত্তব্য।" এই বুদ্ধি স্থিরকরতঃ ১৩০০ সনের ২০ শে চৈত্র তারিখে রাজেন্দ্র বাবু এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন, এই পুত্রের রমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী নামকরণ করা হইয়াছে। দক্ষিণাবাবু ও রমেশবাবুকে বিশেষ যত্ন সহকারে লালন পালন করিয়া বিদ্যাভ্যাসের জন্য উপযুক্ত দুইজন মাষ্টার রাখিয়া লেখা পড়া শিক্ষার বিধান করিয়া দিলেন। তখন বাটীর দক্ষিণ দিকের পুষ্করিণীর উত্তর পূর্ব্ব কোণ প্রাচীর দ্বারা ঘিরিয়া একটী দালান ও কয়েক খানা পাকা ভিত্তি বিশিষ্ট ঘর প্রস্তুত করাইয়া একটী সৎকামনা পূরণার্থ বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

১৩০১ সনে রাজেন্দ্র বাবু সেই সৎকামনার উৎসর্গ করেন। রাজেন্দ্র বাবু ইতিপূর্ব্বেই কাশীতে লোক পাঠাইয়া পাষাণ মূর্ত্তিতে একখানা কৃষ্ণ এবং অষ্টধাতু নির্ম্মিত একখানা রাধা মূর্ত্তি আনিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎসময় বিশেষ যত্ন সহকারে লক্ষ্মী নারায়ণ চক্র বিশিষ্ট একটী শালগ্রাম বিগ্রহও সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ শুভক্ষণে উক্ত স্থানে এই সমস্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য সেবা পূজার বিধান করিলেন। এই যুগল মূর্ত্তি দেখিতে অতি মনোমুগ্ধকর; ৺শ্যাম রায় নামে এই বিগ্রহ অভিহিত হইয়াছেন। নিত্য সেবা পূজার জন্য, ঠাকুর চাকর নিযুক্ত করিয়া সন্ধ্যা আরতির জন্য একজন কীর্ত্তনীয়া ঠিক করিলেন। অদ্যাপিও উক্ত শ্যাম রায়ের সেবা রীতি-

মত চলিতেছে। এই ঠাকুর বাড়ীটী নির্ম্মাণের পর রাজেন্দ্র বাবুর বাড়ীর সৌন্দর্য্য বিশেষ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু এই ৺শ্যামরায় বিগ্রহ স্থাপন করিয়া বিশেষ শান্তিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু নিজ চক্ষে দর্শন না করিয়া মনে যে অশান্তি তাহা জীবিতকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিলেন। ইতিমধ্যে ক্রমে তিনি যে কয়েকটী কন্যা সন্তান লাভ করিয়াছিলেন, যথাকালে তাঁহাদের যোগ্য পাত্রস্থ করিয়াছেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত মামুদপুর গ্রামনিবাসী বাবু ত্রৈলোক্য নাথ সাহার সহিত বড় কন্যা শ্রীমতি সরলা সুন্দরীকে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খোলাবাড়ীয়া গ্রামনিবাসী বাবু কেদার নাথ দেশমুখ্যর সহিত দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতি সরোজিনীকে; ময়মনসিংহ জিলার নাগরপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকালাল সাহা চৌধুরীর সহিত তৃতীয় কন্যা শ্রীমতি শরৎকুমারীকে, ঢাকা জিলার কলাকোপা গ্রাম নিবাসী বাবু অখিলচন্দ্র পোদ্দারের সহিত চতুর্থ কন্যা শ্রীমতি গিরিবালাকে ও মামুদপুর গ্রামনিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র চৌধুরীর সহিত পঞ্চম কন্যা শ্রীমতি চারু বালাকে বিবাহ দিয়াছেন। এই পাচটী কন্যার বিবাহ দিতে রাজেন্দ্রবাবু যথোপযুক্ত ব্যয় বিধানে কিছু-মাত্র ত্রুটি করেন নাই। যে যে ঘরে কন্যা বিবাহ দিয়াছেন তাঁহাদের কাহার অবস্থাই মন্দ নয়; সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় কন্যার স্বামী গৃহে শাশুড়ী প্রভৃতি অন্য পরিজনের অভাব হেতু বিবাহের কিছুদিন পর হইতেই অধিক সময় পিত্রালয়ে থাকিতেন, জামাতা কেদার বাবু শ্বশুর শ্বাশুড়ীর যত্নে অধিক সময় বাইশরশী শ্বশুর বাড়ী বাস করিতেন। কেদার বাবু শিষ্ট-শান্ত বুদ্ধিমান লোক; চেহারাটী অতি সুন্দর, নির্ম্মল ও চরিত্রবান বলিয়া রাজেন্দ্রবাবু ইঁহার প্রকৃতিবশে অপত্যবৎ স্নেহে সর্ব্বদা নিকটে নিকটেই রাখিয়াছেন।

রাজেন্দ্রবাবু ৩২ বৎসর বয়সে চক্ষুরত্ন হারাইয়া তদবস্থায় প্রায় ১৮।১৯ বৎসর কাল দেশে বিদেশে বিষয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ কর্ম্ম অতি সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইয়া ষ্টেটের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষ দৈবশক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বাড়ীতে মধ্যম হিস্যার ১ম দেওয়ান গুরু চরণ রায়ের অভাবে রাধানাথ ঘোষ দেওয়ানজী মহাশয় অনেকদিন যশের সহিত কাজ করিয়াছেন, অতঃপর অনেকেই আসিয়া কাজ করিয়াছেন; কিন্তু কেহই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারেন নাই। দেওয়ান পদে উপযুক্ত লোক থাকা স্বত্বেও রাজেন্দ্র বাবু তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন নাই, নিজেই সবিশেষ অবগত হইয়া অবস্থা নির্ব্বিশেষে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন। রাজেন্দ্রবাবু বুদ্ধিবলে বিষয় সম্বন্ধীয় কার্য্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং অসাধারণ বিষয় বুদ্ধিবলে তাহার হাতে পরিচালনার জন্য ন্যস্ত সম্পত্তির বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাহার অভিজ্ঞতা কার্য্য প্রণালী বিষয়ী লোকদিগের পক্ষে বিশেষ আদর্শ স্বরূপ, দেওয়ান হইতে নিম্নে চাকর চাকরাণী পর্য্যন্ত কাহাকেও তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে বিরত হইতেন না; সকলের কাজের প্রতি তাঁহার তীব্র কটাক্ষ সর্ব্বদাই পরিচালিত হইত। তাঁহার সেই কৌশল-জাল ভেদ করিয়া কেহই নিজ স্বার্থ সিদ্ধি মানসে কুপথে যাইতে সাহসী হইত না। অনেক আই, এ, বি, এ, পাশ সুদক্ষ দেওয়ান থাকিতেন বটে, তাঁহারাও অনেক সময় রাজেন্দ্রবাবুর কার্য্য কৌশল দেখিয়া অবাক হইয়াছেন। রাজেন্দ্রবাবু সেকালের পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের ছাত্র, কিন্তু তিনি স্বীয় যত্ন বলে অধ্যবসায় গুণে বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আলাপ ও চিঠি পত্রের মুসবিদা শুনিলে তিনি যে কি পরিমাণ বিদ্বান তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার অদ্ভুত স্মরণ শক্তি ছিল;

এটা ভগবানেরই বিধান; চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভাব হওয়ার পরই এমত অসাধারণ স্মরণ শক্তি হয়। রাজেন্দ্রবাবু এমন কোন বিষয় যাহা কর্ম্মচারিগণ কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে অক্ষম হইয়াছেন, তাহা মৌখিক বলিয়াছেন, অমুক সনের অত তারিখের কাগজে লেখা আছে আপনারা তাহাই দেখুন। সত্যই সেই বিষয় তৎকালীন কাগজে পাওয়া গিয়াছে। রাজেন্দ্রবাবুর হৃদয়ে যথেষ্ট মায়া মমতা ছিল, যদিও তিনি অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক তথাপি তিনি গরিবদুঃখী বা বিপন্ন লোকদিগকে উপযুক্ত ভাবে দান করিয়াছেন। তাঁহার অল্লাধিক সকল বিষয়েই বেশ অধিকার ছিল। তিনি গান বাদ্য খোশ গল্পপ্রিয় ছিলেন। তিনি অধীনস্থ কর্ম্মচারী দিগের মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করিয়া যথোপযুক্ত পুরস্কার দিতেন, মোট কথা তাঁহার নিকট কার্য্যক্ষম লোকের বিশেষ আদর ছিল। আমলাদিগের প্রতি তিনি উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া লোকের নিকট আদরণীয় ও আদর্শ ছিলেন।

রাজেন্দ্রবাবু যদিও এত কড়া মেজাজের লোক ছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যে সময় বুঝিয়া উপযুক্ত কোন লোকে কোন উচিত কথা তাঁহাকে সাহস করিয়া বলিলে তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহার নিকট ন্যায়বাদী লোকের যথেষ্ট সম্মান ছিল।

অনেক সময় বিষয় সম্বন্ধীয় কার্য্য লইয়া মহিম বাবুর সহিত ভীষণ সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইত। তখন প্রত্যেকেই স্বকার্য্য সাধনাথে পরম শত্রুর স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ের স্নেহ ভক্তির স্থান কখনও বিনষ্ট হয় নাই; সময়ান্তরে প্রয়োজন বশতঃ রাজেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ পরামর্শ আবশ্যক হইলে মহিম বাবু সংবাদ পাঠাইয়াছেন। বড় দাদা আসিতেছেন শুনিয়া রাজেন্দ্রবাবু ব্যস্তভাবে দাদার বসিবার জন্য ভাল একখানা চেয়ার আনাইয়া

পরিষ্কার করাইয়া রাখিয়াছেন এবং লোক দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন, যেন দাদা আসিবামাত্র তাঁহাকে খবর দেয়। তদনুসারে দাদা আসিতেছেন সংবাদ পাওয়ামাত্র রাজেন্দ্রবাবু আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মহিম বাবু আসিয়া চেয়ারে বসিয়া বলিয়াছেন, "রাজেন্দ্র! আমি বসিয়াছি, তুমি ব'স।" তখন চাকরে শাণের উপর একখানা তোয়ালে বিছাইয়া দিয়াছে, রাজেন্দ্রবাবু দাদার নিকট চেয়ারে না বসিয়া সেই নিম্নাসনে উপবেশন করিয়া যথারীতি আলাপ করিয়াছেন। মহিম বাবু একটু "সুচী বায়ু গ্রস্ত" লোক ছিলেন, তিনি কাহারও আসনে বসেন না, কাহার হুকায় তামাক খান না। তাই রাজেন্দ্র বাবু দাদার জন্য স্বতন্ত্র হুকা ও বসিবার আসন রাখিয়াছিলেন, দাদার সহিত আলাপ করিতে তিনি কখনও মুখ তুলিয়া কোন কথা বলিতেন না। অতি নম্রভাবে বিনয়াবনত মস্তকে যথারীতি আলাপ করিয়া যে কথা হয় উত্তর দিয়াছেন। এইভাবে উভয়ে কথোপকথন হইয়াছে, তাহা সন্দর্শনে লোকে বলিয়াছে "এ আবার কি ভাব, তবে বুঝি মনের গোল মিটিয়াছে।"

সাধারণ লোকে তাঁহাদের মনের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিত না, তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে যে আদর্শ পুরুষ ছিলেন তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, স্বধর্ম্মে বিশ্বাস, দেব দ্বিজে ভক্তি, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি বিষয় সম্বন্ধে বৈষয়িক কার্য্যকৌশল ইত্যাদি তাঁহারাই সমস্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তীদিগের জন্য যেমন ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, রীতিনীতিও তেমন সঞ্চিত রহিয়াছে। উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিলে কিছুরই অভাব নাই। ইঁহাদের রীতিনীতি-কার্য্যকৌশল যাহারা শিক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাও বর্ত্তমান সময়ে আদর্শ স্বরূপ। রাজেন্দ্র বাবু কামিনী সুন্দরী চৌধুরাণীর সহিত উপযুক্ত দাম্পত্য প্রণয়ে বিশেষ সুখী ছিলেন। পতিপরায়ণা কামিনী সুন্দরী চৌধুরাণী

যে পতিসেবা স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম, সেই মহাব্রতে সর্ব্বদা আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং রাজেন্দ্র বাবু তাঁহার যত্নে সুখেই জীবন কাটাইয়াছেন। সংসারে স্ত্রী সুশিক্ষিতা হইলে বড়ই সুখের কারণ হয়, অতএব স্ত্রীকে স্বামীর শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়া রাজেন্দ্র বাবু অনেক সময় কাজ কর্ম্মের বিষয়ে সহধর্ম্মীণীর সহিত নানারূপ পরামর্শ করিয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবু বড়ই খাইয়ে লোক ছিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী নানারূপ নিত্য নূতন খাবার জিনিষাদি স্বামীর ফরমাইস মত তৈয়ারী করাইয়া তাঁহাকে খাইতে দিতেন, এইরূপে অনেক কাল কাটিয়া গেল, হঠাৎ রাজেন্দ্রবাবু জ্বর ও উদরাময় রোগে ক্রমে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। নানা দেশের বড় ডাক্তার কবিরাজগণ আনাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইল; কিন্তু তিনি নিজে বড়ই স্বাধীনচেতা লোক বলিয়া আহারাদির বড়ই অনিয়ম হইত, নিজের ইচ্ছামত নানা প্রকার ফরমাইস দিয়া পূর্ব্ববৎ আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন, কাজেও তাহাই করিতেন, কবিরাজ চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে তাঁহাদিগকে বলিতেন, "মহাশয়! আমি যদি ইচ্ছামত আহারাদি করিতে না পারি, তবে আপনাদের এত অর্থ কেন দেই বলুন দেখি? এ বুঝি আমার বৈদ্যদণ্ড, নয় কি?" ইত্যাদি কারণে চিকিৎসায় ব্যারামের কোন উপশমই হইল না। রাজেন্দ্র বাবুর শরীর ক্রমান্বয়ে কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া ব্যাধি ক্রমেই সবল হইয়া দাঁড়াইল। অবস্থানুসারে আরও বিজ্ঞ চিকিৎসক আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত জ্বর ও উদরাময় রোগে ভুগিয়া তাহাতেই শোথ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। রোগের গতি খারাপ দেখিয়া চিকিৎসকগণ সাবধান হইয়া পথ্যাপথ্য দিতে বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন, কিন্তু ঔষধ খাইলেন বটে, রাজেন্দ্র বাবুর পথ্যাদির নিয়ম ঠিক মত চলিল না। তাঁহার চিকিৎসা করিতে গিয়া চিকিৎসকগণের মতবিরুদ্ধে পথ্যাদির ব্যবস্থায় অর্থাৎ

রোগীর ইচ্ছামত পথ্যের ব্যবস্থা বিধান দেখিয়া চিকিৎসকগণ বলাবলি করেন যে, রাজেন্দ্র বাবুর নিয়তি কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ইঁহাকে আরোগ্য করা মনুষ্য শক্তির অতীত। এই বলিয়া অনেকের মন দমিয়া গেল। অবস্থা দৃষ্টে বন্ধু বান্ধব সকলেই বুঝিলেন, এ যাত্রায় তাঁহার পরিত্রাণ নাই। রাজেন্দ্র বাবু বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, আমার ঐহিক রাজত্বের মেয়াদ শেষপ্রায় হইয়াছে; সুতরাং চিকিৎসায় সেই মেয়াদ বৃদ্ধি হইবে না। অতএব তাহার জন্য এখন আমার প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। রাজেন্দ্র বাবু মনে মনে এই বিবর সিদ্ধান্ত করিয়া স্থাবর-অস্থাবর ধন সম্পত্তি সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রস্তুত করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী মঞ্জুরী সুন্দরী চৌধুরাণী পৃথকান্ন হইয়া অস্থাবর সম্পত্তি এবং বাড়ী ঘর দালান কোটা বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং নিজাংশের বিধি বিধানে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইল না। সম্পত্তির ভাবি উত্তরাধিকারী পুত্র বাবু রমেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী নাবালক থাকা প্রযুক্ত সহধর্ম্মিণী কামিনী সুন্দরী চৌধুরাণী জীবিত কাল পর্য্যন্ত ষ্টেট তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে, কন্যা জামাতা প্রভৃতির জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিলেন, তাহা চরম পত্রে সন্নিবেশিত করিয়া উইল সম্পন্ন করতঃ কিছু দিন পর ঐ ব্যারায়ামে রাজেন্দ্র বাবু বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়া ১৩০৭ সনের ২৬শে ফাল্গুন তারিখে সংসারের মহামায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোক গমন করিলেন।

মহিম বাবু ভ্রাতৃবধূকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। ক্রমে চৌধুরাণী ধৈর্য্যাবলম্বনে সমর্থ হইয়া সংসারের কাজে নিবিষ্ট হইলেন। ক্রমে দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, এক মাস যাবৎ রাজেন্দ্র বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। কামিনী সুন্দরী চৌধুরাণী মহিম বাবুর সহিত পরামর্শ ক্রমে এদিকে যথাসাধ্য যোগাড় করিয়া

নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বামী দেবের স্বর্গার্থে রূপার ষোড়শ করিয়া দান সাগর শ্রাদ্ধ করিলেন। এই শ্রাদ্ধে বহু দেশ বিদেশের পণ্ডিত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। ভগববৎ কৃপায় অতি সুশৃঙ্খলরূপে এই শ্রাদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এইরূপ শ্রাদ্ধ ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

কামিনী সুন্দরী চৌধুরাণী জীবনের চির সহচর হারাইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন; এদিকে এই বিপুল সংসারের ভীষণ ভার তাঁহার শিরে ন্যস্ত হওয়ায় তিনি শোক বিহ্বল হইয়াও উদাস-ভাবে থাকিতে পারিলেন না। সংসারের বিবিধ প্রকারের বৈষয়িক কাজকর্ম্মের চিন্তা তাঁহার কোমল হৃদয়কে অধিকার করিল।

এই বিপুল ষ্টেটের সমস্ত কার্য্য আজ দুইটী স্ত্রীলোক দ্বারা পরিচালিত হইবে। এটাও ভগবানের এক বিচিত্র লীলা। কামিনী সুন্দরী ও মুঞ্জুরী সুন্দরী চৌধুরাণী উভয়ে পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত লোক রাখিয়া ষ্টেটের যাবতীয় কাজ চালাইয়া ষ্টেট রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে নাবালক দক্ষিণা বাবু ও রমেশ বাবুকে রীতিমত বিদ্যা ভ্যাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জামাতা কেদার নাথ দেশ-মুখ্য মহাশয় এই সময় অনেক বিষয়ে ষ্টেটের কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে সাহায্য করিতেন। তখন দক্ষিণা বাবুর মাতুল হারাণ চন্দ্র সাহা মহাশয় আসিয়া তাঁহার ষ্টেট রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় কর্ত্রীদিগের পূর্ব্ব পরিচিত রজনী কান্ত মজুমদার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া ন্যায়পক্ষে সমতা রক্ষা করিয়া ষ্টেটের কার্য্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে ষ্টেটের কাজ ভালই চলিতে লাগিল।

যৌবনের প্রারম্ভে কর্ম্মদোষে মুঞ্জুরী সুন্দরী চৌধুরাণী পতি হারাইয়া মানসিক অশান্তিতে ভোগ বিলাসিতা সমস্ত ত্যাগ করিয়া যথানিয়মে জ্যোতিধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

এই কারণে তিনি স্ত্রী জাতির মধ্যে আদর্শস্থানীয়া ; তাঁহার নানারূপ সদ্‌গুণে তিনি রমণী কুলের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার আচারনিষ্ঠা, দান, দাতব্য, স্নেহ মমতার কথা শুনিলে সকলের হৃদয়েই তাঁহার প্রতি ভক্তির সঞ্চার হয়। তিনি পৃথক হইয়াও রাজেন্দ্র বাবুর অমতে কখন কোন কাজ করেন নাই। অনেক কাজে ভাশুরের সম্মান রক্ষার জন্য নিজে ত্যাগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সকলের সঙ্গে মিশামিশি হইয়া শান্তভাবে থাকাই তাঁহার প্রকৃতি ছিল। ভাশুর জায়ের সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাব ছিল. তিনি কামিনী সুন্দরী চৌধুরাণীকে আপন ভগ্নীর মত ভক্তি করিতেন। মঞ্জুরী সুন্দরী চৌধুরাণী পুত্র দক্ষিণা বাবুকে লালন পালন করিয়া বিদ্যা শিক্ষার জন্য উপযুক্তভাবে যত্নের কোন ত্রুটী করেন নাই। দক্ষিণা বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধিধারী না হইলেও স্বীয় জমিদারী পরিচালনা করিবার মত শিক্ষা লাভ করিলেন। মুঞ্জুরী সুন্দরী অনেকদিন হইতে সংসারে কন্যার অভাব বোধ করিয়া আসিতেছিলেন, তাই পুত্র বধূদের আনিয়া সে অভাব পূরণে যত্নবতী হইলেন এবং ডুয়াজানী গ্রামনিবাসী যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী হেমনলিনী চৌধুরাণীর সহিত দক্ষিণা বাবুর বিবাহের সম্বন্ধের কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া ১৩০৮ সনের ১২ ফাল্গুন তারিখে বাইশরশী ধামে অতি সমারোহের সহিত শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। নববধূ গৃহে আনিয়া চৌধুরাণী মনের আনন্দে নববধূসহ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন এবং নানা স্থানে লোক পাঠাইয়া সুপাত্রী অন্বেষণ পূর্ব্বক ঢাকা জিলার সাভার গ্রাম নিবাসী বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সাহা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ষোড়শী বালা চৌধুরাণীর সহিত সম্বন্ধ স্থির পূর্ব্বক ১৩১০ সনের ৮ই ফাল্গুন তারিখে কলিকাতার গদী বাড়ীতে রমেশের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। কামিনী

সুন্দরাও পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন না, এবিষয়ে তাঁহার চেষ্টা যত্নের ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু একে একে সমস্ত কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়া তিনি বধূ দ্বারা সে অভাব পূরণে অভিলাষী হইলেন।

রাজেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর হইতে সকলের সমবেত চেষ্টায় শাসন সংরক্ষণ এবং বার্ষিক ক্রিয়া কার্য্য সমভাবেই চলিতেছে। দেবার্চ্চনাদি বার্ষিক ক্রিয়া এজমালীতে হয়; কিন্তু এক এক বৎসর এক এক হিস্যারও তত্ত্বাবধানে থাকে। এই প্রকারে ভগবৎ কৃপায় কাজ কর্ম্ম সুশৃঙ্খল ভাবেই চলিয়া আসিতেছে।

মহিম বাবু বড়ই সৌখীন লোক ছিলেন, তাঁহার যত কার্য্য, তাঁহার মনোমত না হইলে পুনঃ সেই কর্ম্ম যথাযথভাবে না করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। ১৩০৭ সালে তিনি একটী মনোরম্য সুন্দর চণ্ডীমণ্ডপ দালান প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে কাচদ্বারা নানা প্রকার কারুকার্য্য করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কলিকাতা হইতে নানা রঙ্গিন কাচ এবং উপযুক্ত রাজ মিস্ত্রী আনাইয়া যথা সময় মনোমত দালান প্রস্তুত কার্য্য শেষ করিয়া অতি আনন্দে উৎসাহের সহিত দুর্গোৎসব পূজা করিলেন, তাহাতে মহামায়ার কৃপায় একটা উদ্বেগ শান্তি হইল বটে, কিন্তু মহিম বাবুর আর একটা উদ্বেগ হৃদয়ে একাল যাবৎ পোষণ করিয়া আসিতেছেন, কি ভাবে কোন্ কার্য্য দ্বারা তাঁহার শান্তি হইবে তাহাই সর্ব্বদা চিন্তা করেন। মহিম বাবু বড়ই মাতৃভক্ত ছিলেন, মায়ের বিনা অনুমতিক্রমে কখনও কোন কার্য্য করেন না। বৃদ্ধা বুদ্ধিমতি মা পুত্রের আবদার রক্ষার্থে অনেক সময় এত ব্যগ্র হইতেন যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একদিন মহিম বাবু বড়ই মৌনভাবে আহার করিতেছেন, মাতা কাছে বসিয়া মহিম বাবুর মুখ ম্লান দেখিয়া বলিলেন "মহিম! আজ তোমার চেহারা এত বিমর্ষ কেন? আমি কখনই তোমার এমন ভাব দেখি

নাই, ব্যাপার কি বল ত?” তখন মহিম বাবু বলিলেন “মা! আমি তোমাকে না বলিয়া কোন কার্য্য কখনই করি না। অবশ্য তোমার নিকট সমস্ত বলিব। ‘মা! রাজেন্দ্র নিত্য দেব সেবার বিধান করিয়া ঠাকুর বাড়ী প্রস্তুত করতঃ ৺শ্যাম রায় বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছে, আমি তোমার নামে উৎসর্গ করিয়া সাধারণের উপকারার্থে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি, এখন তোমার অনুমতি অপেক্ষা মাত্র।” মাতা এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কেমন কার্য্য করিবে তাহা খোলশা করিয়া বল? উত্তরে মহিম বাবু বলিলেন, “মা! আমি তোমার নামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিতে ইচ্ছা করি।” ইহা শুনিয়া মাতা বলিলেন, বাবা মহিম! আমাদের দ্বারস্থ জনৈক কবিরাজ আছেন, আবার চিকিৎসালয়ের দরকার কি; তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তদুত্তরে মহিম বাবু বলিলেন, কবিরাজ দ্বারা আমাদের গরীব প্রজা সাধারণের চিকিৎসা হয় না, কতশত লোক এদেশে অচিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অতএব সাধারণে যাহাতে উপকার পায় এমত কার্য্য করিতে হইবে। মাতা জয়কিশোরী চৌধুরাণী ভাল মত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অনুমতি দিলেন, “তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় কর!” মহিম বাবু তখন যে কত আনন্দ অনুভব করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

মহিম বাবু এই অভিপ্রায় জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরকে দরখাস্তে জানাইলেন, সাহেব অতি আদরের সহিত তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া অবিলম্বে সিভিল সার্জ্জনের নিকট পাঠাইয়া ইহার বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন। সিভিল সার্জ্জন যথারীতি বন্দোবস্ত করিয়া মহিম বাবুকে সবিশেষ জানাইলেন, তদনুসারে মহিম বাবুর বাড়ী হইতে অনতিদূরে ডাক্তারখানার জন্য একখানি বড় রকমের ভাল টীনের ঘর এবং ডাক্তারের থাকার জন্য উপযুক্ত বাসাবাড়ী ও তৎসংলগ্ন একখানা

অপারেশন ঘর উঠাইয়া পাকা ভিত্তি করাইয়া তৎসংলগ্ন দক্ষিণে পানীয় জলের অভাব হেতু একটী পুষ্করিণী কাটাইয়া যথারীতি পাকা ঘাট প্রস্তুত করতঃ ১৩১০ সনে মাতা "জয় কিশোরী দাতব্য চিকিৎসালয়" নামে এক দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া উপযুক্ত এম, বি. ডাক্তার রাখিয়া সাধারণের চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়া জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিলেন। মহিম বাবুর ইঙ্গিত মতে সকালে যাহাতে ঐ স্থানে সাধারণ বাজার বসে, তদ্বিধান করিতে আদেশ দিলেন। জ্ঞাত কারণ ডাক্তার বাবু সাধারণ রোগীদের মধ্যে একথা ঘোষণা করিলে পর অবিলম্বে তথায় "ডাক্তারের বাজার" বলিয়া এক দৈনিক বাজারের সৃষ্টি হয়। আজকাল সেই বাজারে কয়েক জন মুদী স্থায়ী দোকান পশার করায় বাজারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। মহিম বাবুর বাড়ীতে বেতন-ভোগী কবিরাজ এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার এম, বি থাকায় উভয় প্রকারেই সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

মহিম বাবু সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার হৃদয় যেরূপ নির্ম্মল ছিল, সকলকেই তিনি সেইরূপ মনে করিতেন, কিন্তু স্বার্থপর জগতে লোকের প্রকৃতি সেরূপ নহে, সরল বিশ্বাসের কার্য্যে পরিণামে অনুতাপ ভোগ করিতে হয়, মহিম বাবু জীবদ্দশায় সরল বিশ্বাসে অনেক কার্য্য করিয়া বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। তজ্জন্য পরে জেদের বশবর্ত্তী হইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মামলা মোকদ্দমা করিয়া প্রবঞ্চক-দিগের সমুচিত দণ্ড দেওয়াইয়াছেন।

মহিম বাবু বড়ই সৌখিন লোক ছিলেন, তাঁহার পাখী পালিবার বড় একটা সখ ছিল ; তিনি বহু দামী পাখী আনিয়া পুষিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার গরু, ঘোড়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। নানাস্থান হইতে ভাল ভাল গাভী, ঘোড়া আনাইয়া তিনি পুষিতেন। মহিম বাবুর গোধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ও ভক্তি ছিল। এমন কি যে মহিম বাবু

একখানা কাপড় এক দিনের বেশী পরেন নাই. পরিয়া ত্যাগ করিলে আবার কিনিবার প্রয়োজন হইত, সেই মহিম বাবু নিজ হাতে সময়ে সময়ে গাভীর খাবার জিনিষ দিয়া কাছে বসিয়া গোরুকে খাওয়াইয়াছেন। আবার নিজের তুয়ালে গামছা দিয়া সময়ে গরুর গায়ে বুলাইয়া গরুর আদর করিয়াছেন।

১২৮৭ সনে বাবু মহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিবাহ হয়, পরে ক্রমে তাঁহার দুইটী কন্যা ও চারিটি পুত্র সন্তান জন্মে। মহিম বাবুর জীবিতকালে প্রথম যে একটী কন্যা সন্তান জন্মে, তাহার নাম প্রিয়বালা, কন্যাটি বাবুর প্রথম সন্তান বিধায় ঠাকুর দাদা মহিম বাবু ও তাঁহার ঠাকুর মাতার নিকট বড়ই আদরিণী ছিল। তাই তাঁর অন্নারম্ভে মহিম বাবু যেরূপ ব্যয় বিধান করিয়াছেন পরে যে ছেলের অন্নপ্রাসন করাইয়াছেন সে অনুপাতে খরচ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। প্রিয়বালার পরে যে ছেলে জন্মে তাহার নাম অবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরী। অবিনাশ বাবু মহেন্দ্র বাবুর প্রথম পুত্র। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ভূপতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, তৃতীয় পুত্রের নাম সুকুমার রায় চৌধুরী। সুকুমার বাবুর পরে একটি কন্যা জন্মে, তাঁহার নাম স্বর্ণবালা; স্বর্ণবালার পরে বর্ত্তমানে যে কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহার নাম গৌর গোপাল রায় চৌধুরী। মহিম বাবু জীবিত থাকাকালে মহেন্দ্র বাবুর পাঁচটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। মহিম বাবু যথোপযুক্ত ব্যয় বিধান করিয়া পৌত্র ও পৌত্রীদিগের অন্নারম্ভ করাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ঢাকা সহরের বাড্ডা নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের সহিত প্রথমা পৌত্রী প্রিয়বালার শুভ বিবাহ দেন; ঐ বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীতে যথেষ্ট ব্যয় বিধান করেন, নিজ ধাম বাইশরশীতে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে জামাতা মেঘনাথ বাবুর ভদ্রাসন বাড়ী নদীতে গ্রাস করিয়াছে, মহিম বাবুর নিকট এই ভীষণ অশুভ সংবাদ যথা সময় আসিয়া পঁহুছিল

মহিম বাবু এই সংবাদে বড়ই চিন্তান্বিত হইয়া জামতাসহ কন্যা মুঞ্জুরী সুন্দরীকে বাড়ীতে আনাইয়া কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। মুঞ্জুরী সুন্দরী মহিম বাবুর এক মাত্র কন্যা, অত্রাবস্থায় স্থানান্তরে রাখাও কাহার মত নাই। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া মহিম বাবু সময়ে বলিয়াছিলেন, "সুবিধামত যে কোন স্থানে তোমাদের একটা বাড়ী থাকা আবশ্যক,নচেৎ পরে কোন অসুবিধা হইবে।" মুঞ্জুরী সুন্দরীর কোন সন্তান না হওয়ায় মহিম বাবু বড়ই মনকষ্টে কাল যাপন করেন। জামাতা মেঘনাদ বাবুও সেই কারণ বেশ বুঝিয়া সুজিয়া শ্বশুরের মতে সম্মতি প্রদান করিলেন এই যে, ভগবান আমাদের ভাগ্য দোষে যখন নিঃসন্তান করিয়াছেন, আমাদের কোন তীর্থ স্থানে থাকাই সঙ্গত মনে করি। তদনুসারে মহিম বাবু ৺নবদ্বীপধামে একখানা বাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। স্থান নির্দ্দেশ হইয়া ৺নবদ্বীপ ধামে পোড়ামা তলা নূতন বাড়ীতে দালান ঘর প্রস্তুত আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে মহিম বাবু অধিকাংশ সময় নানা কারণে কলিকাতা সহরেই থাকেন। সেখানে থাকাকালে অন্যের গাড়ী ঘোড়া নোংরা বলিয়া নিজের গাড়ী ঘোড়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঐরূপ সৌখিন গাড়ী ঘোড়া অদ্যাপিও কলিকাতা সহরে বিরল দৃষ্ট হয়। হঠাৎ মহিম বাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়িল। এদিকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃ দৈহিক শক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। রীতিমত ঔষধাদি সেবনেও বিশেষ কোন ফল হয় না, কিছু দিনের মত ব্যাধি স্থগিত থাকে মাত্র। তখন মহিম বাবুর মাতা জয় কিশোরী চৌধুরাণী জীবিতা আছেন। মায়ের অসুখ সংবাদ শুনিয়া মহিম বাবু কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিলেন। মাতা জয়কিশোরী চৌধুরাণীর চিকিৎসা করার বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন; ফলে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু মহিম বাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন, তখন

তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর; যদি কোন কঠিন ব্যাধিতে আক্রমণ করে তাহা আরোগ্য হওয়া অসম্ভব এই বিষয় চিন্তা করিয়া সংসারে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; হঠাৎ একদিন জয়কিশোরী চৌধুরাণী জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এই সময় মহিম বাবু বাত ব্যাধিতে কাতর অবস্থায় চিকিৎসাদি করাইতেছেন। তিনি প্রাণাধিক পুত্রের সমক্ষে আনন্দে মুখে হরি নাম করিতে করিতে স্বজ্ঞানে ১৩১২ সনের ৩০ শে আষাঢ় তারিখে দেহত্যাগ করিলেন। মাতৃ শ্রাদ্ধের জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করিয়া স্নেহময়ী মাতৃদেবীর স্বর্গ কামনায় মহিম বাবু যথা নিয়মে শ্রাদ্ধ করিয়া মনে শান্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মাতৃশ্মশানে একটা "মঠ" দেওয়ার জন্য বড়ই আশা ছিল, জীবনে সে সাধ মিটাইতে পারেন নাই; ক্রমে বাত রোগে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িতেছেন। মহিম বাবু বড়ই পরিণামদর্শী লোক ছিলেন, তাঁহার অভাবে সংসারে কোনরূপ অশান্তি উৎপন্ন হইয়া বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য একখানি চরম পত্রে বিশদভাবে সমস্ত বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক সন্নিবেশিত করিলেন। মহিম বাবু লোকান্তরে তাঁহার সহধর্ম্মিনী শিব সুন্দরী চৌধুরাণী জীবিত কাল পর্য্যন্ত ষ্টেটের একজিকিউটি্‌কস হইয়া উপযুক্ত ভাবে কাজ করিলে তদভাবে পুত্র মহেন্দ্র বাবু সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া উইলের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিবেন। কন্যা, জামাতা ও অন্যান্য প্রভৃতি সম্বন্ধে উইলে যথাযোগ্য ভাবের সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া উইলখানা সম্পন্ন করতঃ পুত্র মহেন্দ্র বাবুকে নানা বিষয় উপদেশ প্রদান করিলেন।

মহিম বাবুর শেষ সময়ের সমস্ত কাজ হইল; তাঁহার ব্যায়ারামের নানা প্রকার চিকিৎসা স্বত্বেও কিছুই উপশম হইতেছে না দেখিয়া স্ত্রী পুত্র সকলে পরামর্শ করিয়া কলিকাতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ

কবিরাজ দ্বারকা নাথ সেন মহাশয়কে আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিছুদিন উক্ত কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসা করিয়া পুনঃ কলিকাতা রওনা হইলেন। তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে ঔষধ পত্র দ্বারা চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া উঠিল। এইরূপে ভুগিয়া ভুগিয়া ১৩১২ সনে অগ্রহায়ণ মাসে ৬১ বৎসর বয়সে মহিম বাবু অসহ্য ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চিরশান্তি ধামে পরলোক গমন করিলেন। মহিম বাবু দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারার্থে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া সকলের হৃদয়ের উচ্চাসন গ্রহণ করিয়াছেন। আজ সেই নিদানের বন্ধু, বিপন্নের আশ্রয় লোকান্তর হওয়ায় সকলের মনে যেন বিসাদের ছায়া পতিত হইয়াছে।

মহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় এতদিন সংসারের গুরুতর কোন বিষয় চিন্তা করেন নাই; কর্ত্তাই সমস্ত কাজ কর্ম্ম দেখিয়াছেন, তবে সময়ে তাঁহার আদেশ মত যাহা কিছু করিয়াছেন মাত্র। এই সময় সেই কর্ত্তার অভাবে সংসারের সমস্ত চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয়ও অধিকার করিয়াছে। যদ্যপি পিতৃদেবের উইলের মর্ম্মানুসারে মাতা বর্ত্তমানে মহেন্দ্র বাবুর করে ষ্টেটের ইষ্টানিষ্ট কিছুই ন্যস্ত নাই তথাপি বাহিরের সমস্ত কাজ কর্ম্ম মাতৃদেবীর দেখিয়া শুনিয়া করা অসম্ভব বিধায় এবং মহেন্দ্র বাবু উপযুক্ত পুত্র বলিয়া চৌধুরাণী তাঁর পুত্রকেই দেখিয়া শুনিয়া চালাইবার আদেশ দিলেন; কিন্তু মহেন্দ্র বাবু ন্যায় অন্যায় মাতা শিবসুন্দরী চৌধুরাণীর সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহার বিনানুমতিতে কোন কাজ করিতেন না। এইরূপে মহেন্দ্র বাবু ক্রমে কাজ কর্ম্মে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অল্প সময় মধ্যে আয়োজন করিয়া উপযুক্ত ভাবে পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ হইতে পারিবে না, সম্প্রতি যাহা কিছু করা শাস্ত্র সঙ্গত তাঁহা করিয়া ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধের যোগাড় করিতে থাকিলেন।

ক্রমে দিনের পর দিন করিয়া কয়েকটী মাস কাটিয়া আসিল, যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া ষাণ্মাসিকে বাবু মহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় পিতৃদেবের দান সাগর শ্রাদ্ধ করিলেন, এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বশ্রেণী ব্রাহ্মণ ৬০০০ হাজার ও ভট্ট ২০০০ উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে ৮৲ টাকা করিয়া বিদায় করিয়াছিলেন। এইরূপ দান সাগর শ্রাদ্ধ এতদ্দেশে পূর্ব্বে কখন হয় নাই। অতি সুবন্দোবস্তে এই শ্রাদ্ধের ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই কার্য্যে শিবসুন্দরী চৌধুরাণী ও মহেন্দ্র বাবু অতি উচ্চাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন। এদিকে ষ্টেটের কার্য্য পরিচালনের জন্য তৎকালে বিশেষ উপযুক্ত লোকই ছিলেন, তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া মাতা শিবসুন্দরী চৌধুরাণীর অনুমতিক্রমে মহেন্দ্র বাবু দক্ষতার সহিত বিশেষ যত্ন সহকারে উপযুক্তভাবে ষ্টেটের কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছু দিন কাটিয়া গেল ; শিবসুন্দরী চৌধুরাণী এখন বৃদ্ধ অবস্থায় শেষ জীবনের শান্তি লাভের আশায় পৌত্র ও পৌত্রাদিগের বিবাহ দিবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাহার আগ্রহে মহেন্দ্র বাবু উদ্যোগী হইয়া ঢাকা নিবাসী বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার দাসের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী চৌধুরাণীর সহিত প্রথম পুত্র অবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরীর ও কলাকোপা গ্রাম নিবাসী বাবু রজনীকান্ত সাহার কন্যা শ্রীমতী জগতলক্ষ্মীর সহিত দ্বিতীয় পুত্র ভূপতিশচন্দ্র রায় চৌধুরীর এবং উক্ত কলাকোপা গ্রাম নিবাসী বাবু নবকুমার সাহার পুত্র শ্রীমান ফণীভূষণ সাহার সহিত কন্যা শ্রীমতি স্বর্ণরাণীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতার গদী বাড়িতে শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। শিবসুন্দরী চৌধুরাণী এখন বৃদ্ধাবস্থায় শেষ জীবনে নাতবউ লইয়া সংসার করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়া একটু অল্প বয়সেই পৌত্রদ্বয়কে বিবাহ করাইলেন। শেষ জীবনের একটা

আশা যাহা মহিম বাবু পূরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাই আজ পতিপরায়ণা স্ত্রী শিবসুন্দরী চৌধুরাণী করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া পুত্র মহেন্দ্র বাবুর সহিত পরামর্শ করিলেন। মহেন্দ্র বাবু মাতার বাচনিক তাঁহার স্বর্গীয় পিতার শেষ জীবনের আশা "মাতৃ-শ্মশানে মঠ দেওয়া" এই কথা শুনিবামাত্র একবাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, এমন সৎকার্য্য যাহাতে সত্বর হয় তাহাই কর্ত্তব্য। তদনুসারে ৺জয় কিশোরী চৌধুরাণীর শ্মশানে অত্যুচ্চ একটী মঠ প্রস্তুত করাইয়াছেন; অত বড় মঠ ফরিদপুর জিলায় আর আছে কিনা শুনা যায় না। মঠটী দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনই উচ্চ, ১৩১৯ সনে এই মঠ প্রস্তুত হইয়াছে, মঠ নির্ম্মানের ব্যয় ৮ হাজার টাকা পড়িয়াছে।

মহেন্দ্র বাবু কন্যা দুইটীকে উপযুক্ত সময়ে যোগ্য ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে কন্যা দুইটী অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় ইঁহাদিগকে জীবনে বড়ই কষ্ট ও দারুণ শোক পাইতে হইয়াছে। বড় কন্যা প্রিয়বালার একটী পুত্র ও একটী কন্যা আছে এবং ছোট কন্যা স্বর্ণবালার একটী পুত্র আছে। জামাতাদ্বয় পরে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসার করিতেছেন।

মাতা শিবসুন্দরী চৌধুরাণী বর্ত্তমানে সর্ব্ববিধ কাজকর্ম্ম মহেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া শুনিয়া করিতে হয়। স্বর্গীয় পিতা দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে এক দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া দেশের এক মহৎ উপকার করিয়াছেন। মহেন্দ্রবাবু দেশের শিক্ষা বিষয়ে উন্নতিকল্পে এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। মহেন্দ্রবাবুর এই মত শুনিয়া সকলেই বিশেষ উৎসাহী হইলেন এবং মাতা শিবসুন্দরী চৌধুরাণীর নিকট এই প্রস্তাব প্রকাশ করিলে তিনি ইহা অনুমোদন করিলেন। তদপর ক্রমে চেষ্টা করিয়া ১৩২০ সনের পৌষমাসে

নিজের বাড়ীর অনতিদূরে পাকা পোক্ত সুন্দর ঘর উঠাইয়া "শিব-সুন্দরী একাডেমী" নামে এক বিদ্যালয় খুলিলেন। তদনন্তর দূরবর্ত্তী স্থানের ছেলেদের থাকিবার উপযুক্ত কয়েকখানা ঘর উক্ত প্রকারে পাকা পোক্তা করিয়া "জয়কিশোরী দাতব্য চিকিৎসালয়ের" উত্তরদিকে তৎসংলগ্ন স্থানে একটা বোর্ডিং করিয়া দিলেন। হেড মাষ্টার বাবুর থাকার উপযুক্ত এক বাসা বাড়ী প্রস্তুত অভিপ্রায়ে, ডাক্তার বাবুর বাসার নিকটে ডাক্তারখানার পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পাহাড়ীতে স্থান নির্দ্দেশ করতঃ হেড মাষ্টারের সপরিবারে থাকার উপযুক্ত এক বাসাবাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এই স্কুলটী হওয়ায় দেশীয় সর্ব্বসাধারণের এক মহোপকার হইয়াছে। অনেক গরীব দুঃখীর ছেলেও বাড়ীর ভাত খাইয়া ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতেছে ও করিবে। এই স্কুল বোর্ডিং প্রভৃতি নির্ম্মাণ কল্পে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই স্কুলের ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে ৮৲ টাকার একটা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। এই স্কুলের ছাত্রমধ্যে যে ছাত্র এই স্কুলের শেষ পরীক্ষায় প্রথম হইবে সেই ছেলে এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে। এই স্কুলটী স্থাপন করিয়া বাবু মহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় পরোপকারিতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন।

শিবসুন্দরী ১৩২২ সনে বৈশাখ মাসে কলিকাতা মহানগরীতে ৺গঙ্গা প্রাপ্ত হইলেন। মহেন্দ্র বাবু মাতার সঙ্গে কলিকাতাতেই ছিলেন. তিনি যথাবিহিত মাতৃদেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কলিকাতায় গঙ্গাতীরে মাতৃ দেবীর ঔর্দ্ধ দৈহিক কার্য্য যথাকালে সমাপন করিলেন।

বাবু মহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় নির্ম্মল চরিত্রের লোক। তিনি বিবাদ বিসংবাদ মোটেই পছন্দ করেন না, সর্ব্বদা শান্তিভাবে থাকিতে ভালবাসেন। পৈতৃক বার্ষিক ক্রিয়া কর্ম্ম অতি যত্ন সহকারে পূর্ব্ববৎ নিয়মে চালাইয়া আসিতেছেন। দেব দ্বিজে ভক্তি, ক্রিয়া কর্ম্মে

বিশ্বাস, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, সৎপাত্রে দান প্রভৃতি মহাশক্তি মহেন্দ্রবাবুর হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান, সেই জন্য তিনি জনসমাজে বিশেষ আদরণীয়।'

মহেন্দ্রবাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার রায় চৌধুরীকে উপযুক্ত বয়সে ১৩২৪ সনের বৈশাখ মাসে বিবাহ দিয়াছেন। মহেরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়ের কন্যা স্নেহলতা চৌধুরাণীর সহিত সুকুমার বাবুর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

এই বিবাহ কলিকাতা নগরীতে বিশেষ সমারোহের সহিত হইয়াছে। মহেন্দ্রবাবুর গৃহে আজ চারটী পুত্র মধ্যে তিনটী পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত শিক্ষিত যুবা পুরুষ। কনিষ্ঠ পুত্র পাঠ্যাবস্থায় আছে। প্রথম পুত্র অবিনাশ বাবুর একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার নাম রাম রঙ্গিনী। দ্বিতীয় পুত্রের এক কন্যা ও দুইটী পুত্র জন্মিয়াছে, তন্মধ্যে একটীর নাম ননীগোপাল রায় চৌধুরী, অপরটীর নামকরণ হয় নাই। মহেন্দ্র বাবু পৌত্র পৌত্রীদিগের অন্নারম্ভ ও নামকরণ বিশেষ আমোদ আহ্লাদ ও সমারোহের সহিত করিয়াছেন। পুত্র চারিটীর মধ্যে যে তিনটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আজকাল ষ্টেটের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষালাভ করিতেছেন।

অবিনাশ বাবু সংসারের আয় ব্যয় সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক আলোচনা করেন। মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে ৺দোলযাত্রা উপলক্ষে যে দোল ভিটা বান্ধা হয়, তদুপলক্ষে প্রত্যেক বৎসর ৬০৲ টাকা পরিমাণ চাকরাণ খরচ হয়, তাহা দেখিয়া অবিনাশ বাবু উদ্যোগ করিয়া ইষ্টক দ্বারা একটী পাকা দোলমঞ্চ প্রস্তুত করাইয়াছেন, তাহাতে আরাধ্য দেবের দোলযাত্রার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। দোলটী দেখিতে অতি সুন্দর, এখন আর প্রতিবৎসর ঐরূপ বাজে খরচ করিতে হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে মহেন্দ্র বাবুর ষ্টেট অতি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত

হইতেছে। ইতিমধ্যে মহেন্দ্র বাবু তাঁহার ম্যানেজারবাবু দিগেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে নগরকান্দা ডিহির অন্তর্গত কাছারীর অনতিদূরে বাজারের পূর্ব্বদিকে সন্ন্যাসীর ভিটায় এক পাষাণ মূর্ত্তির ৺কালী স্থাপন করিয়া নিত্য সেবার জন্য যথারীতি বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই সন্ন্যাসীর ভিটায় বহুদিন পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী "পঞ্চমুণ্ডী" বেদী স্থাপন করিয়া উলঙ্গ অবস্থায় বাস করিতেন; তাঁহার বড়ই প্রতিভা ছিল, অদ্যাপি তথাকার প্রাচীন লোকের বাচনিক অবগত হওয়া যায়। সেই অবধি ঐ স্থানটিকে সন্ন্যাসীর ভিটা বলে। সন্ন্যাসীর সেই পঞ্চমুণ্ডী বেদীর উপরেই মহেন্দ্রবাবু এইরূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া ৺কালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে বাইশরশী গ্রামে পোষ্ট অফিস হইয়াছে। এই পোষ্ট অফিসের স্থান স্কুল বোর্ডিংএর সন্নিকটে অবস্থিত। বর্ত্তমানে জয়কিশোরী দাতব্য চিকিৎসালয়, বোর্ডিং, পোষ্ট অফিস, পুলিশ ক্যাম্প, হেড মাষ্টারের বাসা, ডাক্তারের বাসা, ডাক্তারের বাজার প্রভৃতি একস্থানে সন্নিবেশিত হওয়ায় স্থানটী বড়ই মনোরম্য হইয়াছে।

১৩২২ সনে শিবসুন্দরী চৌধুরাণীর মৃত্যুর পর জামাতা মেঘনাদ বাবু ৺নবদ্বীপ ধামে বাস করিতেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণী মুঞ্জরীসুন্দরী চৌধুরাণীও সেইখানে ছিলেন; এমন সময় হঠাৎ মেঘনাদ বাবুর গলদেশে ক্ষত হইয়া চিকিৎসার জন্য স্ত্রী সমভিব্যাহারে কলিকাতা আগমন করিয়া বহু চিকিৎসায় কোন ফল না হইয়া ১৩৩১ সনে ৭০ বৎসর বয়সে ৺গঙ্গাপ্রাপ্ত হইলেন। পতিপ্রাণা মুঞ্জরী চৌধুরাণী কলিকাতাতে যথারীতি স্বর্গীয় স্বামী মেঘনাদ বাবুর শ্রাদ্ধ করিয়া ৺নবদ্বীপ ধামে বাস করিতেছেন; তিনিও আজকাল স্থবির দেহে কাল যাপন করিতেছেন। মহেন্দ্র বাবু তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের উইলের মর্ম্মানুযায়ী মাসহারার টাকা পাঠাইয়া নিজের লোকজন দ্বারা তত্ত্বাবধান

করাইয়া বড় ভগ্নিকে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে ৺নবদ্বীপ ধামের বাটীতে রাখিয়াছেন। মহেন্দ্র বাবুর তৃতীয় পুত্র বাবু সুকুমার রায় চৌধুরী বৎসরের মধ্যে অনেক সময় পিসিমাতাঠাকুরাণীর তত্ত্বাবধানের জন্য ৺ নবদ্বীপ ধামে থাকেন।

মধ্যম হিস্যায় বাবু রাজেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্র বাবুর হিস্যায় কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণী এবং দেবেন্দ্র বাবুর হিস্যায় মুঞ্জুরীসুন্দরী চৌধুরাণী এই দুইজনের কর্ত্তৃত্বে ষ্টেট পরিচালিত হইতেছে। ইঁহাদের সময়ে এজমালী কাজকর্ম্ম পরিচালনের জন্য বিশেষ সুদক্ষ দেওয়ান কর্ম্মচারীর পরামর্শে ষ্টেটের কাজকর্ম্ম সুচারুরূপ নির্ব্বাহ হইতেছে, দক্ষিণাবাবু ও রমেশবাবু উভয়েই ষ্টেটের কাজকর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

ইতিমধ্যে ১৩১৯ সনে দক্ষিণাবাবুর একটী কন্যা সন্তান জন্মে, ঐ কন্যার অন্নারম্ভে মুঞ্জুরীসুন্দরী চৌধুরাণী যথেষ্ট আমোদ প্রমোদ, দান দাতব্য করিয়াছেন, কন্যাটীর নাম কালিদাসী রাখা হইয়াছে। মুঞ্জুরী সুন্দরী চৌধুরাণী পৌত্রী কালিদাসীকে বিশেষ যত্নে লালন পালন করিতেছেন. এইরূপে আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপর ১৩২১ সনে দক্ষিণাবাবুর একটী পুত্র সন্তান জন্মে, তাঁহার অন্নারম্ভে ও নামকরণে বহু ব্যয় ভূষণ করিয়া অতি সমারোহের সহিত মুঞ্জুরীসুন্দরী চৌধুরাণী কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পুত্র কন্যা দেখিয়া পিতামাতা ও পিতামহী অতি উৎসাহের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। পুত্রটীর নাম কালিদাস রায় চৌধুরী রাখা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কালিদাস রোগাক্রান্ত হইয়া ৪ বৎসর বয়সে অকালে পরলোক গমন করে।

ইতিমধ্যে রমেশবাবু এক কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে, কন্যার অন্নারম্ভে রমেশবাবুর মাতা কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণী বিশেষ সমারোহ করিয়াছেন। কন্যাটী লইয়া পিতামহী সর্ব্বদা নানাপ্রকার কৌতুক করিতেন।
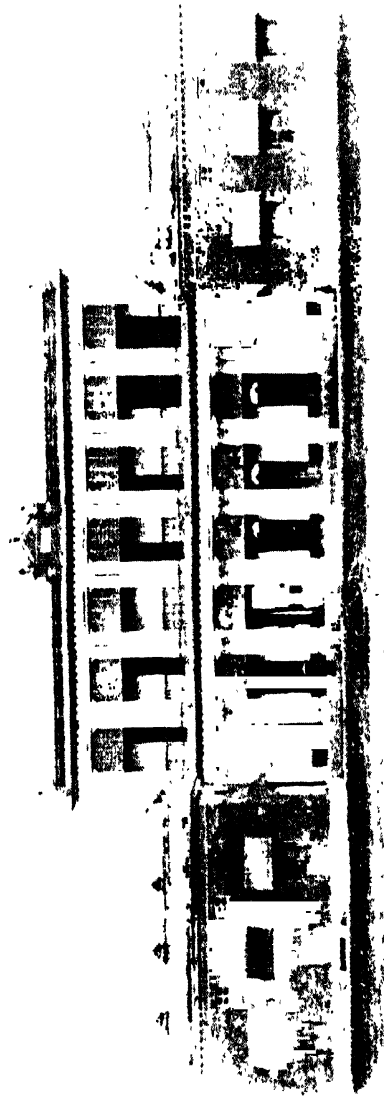
স্বর্গীয়া কামিনী সুন্দরী চৌধুরাণী

অনেক সময় এরূপ কৌতুকে ও শান্তিতে কাটাইতেছেন। একদা হঠাৎ বিসূচিকা বাসরামে ৮ বৎসর বয়সে কন্যাটীর অকাল মৃত্যু হওয়ায় সকলেই শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে অনেকদিন কাটিয়া গেল, রমেশবাবুর আর কোন সন্তান জন্মিল না দেখিয়া হঠাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ১৩২২ সনের মাঘ মাসে কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

রমেশবাবু যথাবিহিত মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন অন্তে শ্রাদ্ধের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া যথাসাধ্য যোগাড় করতঃ ত্রিরাত্রে মাতার তোরণ বৃষোৎস্বর্গ শ্রাদ্ধ করিলেন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্থানীয় সর্ব্বসাধারণ লোককে পরিতোষরূপে পাকা ফলাহার ভোজন করাইয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণদিগকে ৫৲ টাকা করিয়া প্রত্যেককে বিদায় করিয়াছিলেন। আগন্তুক ব্রাহ্মণ সংখ্যা পাঁচ শত পরিমাণ হইয়াছিল।

রমেশবাবু ভগ্নিপতি কেদারবাবু ও অন্যান্য হিতৈষী ব্যক্তিগণের পরামর্শে ভালমন্দ বিচার করিয়া ষ্টেটের কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন।

রমেশবাবু, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গীয় পিতামাতার পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। পিতৃদেবের স্থাপিত ৺শ্যামরায় বিগ্রহের নিত্যসেবা ও বার্ষিক ক্রিয়া কর্ম্ম পূর্ব্ব নিয়মানুসারে বিশেষ যত্নসহকারে চলিতে লাগিল। সংসারে অন্য কোনরূপ অশান্তি নাই, সুশৃঙ্খলভাবে ষ্টেটের কার্য্য চলিতেছে। বাহিরে অন্য কোন অশান্তি নাই বটে, কিন্তু ভিতরে একটী গুরুতর অশান্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, রমেশবাবুর কন্যাটী মারা যাওয়ার পর অনেকদিন কাটিয়া গেল, আর কোন সন্তান হইতেছে না। এজন্য নানারূপ দৈব ক্রিয়া করিয়া কোন ফল পান নাই। পরে ৺কাশীধামের জনৈক শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারা ১৩২৫ সনে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ৺রাম পূজা করিয়াছিলেন,ঐ কার্য্য করিতে প্রায ১০০০০দশ হাজার

টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ঐ কার্য্যের পর ভগবান কৃপায় রমেশ বাবুর স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা হইয়া ১৩২৭ সনে অগ্রহায়ণ মাসে একটী পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে। এই ছেলের অন্নারম্ভে ও নামকরণে বিশেষ আমোদ উৎসব করিয়াছেন, এই ছেলের নাম রামচন্দ্র রায় চৌধুরী।

মাতা পরলোক গমন করার পর দেশের উন্নতিকল্পে রমেশবাবু অতি মহৎ কয়েকটী কার্য্য করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলায় কোন কলেজ না থাকাতে উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের বড়ই অসুবিধা ছিল। এই অভাব দূর করার মানসে দেশ হিতৈষী স্বনামধন্য পুরুষ মহাত্মা অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় উদ্যোগী হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। রমেশবাবু এই কলেজের জন্য এককালীন ৫০০০০পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন এবং তাঁহার স্বর্গীয় পিতা রাজেন্দ্র বাবুর নামে এই কলেজ হইবে বলিয়া অম্বিকাবাবুর নিকট প্রস্তাব করেন। বর্ত্তমানে ফরিদপুরের কলেজ "রাজেন্দ্রকলেজ" বলিয়া পরিচিত। ইহা ব্যতিত বরিশাল জিলার সংস্কৃত চতুষ্পাঠি বিদ্যালয়ের জন্য এককালীন ৪০০০০ চল্লিশ হাজার টাকা ও পটুয়াখালী জলের কলের জন্য ৭০০০ সাত হাজার টাকা এককালীন দান করিয়াছেন। ঐ চতুষ্পাঠীর নাম তাঁহার স্বর্গীয়া জননী কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণীর নামানুসারে "কামিনীসুন্দরী চতুষ্পাঠী" রাখা হইয়াছে। ঐ চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন জন্য তিনি মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া দিয়া থাকেন। নুরুল্যাগঞ্জ নামক গ্রামে জলাভাব হেতু একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী কাটাইয়া জল কষ্ট নিবারণ করিয়াছেন, এই জলাশয় স্বর্গীয় মাতা কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণীর নামে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং পিতা মাতার শ্মশানে সুদৃশ্য দুইটী স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন। মঠ দুইটী দেখিতে বড়ই সুন্দর। বর্ত্তমানে বৈষয়িক কার্য্যে রমেশবাবুর বেশ জ্ঞান জন্মিয়াছে, ষ্টেটের কার্য্য বিশেষভাবে যত্নসহকারে দক্ষতার সহিত চালাইতেছেন। স্বীয় পৈতৃক

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী

শ্রীমান রমাপদ রায়চৌধুরী ও
শ্রীমান রামানুজ রায়চৌধুরী
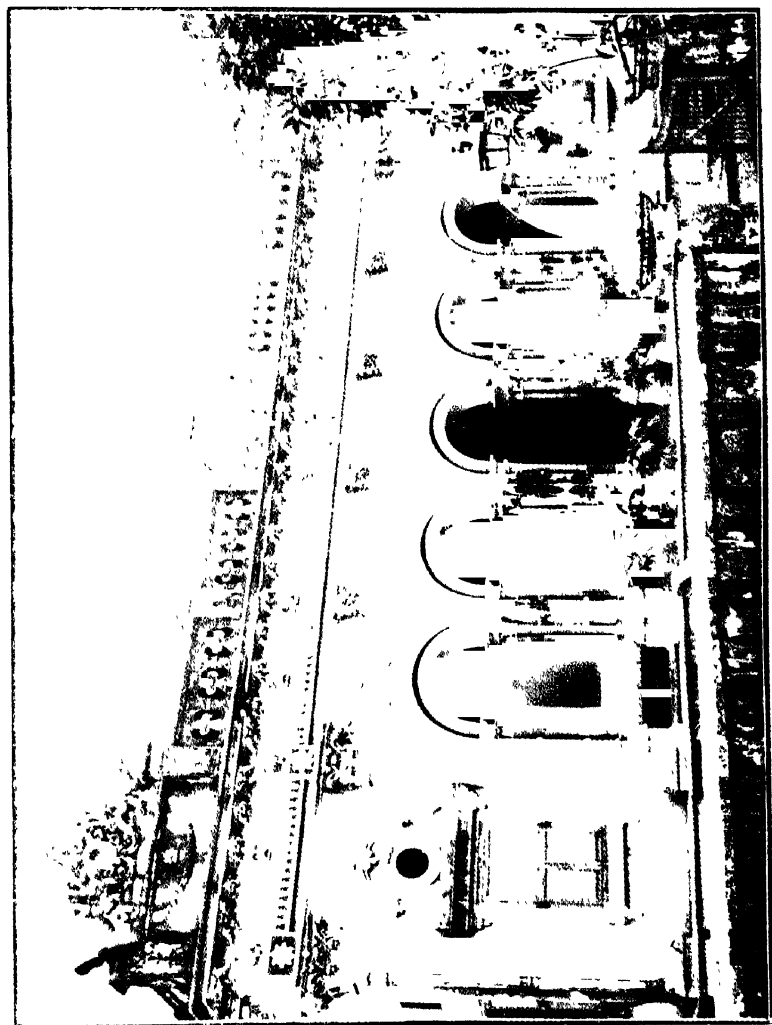
সম্পত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন করিয়া পিতা প্রপিতামহের নাম আরও গৌরবান্বিত করা তাঁহার একান্ত বাসনা। পাবনা জেলার অন্তর্গত এক নূতন সম্পত্তি খরিদ করিয়া তিনি বিষয় কর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রমেশবাবু ও দক্ষিণাবাবু উভয় ভ্রাতাই সঙ্গীত ও কলা বিদ্যার বিশেষ অনুরাগী; পূর্ব্ববঙ্গের বহু প্রথিতযশাঃ কলাবিদ ইহাদের গুণের পক্ষপাতী। নিজ হিস্যায়, হাইকোর্টের নিলামে খলিলপুর ডিহি নিজ নামে নিলাম খরিদ করিয়াছেন, এইটী বিশেষ লাভের সম্পত্তি; এইরূপে ক্রমে এলাকা বিস্তার করিতে রমেশবাবু বিশেষ যত্ন করিতেছেন। ইনি বহু লক্ষ টাকার মালিক হইলেও বিনয়ী ও মিষ্টভাষী। সাহিত্যের ইনি একজন পৃষ্ঠপোষক। ইতিমধ্যে ১৩৩২ সনের বৈশাখ মাসে রমেশবাবুর আর একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে।

সন ১৩২১ সনে দক্ষিণাবাবুর পুত্র কালিদাসের মৃত্যুর পর আর কোন সন্তান জন্মে নাই, ক্রমে মুঞ্জরী সুন্দরীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়িল, চিকিৎসার জন্য তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ সহ কলিকাতা গমন করিলেন। সেখানে ভাল ভাল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল হইল না; ক্রমে জ্বর ও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৩২৪ সনে ১৮ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা মহানগরীতে তাঁহার ৺গঙ্গা প্রাপ্তি হইল। দক্ষিণা বাবু যত্ন সহকারে মাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া অল্প সময় মধ্যে যথাসাধ্য আয়োজন পূর্ব্বক কলিকাতা গদী বাড়ীতে ত্রিরাত্রে বৃষোৎস্বর্গ করিয়া যথাবিহিত মাতৃ শ্রাদ্ধ করিলেন। তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ স্বজাতি এবং দুঃখী কাঙ্গালীদের পরিতোষরূপে লুচী মোণ্ডা ইত্যাদি ভোজন করাইয়া যথাশক্তি দান দাতব্য করিলেন।

পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মাতুল হারাণচন্দ্র সাহা ও উপযুক্ত সুদক্ষ কর্ম্মচারীর চেষ্টা যত্নে ষ্টেটের কার্য্য উপযুক্ত ভাবেই চলিতে লাগিল। এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল. এদিকে কন্যা কালিদাসী বয়স্থা

হইয়া উঠিল। তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য ইনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিশেষ অনুসন্ধানে ঢাকা জিলা নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল দাসের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন; পরে ১৩২৭ সনের বৈশাখ মাসে শ্রীমতি কালিদাসীকে উপযুক্ত পাত্রে পাত্রস্থ করিয়া বিশেষ আমোদ প্রমোদ করিলেন। এই শুভ পরিণয় ঢাকা সহরে সম্পন্ন হইয়াছে। দক্ষিণাবাবু ঢাকা জিলায় এবং নিজ বাড়ীতে উপযুক্ত ব্যয় বিধান করিতে ক্রটী করেন নাই।

কর্ত্রীদ্বয়ের পরলোক গমনের পর সকলের সমবেত চেষ্টায় ষ্টেটের কাজকর্ম্ম ভালভাবেই চলিতেছে।

কামিনীসুন্দরী ও মঞ্জুরীসুন্দরী চৌধুরাণী কাজকর্ম্ম দ্বারা নিজ নিজ প্রকৃতির পরিচয় দিয়া সর্ব্বসাধারণের চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহাদের দয়া, মায়া, দান, দাতব্য, শাসনাদি সম্বন্ধে সুযশঃ অদ্যাপিও লোকে কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

এইরূপে উভয় হিস্যাতে বিশেষ দক্ষতার সহিত সুচারুরূপ ষ্টেটের কাজকর্ম্ম চলিতেছে, সকলেই সদা আনন্দে কালযাপন করিতেছেন। এই সময় দক্ষিণাবাবুর গৃহে মাত্র দুইটী কন্যা; তাঁহাদের মধ্যে বড়টার নাম কালিদাসী ও ছোটটার নাম পারুল। কালিদাসীর বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, পারুল ছোট নাবালিকা। এই সুখের সময় একটী দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে। মাসাধিক কাল হইতে বিষয় কার্য্যোপলক্ষে দক্ষিণাবাবু বাউফল গিয়াছেন, রমেশবাবু কলিকাতা গিয়াছেন, এমন সময় একদা দক্ষিণাবাবুর স্ত্রীর জ্বর হইয়া বিশেষ কাতর হইয়া পড়েন, তদ্দর্শনে সকলে ব্যস্ত হইয়া বিশেষরূপে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাবাবুকে বাড়ী আনিবার জন্য টেলিগ্রাফ করা হইল ও রমেশবাবুকে উপযুক্ত ভাল ডাক্তার সহ বাড়ী আনিবার জন্য টেলিগ্রাফ করা হইল। যথাকালে দক্ষিণাবাবু ও রমেশবাবু

বাড়ী আসিয়া পঁহুছিলেন। দক্ষিণাবাবু বাড়ী আসিয়া ভাগ্যক্রমে সহধর্ম্মিণীকে জীবিত দেখিতে পান নাই। তখন শবদেহ বাহিরে চৌকির উপর শায়িত ছিল, দক্ষিণাবাবু তদ্দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৩৩০সনে ৫ই শ্রাবণ তারিখে বেলা ১টার সময় স্বামী ও কন্যা দুইটীকে শোক-সাগরে ডুবাইয়া দক্ষিণাবাবুর গৃহলক্ষ্মী অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। দক্ষিণাবাবুর এই সহধর্ম্মিণী যেমন দেখিতে সুন্দরী, প্রকৃতি তদপেক্ষা সুন্দরতর; এরূপ গৃহলক্ষ্মী কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে! দক্ষিণাবাবু কিছুদিন পর আবার দারপরিগ্রহ করিয়া কোনমতে পূর্ব্ব শোক সম্বরণ করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন।

বৈকুণ্ঠরাম রায়
নীলকণ্ঠ রায়
রাধিকানাথ রায়
ঈশানচন্দ্র রায়
মহিমচন্দ্র রায়
মহেশচন্দ্র সাহা
শ্রীশচন্দ্র রায়
দত্তক মহেন্দ্রনারায়ণ রায়
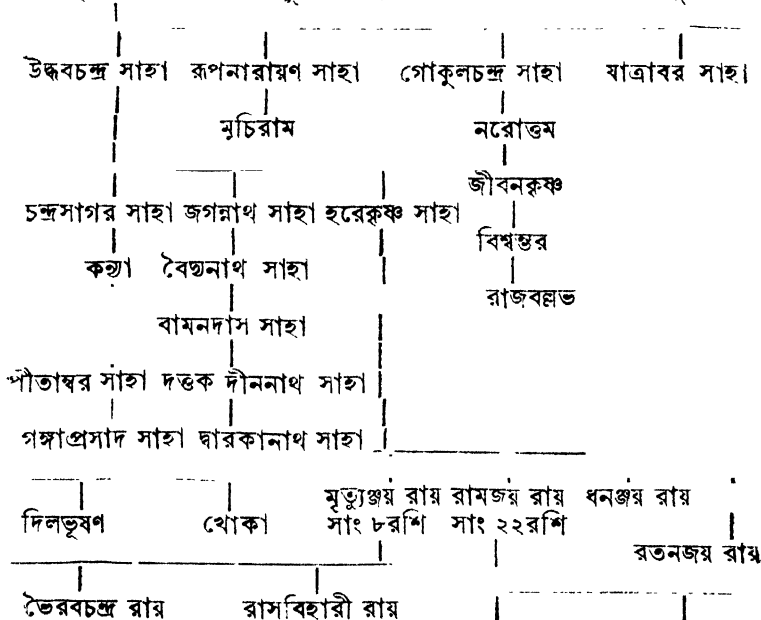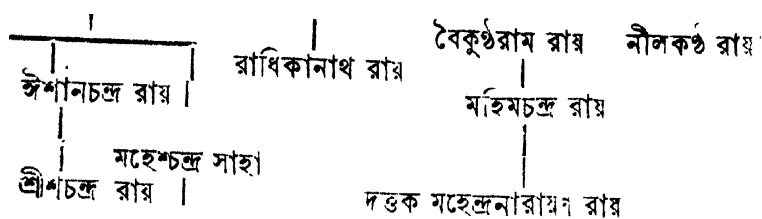
হরেন্দ্রচন্দ্র রায়
যোগেশচন্দ্র রায়
অবিনাশচন্দ্র রায়
ভূপতীশচন্দ্র রায়
সুকুমার রায়
গৌরগোপাল রায়
কন্যা
ননীগোপাল রায়
খোকা
রাজেন্দ্রচন্দ্র রায়
দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়
দত্তক রমেশচন্দ্র রায়
দত্তক দক্ষিণারঞ্জন রায়
রামচন্দ্র রায়
খোকা
দুই কন্যা
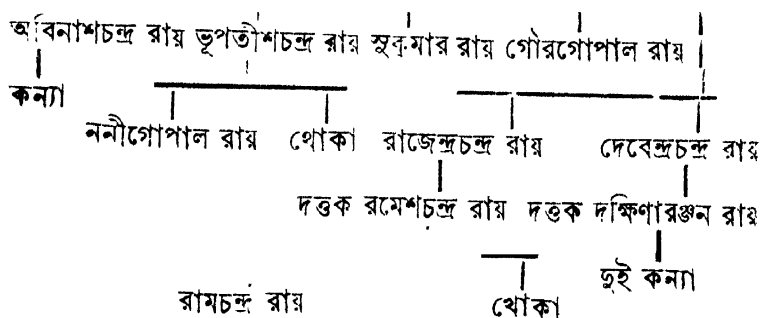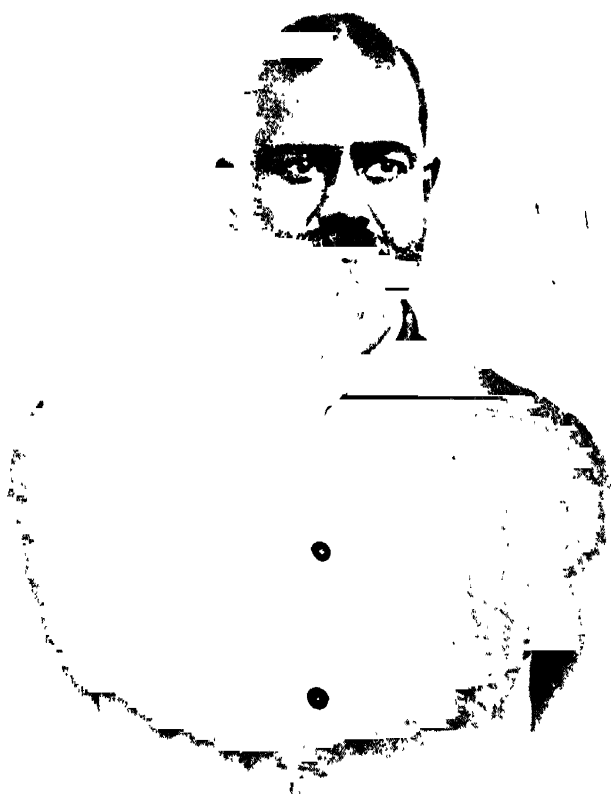
শ্রীযুক্ত রায় পঞ্চানন মজুমদার বাহাদুর

রায় বাহাদুর পঞ্চানন মজুমদার।

জেলা বর্দ্ধমান, চৌকি কালনা, থানা পূর্ব্বস্থলীর অন্তর্গত নারাণপুর গ্রামে সন ১২৭৮ সালের চৈত্র মাসে রায় বাহাদুর পঞ্চানন মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র মজুমদার মহাশয় অতি অমায়িক, ধর্ম্মভীরু এবং সর্ব্বজনপ্রিয় লোক ছিলেন। মজুমদার বংশ অতি প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত বংশ এবং ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ নবাব সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। নবাব সরকার হইতে তাঁহারা মজুমদার উপাধি লাভ করেন। বাস্তবিক পক্ষে ইঁহারা দে উপাধিধারী দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। এই বংশের অন্য এক শাখা নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাঝের গ্রামে বাস করেন। রায় বাহাদুরের প্রপিতামহ মাঝের গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া গঙ্গার অপর পারে পাটুলী গ্রামে বাস করেন এবং তাঁহার আবাস-ভবন সম্পত্তি আদি গঙ্গা সিকস্তি হওয়ার পর নারাণপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। নিম্নে ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল :—
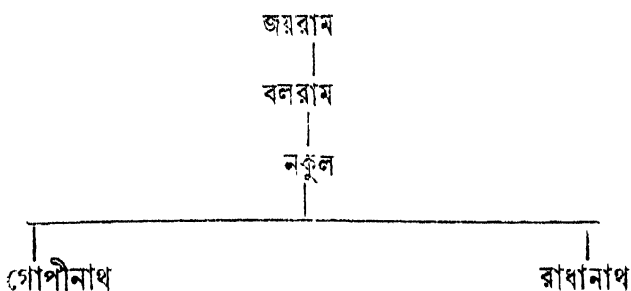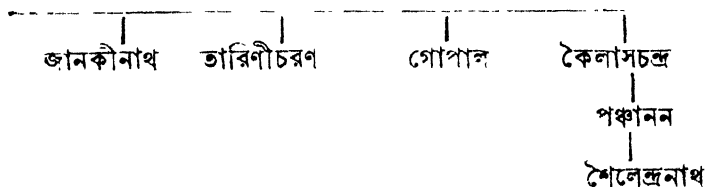
বালক পঞ্চাননের শৈশবকাল অতি সুখেই কাটিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ২।৩টি ভাই শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় পাঁচু ঠাকুরের মানত করিয়া পঞ্চাননের জন্ম হয় এবং পিতামাতার একমাত্র পুত্রসন্তান বিধায় ও পিতামাতার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল থাকায় তিনি পরম যত্নে ও আদরে লালিত পালিত হন। কিন্তু তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় পিতার মৃত্যু হয় এবং তৎপর তাঁহার মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে মানুষ করেন।

শৈশবকাল হইতেই পঞ্চানন অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইত। প্রথম ভাগের ক, খ, ইত্যাদি অক্ষর তিনি তিন দিনেই চিনিয়া আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুতে যদিও পঞ্চানন অভিভাবকহীন হইয়া পড়েন এবং আর্থিক সচ্ছলতাও কমিয়া যায়, তথাপি তাঁহার জননী তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষার জন্য কোনও দিন কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই এবং নিজের অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াও পুত্রের সুশিক্ষা বিধানে যত্নবতী হইয়াছিলেন। এরূপ মহৎহৃদয়া ও স্নেহময়ী জননী সকলের ভাগ্যে মিলে না এবং উত্তরকালে তিনি যে সম্মান ও অর্থলাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহার মূল কারণ তাঁহার জননীর আশীর্ব্বাদ। ১৩৩৩সালের ২৫শে শ্রাবণ তারিখে তাঁহার মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভগ্নিপতি ৺যদুনাথ বসু এবং তাঁহার মাসতুত ভাই শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র বসুও

তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পঞ্চানন প্রথমে নিজ গ্রামস্থিত গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন; তৎপর পাটুলী মাইনর স্কুলে (এক্ষণে উক্ত স্কুল উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে) পড়াশুনা করেন। তৎপর বগুড়া জেলার অন্তঃপাতী দুপচাঁচিয়া স্কুল হইতে ইনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বগুড়া জেলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ক্রমান্বয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৪ সালে ইনি সম্মানের সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অর্থাভাববশতঃ বি, এ, পাশ করার পরেই ইহাকে চাকরী গ্রহণ করিতে হয় এবং কয়েক স্থানে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া ১৮৯৯ সালে বি, এল পরীক্ষা দেন। উক্ত পরীক্ষায় পঞ্চানন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং স্বর্ণপদক ও পুরস্কার স্বরূপ পুস্তকাদি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণনগরে এফ্‌ এ, পড়ার সময় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাল্‌নার নেবপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ বসু মল্লিকের বংশে ইহার বিবাহ হয়।

বি, এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কিছুদিন যাবৎ ভাগলপুরে ওকালতী করেন এবং তাহার পর ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মালদহে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন এবং আজ পর্য্যন্ত সেইখানেই ওকালতী করিতেছেন।

মালদহে রায় বাহাদুর প্রায় ২৬ বৎসর ওকালতী করিতেছেন এবং জেলাবাসী সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে ও বিশেষ শ্রদ্ধা করে। ওকালতীতেও তাঁহার বেশ পসার প্রতিপত্তি আছে এবং তাঁহার সততা ও ব্যবসায়িক সাধুতার জন্য সকলেই তাহাকে যথেষ্ট খাতির করিয়া থাকে। ওকালতী ব্যবসায়ের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট এবং উক্ত ব্যবসায়ে কেহ যাহাতে কোন হীন বা নিন্দনীয় কাজ

না করে, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি আছে। দেশের লোকও সরকারী কর্ম্মচারী এই উভয় শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করা কাহারও অদৃষ্টে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু রায় বাহাদুরের সে সৌভাগ্য হইয়াছে। যদিও তাঁহার আদিম বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলায়, তথাপি মালদহবাসী তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া জ্ঞান করে।

মালদহ জেলার সর্ব্ববিধ উন্নতির দিকে রায় বাহাদুরের মনোযোগ ও দৃষ্টি আছে। তিনি ডেলিগেট স্বরূপে কাশীর কংগ্রেসে ও তৎপরবর্ত্তী বৎসরে কলিকাতার কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং ১৯০৪।৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় জেলার নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া লোকের মনে স্বদেশীভাব উদ্বুদ্ধ করিতে তৎপর হইয়াছিলেন।

দেশহিতকর সর্ব্ববিধ কার্য্যেই রায় বাহাদুর বরাবর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকেন। মালদহের অক্রুরমণি বিদ্যালয় ইঁহারই ঐকান্তিক যত্নে ও চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ও ক্রমে উন্নীত হইয়াছে এবং দ্বাদশ বর্ষের উর্দ্ধকাল যাবত ইনি উক্ত স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে ইনি বরাবর বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং আছেন। উক্ত স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্কুলগৃহে রায় বাহাদুরের তৈল চিত্র রাখার জন্য মনস্থ করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর পঞ্চানন মজুমদারই মালদহ জিলার সমবায় সমিতির জন্মদাতা। মাননীয় মিঃ কে, সি, দে মহাশয় যখন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সমবায় সমিতি সমূহের Registrar ছিলেন, ঐ সময় তিনি ১৯১১ সালে কৃষি শিল্প প্রদর্শনীর সময় মালদহে আসিয়া মালদহ আর্ব্বাণ ব্যাঙ্ক রেজিষ্টারী করিয়া দেন এবং ঐ সময়ে রায় বাহাদুর উক্ত ব্যাঙ্কের ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করিয়া উহা অতিশয় যত্নের সহিত পরিচালনা করিতে থাকেন। তদবধি তিনি উক্ত ব্যাঙ্কের সহিত

সংশ্লিষ্ট আছেন এবং গত ৭।৮ বৎসর কাল তিনি উক্ত ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কটী বঙ্গদেশের টাউন ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই সমবায় সমিতির ব্যাপারে রায় বাহাদুর যে ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া কৃষি সমবায় সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং ৪।৫ বার কলিকাতায় Co-operative Conferenceএ গিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছেন এবং সময় সময় জেলার স্থানে স্থানে গিয়া তত্রত্য সমিতিগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু পাথেয় বা বারবরদারী খরচ বলিয়া কখনও এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। সমবায় সমিতি সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য তিনি বাস্তবিকই অবৈতনিকভাবে করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের তরফ হইতে একবার তাঁহাকে একটি রৌপ্য নির্ম্মিত দোয়াত কলম উপহার দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু রায় বাহাদুর তাহা বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং ব্যাঙ্ক উক্ত দোয়াত কলমের জন্য যে ৪০ টাকা ব্যয় করিতে চাহিয়াছিলেন, রায় বাহাদুর উক্ত ৪০ টাকার উপর আরও কিছু নিজ হইতে দিয়া Urban Bank Prize Fund বলিয়া একটি ফণ্ড স্থাপন করেন এবং উহা হইতে প্রত্যেক বৎসর যোগ্য ছাত্রকে Prize দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মালদহ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপনের সময়ও রায় বাহাদুর বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং অনেকদিন যাবত উক্ত ব্যাঙ্কের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং তৎপরে চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়াছিলেন। গত বৎসর নূতন নির্ব্বাচনের সময় তিনি স্বেচ্ছায় উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর দুই তিনবার স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কমিশনার ছিলেন; ৪।৫ বার স্থানীয় ডিস্‌পেন্সারী কমিটির মেম্বর ছিলেন এবং দুইবার উক্ত কমিটির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, ২।৩ বার ডিষ্ট্রিক্ট

বোর্ডের মেম্বর ছিলেন এবং বর্ত্তমানে ইনি মালদহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এতদ্ভিন্ন ইনি মালদহ জেলা স্কুল কমিটির মেম্বর, বালো বালিকা বিদ্যালয় কমিটির মেম্বর, এগ্রিকালচারাল এসোসিয়েসনের মেম্বর, হোম ইণ্ডাষ্ট্রিস্ এসোসিয়েসনের সম্পাদক, বয়ন বিদ্যালয় কমিটির মেম্বর, একজিবিসন কমিটির মেম্বর ও সম্পাদক, জেলের পরিদর্শক প্রভৃতি বহুবিধ বে-সরকারী কার্য্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। গত সাত বৎসর যাবত ইনি মালদহের সরকারী উকিলের কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার স্ত্রী স্থানীয় মহিলা সমিতির সভানেত্রী।

১৯১২ সালের দিল্লী দরবার উপলক্ষে পঞ্চানন বাবু গবর্ণমেণ্ট হইতে দরবার মেডেল প্রাপ্ত হন এবং ১৯২১ সালের জুন মাসে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধি প্রদান করেন। ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

রায় বাহাদুরের এক পুত্র ও তিন কন্যা। কন্যাগণ সকলেই বিবাহিতা। পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল, মালদহে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

জেলা খুলনা বাগেরহাট সবডিবিসনের অধীন হাবেলী খলিফতে আবাদ পরগণার বর্ত্তমান জমিদার কাড়াপাড়া নিবাসী

রায় চৌধুরী বংশ।

কাণ্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আদিশূরের যজ্ঞার্থ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দশরথ বসুর পুত্র পরম বসু বঙ্গজ বসুবংশের আদি পুরুষ। বল্লাল সেন সমীকরণ করিয়া কৌলিন্য প্রথা যখন প্রবর্ত্তন করেন, তখন পুষণ বসু বঙ্গজ সমাজে কুলীন গণ্য হন। পুষণ হইতেই বঙ্গজ সমাজে পর্য্যায় গণনা হয়। এই পুরুষ হইতে ১৪ পর্য্যায় পরমানন্দ বসু যশোহর রাজ ভগ্নী ভবানীদেবীকে বিবাহ করিয়া ৬ পরগণা যৌতুক স্বরূপ পাইয়া রাজধানীর সন্নিকটে কালিগঞ্জ থানার পরমানন্দ বাটীতে বাস করেন। রাজকুমারী ভবানীর সহিত তাহার নাম যুক্ত হওয়ায় তাঁহার বংশধরগণ এখন ভবানী পরমানন্দ সন্তান বলিয়া বঙ্গজ সমাজে পরিচিত। হাবেলী খলিফতে আবাদ প্রভৃতি ৬ পরগণার জমিদার হওয়ায় রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরমানন্দ রায়ের পিতা বিদ্যানন্দ বসু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত লোক ছিলেন এবং কবিরাজ উপাধিধারী ছিলেন। হাবেলী খলিফাতেবাদ অতি প্রাচীন স্থান। পরমানন্দ রায়ের ভ্রাতা কমলাকান্ত বাচস্পতি সংস্কৃত শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। বাদশাহ আকবর সাহের আইন আকবরীতে খলিফতেবাদ একটা সরকার ছিল। এস্থানে রাজস্ব আদায়ের Head quarter ছিল। এই পরগণার মধ্যে খানজাহান

আলির সমস্ত কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ রাজা বসন্ত রায়ের সহিত রাজা প্রতাপাদিত্যের বিবাদ বিসম্বাদের সময় ভবানী ঠাকুরাণী ও পরমানন্দ রায় বাটী ত্যাগ করিয়া নিজ জমিদারী হাবেলী পরগণায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই ৬ পরগণার জমিদারীতে যখন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সূর্য্যাস্ত আইন প্রচার হওয়ায় কঠোর ভাবে রাজস্ব আদায় হইতে আরম্ভ হয়, তখন একে একে সমস্ত পরগণাই হস্তচ্যুত হয়; মাত্র হাবেলী খলিফতেবাদ ইহাদের হাতে বর্ত্তমান আছে। পরগণে রায়মঙ্গল বনাম রামপুর শিবপুর নিমক খালাড়ি মহল ভবানী পরমানন্দ বংশধরগণের সম্পত্তি। উহা গত ১৮৪৪ সালে যখন গভর্ণমেণ্ট লবণ ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লন, তখন ঐ মহল বাজেয়াপ্ত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বার্ষিক মালেকানা দিতেছেন। ঐ পরগণায় এখন কতক Reserve Forest কতক খাসমহলে পরিণত হইয়াছে। এই বংশ বহু প্রাচীন বংশ, ঊর্দ্ধ তিনশত বৎসর খুলনা জেলার কাড়াপাড়া গ্রামে বাস করিতেছে।

ইহারা বঙ্গজ সমাজের বিশিষ্ট কুলীন এবং বঙ্গজ সমাজের বহুতর শ্রেষ্ঠ কুলীনের সঙ্গে নানাপ্রকারে সংশ্লিষ্ট। ইহাদের আনীত বহুতর ব্রাহ্মণ, দক্ষিণরাঢ়ী ও অন্যান্য জাতি এদেশে বাস করিতেছেন। এ বংশে বহু ভাগ্যবান কৃতী পুরুষের জন্ম হইয়াছে। তন্মধ্যে মুনিরাম রায় একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। বাগেরহাটের নিকট মুনিগঞ্জ গ্রাম তাঁহাদেরই নামে স্থাপিত। তথায় গঞ্জেশ্বরী ৺কালী মন্দির এখন আছে। বাগেরহাট হাটবাজার ইহাদের সম্পত্তি। রহিমাবাদে (বয়নাবাজে) যে গোবিন্দগঞ্জ বাজার ছিল, তাহা মুনিরামের পৌত্র গোবিন্দচন্দ্রের কীর্ত্তি। বাগেরহাট বাজার উক্ত গোবিন্দের পৌত্র মহিমাচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধবচন্দ্রের নামে ঐ বাজারের নাম মাধবগঞ্জ। ১৮৭৭ অব্দে মহারাণীর রাজরাজেশ্বরী

উপাধি গ্রহণের সময় এই বংশের মহিমাচন্দ্রকে প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। "In recognition of his assistance rendered after the cyclone of 1867, general liberality and interest taken in the Promotion of works of public utility".

এই বংশে তিলকচন্দ্র রায় একজন বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন। তিনি ভাটার রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। হাবেলীর তিলকচন্দ্র বনগ্রামের তিলকচন্দ্র ও মসিদার তিলকচন্দ্র এই তিন তিলক সুন্দর বনের বাঘের তিলক বলিয়া এদেশে তখন পরিচিত ছিলেন। এই বংশে রামচন্দ্র রায় চৌধুরী পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে বিপুল দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি এদেশে লুচি মোণ্ডার প্রবর্ত্তক। ৺মাধবচন্দ্র রায়ের নামে মাধবগঞ্জের হাট হইয়াছে।

এই বংশে ৺শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী অতি দয়াবান পুরুষ ছিলেন তিনি মুক্তহস্তে দরিদ্রের সাহায্য করিতেন, দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল অন্ন ত্যাগী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সুধীরচন্দ্র বি এ, বিপুল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করিয়াছেন এবং তাঁহার ঐ বিপুল সম্পত্তি দেশের হিতকার্য্যের জন্য দান করিয়াছেন। বাগেরহাটে রামকৃষ্ণ মিশনের একটী শাখা তাঁহার দানেই স্থাপিত হইয়াছে। এই বংশে পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী সবজজ ছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী ওকালতী করিতেছেন। তিনি মুণ্ডাজাতির ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেশে একটা নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। আনন্দলাল রায় চৌধুরী লক্ষ্ণৌ ওয়াডস ইনসটিটিউসনে ৩০ বৎসর যোগ্যতার সহিত অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন এবং শ্যামাচরণ রায় সুদূর ব্রহ্মদেশের প্রান্তসীমায় গিয়া কাচিন ভাষায় অক্ষর প্রথম প্রকাশ করেন।

এই বংশের অন্যতম শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী রায় চৌধুরী শিবপুর কলেজের

শিক্ষা সমাপনান্তে সর্ব্বপ্রথম খুলনা জেলা হইতে ১৮৮৭ সালে সুদূর ব্রহ্মদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া যান। তথায় কর্ম্ম-নিপুণতা ও গভর্ণমেণ্টের বহু সাশ্রয় দেখাইয়া নানা কষ্টকর স্থানে নানা আয়কর পূর্ত্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তন করিয়া বিশেষ নানাবিধ Irriga-tion কার্য্যের প্রারম্ভ করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট নানাভাবে সুখ্যাতি লাভ করিয়া "রায় সাহেব" উপাধি লাভ করিয়াছেন। বিগত যুদ্ধের সময় নিকুঞ্জ বাবু গভর্ণমেণ্টকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। নিকুঞ্জ বাবু এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া নিজগ্রামে দেশের উন্নতিকল্পে বাস করিতেছেন। তিনি কাড়াপাড়া এইচ্‌. ই স্কুলেব সম্পাদক, বাগেরহাট কলেজের সদস্য ও ট্রাষ্টি, কো-অপারেটিভ সোসাইটীর সভাপতি, বাগেরহাট লোন কোম্পানী লিমিটেড ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে দেশের কাজে নিয়োজিত হইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় বাগেরহাট লোন কোম্পানি ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিকুইডিসনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। বহুতর অনাথা বিধবার ও নাবালক বালকবালিকার সম্বল ঐ কোম্পানীতে ন্যস্ত ছিল, তাহা কোম্পানী দ্বয়ের পূর্ব্বতম কর্ম্মচারী বা ডিরেক্টরদিগের শৈথিল্যে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। নিকুঞ্জ বাবু কয়েকটি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সাহায্যে ঐ কোম্পানী দুইটীকে রক্ষা করিয়াছেন। কাড়াপাড়া বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ হইতে প্রায় ২৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। কাড়াপাড়া গ্রামে একটী রিজার্ভ ট্যাঙ্ক কো-অপারেটিভ সোসাইটী, (Reserve tank Co-operative Society) ডাকঘর, এণ্টিম্যালেরিয়া সোসাইটী তাঁহার চেষ্টায় হইয়াছে। কাড়াপাড়া গ্রামে শ্রীমান সুধীর চন্দ্রের চেষ্টায় একটী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নিকুঞ্জ বাবুর ৩ কন্যা ও ৩টী পুত্র। কন্যা ৩টী শ্রেষ্ঠ কুলীনেই

বিবাহ দিয়াছেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মুরারী মোহন ব্রহ্মদেশে Railway Subordinate Engineerning Service এ কাজ করিতেছেন। মধ্যম শ্রীমান বনবিহারী Rangoon University হইতে B. Sc. পাশ করিয়া Engineering collegeএ 4th yearএ পড়িতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার বিবাহ টাকীর অন্যতম জমিদার রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ. বি এল, এম, এল্ সি মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত হইয়াছে। তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ পুলীন বিহারী Medical college এ 2nd year classএ পড়িতেছে। নিকুঞ্জ বাবু অক্লান্ত কর্ম্মী, সৎসাহসের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

রায় সাহেব নিকুঞ্জ বিহারী রায় চৌধুরীর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র "যশোহর খুলনার" ইতিহাসে যাহা লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ এস্থলে অসঙ্গত হইবে না "মহিমাচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শরচ্চন্দ্র ও নিকুঞ্জ বিহারী রায় সাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে কাড়াপাড়া গ্রামে হাই স্কুল কো-অপারেটিভ ভাণ্ডার, ডাকঘর ও লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। তিনি যেমন সুশিক্ষিত ও সজ্জন তেমনি বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল; তিনি যেমন অমায়িক, তেমনি সামাজিক এবং নিজের গ্রাম ও সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধানের জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও চিন্তান্বিত। গ্রাম্য স্কুলের অট্টালিকা নির্ম্মাণ জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থদান করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগ ও ব্যয় বাহুল্যে বাগেরহাট শিক্ষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন কাড়াপাড়ায় হয় এবং সে মহা মিলনের কর্ণধার হইয়াছিলেন আমাদের খুলনা জেলার গৌরবস্তম্ভ, জগদ্বরেণ্য বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। উহার কার্য্য বিবরণীর পূর্ব্বাভাষে রায় সাহেব নিকুঞ্জ বাবু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা সত্য। যে সকল সচ্চিন্তা লইয়া তিনি প্রবাসের কঠোরতা মন্দীভূত করেন, দেশে আসিলে কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয় কল্পে সেই সকল

চিন্তার কর্ম্মাভিব্যক্তি হয়। নিকুঞ্জ বিহারী হাবেলী পরগণায় একটি "সামাজিক সংঘ" স্থাপন করিয়া ঐ পরগণার অধিবাসী শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণকে সমবেত করিয়া জনহিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

এই রায় চৌধুরী বংশে আর একজন কর্ম্মী জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নাম ৺ অশ্বিনী কুমার রায় চৌধুরী. তিনি খুলনায় ও বাগেরহাটে প্রায় সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন। তিনি বাগেরহাটের (Government pleader) সরকারী উকিল ছিলেন। বাগেরহাট Loan company স্থাপনে তাহার বিশেষ হাত ছিল এবং তাহার মৃত্যুকাল অবধি ঐ কোম্পানীর Secretary বা director রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন। ৫ পুত্র ও ৫ কন্যা রাখিয়া তিনি পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত হিমাংশু কুমার রায় চৌধুরী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে Civil ও mining Engineering এবং Govt. Competency mining managership পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত পাশ করিয়া কয়লার খনিতে কাজ করিতেছেন।

কাড়াপাড়া রায়চৌধুরী বংশ
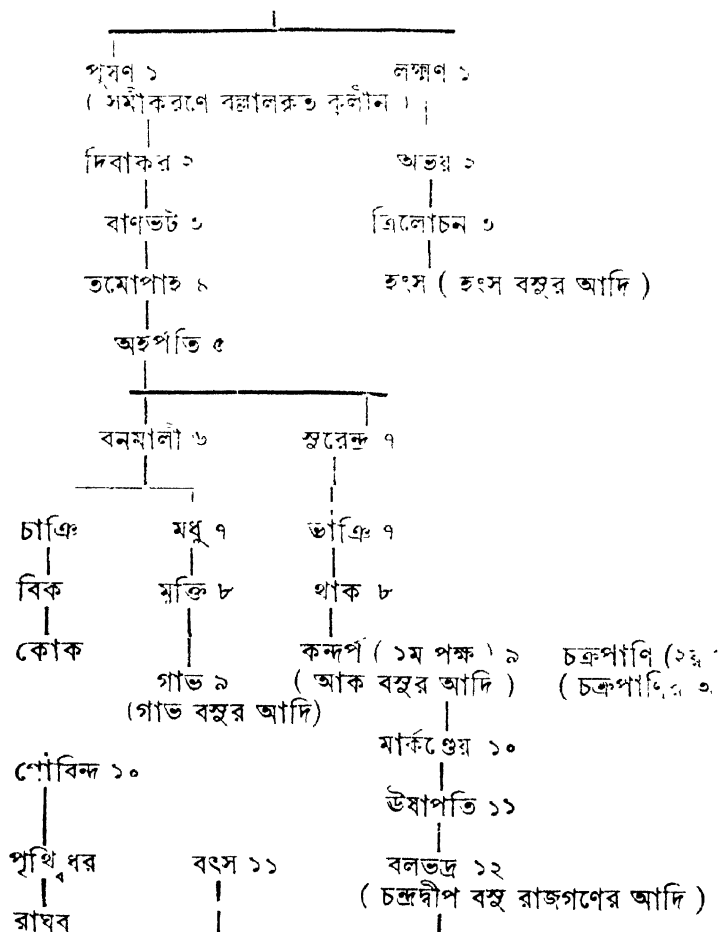
(রাঘব বসুর আদি) ভাসাকর ১২ রাজা পরমানন্দ রায় ১৩
(বৎস বসুর আদি)
রাজা জগদানন্দ রায় ১৪
বিবাহ ভাগ্যমন্ত রায়ের কন্যা
রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় ১৫

গাভ (গাভ বসুর আদি) ৯
বিশৎ কেশব গুহ
হৃষিকেশ ১০ অন্য ৭ পুত্র।
তেকড়ি বসু ১১
নারায়ণ বসু ১২
কমলাকান্ত বাচস্পতি ১৩ বিদ্যানন্দ বসু (কবিরাজ) ১৩

(হাবেলী কাড়াপাড়ার বসু বংশের আদি

পরমানন্দ রায় ১৪ রমানাথ রায় গোবিন্দ চন্দ্র রায়
(হাবেলী কাড়াপাড়ার রায় চৌধুরী বংশে) বিবাহ গুণানন্দ গুহের কন্যা ভবানী রাজা বসন্ত রায়ের ভগ্নী ও গোপীজন বল্লভ ঘোষের কন্যা বাসস্থান—পরমানন্দ কাটা
(বাস ইদিলপুর এই বংশের কেহ কেহ কেন্দুয়া দত্ত পাড়া উঠিয়া গিয়াছেন)
মধুসূদন ১৬

রঘুনাথ রায় ১৫
বিবাহ রাঘব গুহ রায়ের কন্যা কমলাকান্ত গুহ ও বাসুদেব ঘোষের কন্যা

মহাদেব রায় ১৬ হরিরায় কৃষ্ণদাস রায় বিষ্ণু রায় ১৬
বিবাহ রাধাবল্লভ গুহের কন্যা
রামজীবন গোপীকান্ত ১৭

রাজেন্দ্র ১৭ রামগোপাল ১৭ রামেশ্বর ১৭ নন্দকিশোর রামশুভাকর ১৮

মুনিরাম ১৮ রত্নেশ্বর ১৮

রামগোবিন্দ ১৯

রামকৃষ্ণ রঘুরাম রামানন্দ ১৮

রামগোপাল ১৭

রামকৃষ্ণ রায় ১৮ রামানন্দ রায় ১৮ রঘুনাথ রায় ১৮ কন্যা

বিবাহ রামনারায়ণ গুহ কন্যা বিবাহ রামনারায়ণ দত্ত

ভাস্বরজ হাবেলী

কন্যা

গদাধর রায় ১৯ গঙ্গাপ্রসাদ রায় ১৯ বিবাহ রাজনারায়ণ রায়

বিবাহ উপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ঘোষ

কন্যা কন্যা কন্যা

বিবাহ গোবিন্দ প্রসাদ বিবাহ দেবীপ্রসাদ গুহ রামলোচন গুহ

শম্ভুচন্দ্র রায় ২০ ভৈরবচন্দ্র রায় ২০ কন্যা

বিবাহ ভুজঙ্গধর রায় গুহ বিবাহ আতু সরকার পুঁড়া

টাকী চতুর্ভুজ

২১ হরচন্দ্র রায় বিশ্বনাথ রায় ২১ কন্যা কন্যা

বিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত রামচন্দ্র রায় গুহ গোপালকৃষ্ণ ঘোষ

আমড়াজুড়ী শ্রীপুর চরকাটা

কন্যা
রাজাকমল গুহ
ফরেকাবাদ

২২ পার্ব্বতীচরণ রায় ২২ ভবানীচরণ রায়
বিঃ রামলোচন ঘোষ গৌরমোহন ঘোষ (ইতনা)
কণিজ বনগ্রাম

২৩ অন্নদাচরণ রায় ২৩ কাশীশ্বর রায় রাজেন্দ্রনাথ রায় দেবেন্দ্র রায়
বিঃ রাজাচন্দ্র কুমার রায় কৃষ্ণধন রায় শরৎচন্দ্র রায় অক্ষয় কুমার রায়
ও টাকী টাকী
অবনীনাথ ঘোষ পুত্র
থুবা

সারদা চরণ রায় উপেন্দ্র রায় কন্যা কন্যা
প্রকাশচন্দ্র দাস নিবারণচন্দ্র রায় আশুতোষ রায়
টাকী টাকী

২৪ বামাচরণ রায় সতীশচন্দ্র রায় খগেন্দ্রনাথ রায়
বিঃ নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ রায় গুহ বিঃ অতুলচন্দ্র দত্ত (লক্ষ্ণৌ)
পুঁড়া পুঁড়া

২৫ কালিদাস রায় তারাদাস রায় দেবীদাস রায়

ভৈরবচন্দ্র রায় ২০

২১ ঈশ্বরচন্দ্র রায় ভোলানাথ রায় কালিকুমার মথুরানাথ মদনমোহন
বিঃ কমলা গুহ বিঃ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বিঃ রামচন্দ্র গুহ
ইঁাদলপুর বৈটপুর

২২ পঞ্চানন রায় ২২ ব্রজনাথ রায় কন্যা ২২ প্রফুল্লকুমার অশ্বিনীকুমার কন্যা
বিঃ নরোত্তমপুর

গুরুচরণ গুহ কালীবর পঞ্চানন ভোলানাথ হরি
কাচাবালিয়া,নাগ বেতরা শ্রীপুর সিংগাতী, সরকার

২৩ বেণীমাধব রায়
বরদাকান্ত দত্ত
কাড়াপাড়া

২৩ কন্যা
অক্ষয় দত্ত
পুড়া

২৩ শ্রীকণ্ঠ রায় বিধুভূষণ রায় শুধাংশুভূষণ কন্যা
বিঃ রাজকুমার দুর্গাচরণ দাস অখিল সরকার মহিমচন্দ্র দে
দে পাড়া বেতরা পুড়া ইদিলপুর

২৪মতিলাল সন্তান কন্যা কন্যা কন্যা ২৪কন্যা কন্যা কন্যা

২৪ ইন্দু বিনোদ বিজয় রবীন্দ্র অনিল কন্যা কন্যা

২৩ শুধাংশুকুমার হিমাংশু গিরীন্দ্রকুমার প্রমোদ নৃপেন্দ্র
সিবাটী বিঃ কৈলাশ বিঃ সৌরিন্দ্র
বগুড়া মধুপুর

কন্যা কন্যা

কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা
শতীশচন্দ্র অমলা দত্ত জ্যোতিন্দ্র বিনোদ ঘোষ আশুতোষ দত্ত
নরোত্তমপুর, কাড়াপাড়া,বহরমপুর, গাভা, আমড়াজুড়ি

২৪ কন্যা কন্যা অজিৎ রায় কন্যা কন্যা কন্যা
প্রতুল রায়
যশোহর

১৭ রামেশ্বর রায়

১৮ রত্নেশ্বর রায় (বিঃ পুরুষোত্তম দত্ত রাংদিয়া

১৯ রঘুনন্দন ১৯ কন্দর্পনারায়ণ
বি মুনিরাম গুহ টাকী

২০ রামনারায়ণ ২০ শিবপ্রসাদ
ব্রজমোহন গুহ টাকী বি বলরাম দাস সাদেভোগ

২১ হরিনারায়ণ

২২ কমলাকান্ত ২২ গোপীনাথ ২২ কালীপ্রসাদ
বি ইদিলপুর ওলপুর, সিংগাটি

২৩ জগদীশ ২৩ নগেন্দ্র

২৪ নকুলেশ্বর মন্মথ ২৪ শম্ভুচন্দ্র বি-এ

২৫ কালীপদ ২৫ প্রশান্ত

২৫ ভুবনেশ্বর সুকুমার

২ রামচন্দ্র নবীনচন্দ্র কৈলাশচন্দ্র কন্যা কন্যা কন্যা কন্যা
বিকনা বিঃ ওলপুর বিকনা

২৩ ধ্রুবচন্দ্র

২৩ উদ্ধবচন্দ্র ২৩ হরিচন্দ্র
গাভা

২৪ বিজয় ২৪ সুধাংশু রমানাথ অতুল অনাদি
শ্রীপুর

২৫ পুত্র

২৪ মণিমোহন যতীন্দ্র মোহন

টাকী　　গাভা

১৫ পুত্র

২৩ নিকুঞ্জ　　যোগেশ　　সুরেশ

২৪ প্রবোধ　　কন্যা

২৪ মুরারী　　বনবিহারী বি-এস্-সি　　পুলীন　　কন্যা　　কন্যা　　কন্যা
নরোত্তমপুর　　(হরেন্দ্র রায়)　　বিকনা　　বৈটপুর　　পুড়া
টাকী

১৯ রামগোবিন্দ রায়

২০ গোবিন্দ চন্দ্র
রামানন্দ রায় পুড়া

২১ কৃষ্ণচন্দ্র　　রাজচন্দ্র　　মহেন্দ্র চন্দ্র　　তিলকচন্দ্র　　গোকুলচন্দ্র　　ভারতচন্দ্র
বিঃ ইদিলপুর　　বিঃ হাবেলী　　বিঃ শ্রীপুর　　টাকী　　বিঃ সিংগাতি

২৩ চন্দ্রকান্ত রজনী

২৪ অক্ষয় অমূল্য বিনয় ২৪ অবিনাশ

২৫ অজিৎ

২৩ দেবেন্দ্র ২৩ লম্বোদর

বিঃ বিকনা
উপেন্দ্র ঘোষ
গাভা

২২ মহিম চন্দ্র বি উলপুর ঘোষ রামতারণ মাধবচন্দ্র

বি বেগুকাটী
ও টাকী

২৩ নিবারণ শরৎ পূর্ণ জ্যোতীশ অবিনাশ

২৪ সুরেশ

২৪ সুধীর ২ কন্যা কন্যা

২৪ প্রণব প্রফুল্ল কন্যা
হাওড়া টাকী

২৫ ব্যোমকেশ কমলেশ নরেশ অনাথ কন্যা কন্যা
বিঃ সৈদপুর ...নগর ...

২২ মাধবচন্দ্র রায়

২৩ হেমচন্দ্র ২৩ নির্ম্মল ২৩ ভূপেশ ২৩ দীনেশ কন্যা কন্যা
বি জগদীশ ভুবনচন্দ্র টাকী হরেন্দ্র রায়
টাকী শিবহারী

৫ কন্যা ২৪ অমল ২৪ বেণু

৫ কন্যা ২৪ বিমল অনিল কণক

শিবচন্দ্র — গৌরচন্দ্র
জয়চন্দ্র — হরচন্দ্র কালীপ্রসাদ দুর্গাপ্রসাদ গোপাল

উমেশচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র মহেন্দ্র সূর্য্যকুমার

অতুল রাম শরৎ নিরুপম নির্ম্মল যজ্ঞেশ্বর সীতানাথ
বি-এল বি ই

জিতেন্দ্র বিজয়

১৮ রঘুরামের ধারা

শ্যামসুন্দর বনমালী ১৯ দশরথ ভাগাধর
নবকৃষ্ণ রায় সদাশিব ২০ ফকিরচন্দ্র রায়

মদনচন্দ্র (দত্তক)
ত্রৈলোক্যনাথ রায়

বিহারী আনন্দ

অমৃত মতি ভগবতী
১৮ রামানন্দ রায়

১৯ রাজনারায়ণ রায় রামকান্ত রায়

২০ রাজকৃষ্ণ রায় | ২০ শতপক্ষাধর রায় গুহ | ২০ কন্যা লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ

২১ রামলোচন রায় | কালীশঙ্কর রায় | পদ্মলোচন রায়

২০ ষষ্ঠীবর রায় | কন্যা বিবাহ বৈকুণ্ঠনাথ রায়

২৩ চন্দ্রমাধব রায় | কন্যা বিবাহ সর্বেশ্বর গুহ | কন্যা বিবাহ প্রতাপ রায়

২১ কালীশঙ্কর রায়

২২ বিশ্বম্ভর

২০ শ্যামাচরণ রায় | লক্ষ্মীনাথ রায়

১৯ রামকান্ত রায়

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি, এ, এম, বি।

ইনি কৃষ্ণনগর নিবাসী বারেন্দ্র শ্রেণীর অন্তর্গত ছ-ঘরিয়া মতের কুলীন বংশজাত। রোহিলপটির কুলীনদিগের মধ্যে ছ-ঘরিয়া মত সবিশেষ সম্মানার্হ ছিল; কিন্তু কালক্রমে পাত্রাভাবে মতান্তর হইতে-হইতে এখন ঐ মতের কুলীন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। এককালে কৃষ্ণনগরের চৌধুরী বংশ ধনে মানে এবং শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বলিয়া এ অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ইঁহার প্রপিতামহ ঐ বংশে বিবাহ করিয়া কৃষ্ণনগরেই বাস করিতে থাকেন।

শ্রীরামপুরে মাতামহালয়ে সান্যাল মহাশয়ের জন্ম এবং বাল্যে বাঙ্গালা বিদ্যা শিক্ষা শ্রীরামপুর বঙ্গ বিদ্যালয়েই হয়। যথা সময়ে ছাত্র বৃত্তি পাইয়া ইনি কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। সকল শ্রেণীতেই ইনি সর্ব্বোত্তম ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি পান এবং পরে পাটনা কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষা দিয়া প্রথম-বিভাগে একাদশ স্থান অধিকার করেন। সে বৎসরে ঐ কলেজ হইতেই শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান পাইয়া কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেন। স্যান্যাল মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার মনে একটা উচ্চ আদর্শ অবিচলিত ভাবে বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি ২০৲ টাকা বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া বি, এ, পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। পঠদ্দশায় তাঁহার এই স্বাবলম্বন-

মনোভাব অনুকরণীয়। এই কলেজে বি, এ, শ্রেণীতে যে কয়জন তাঁহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বলিয়া স্যানাল মহাশয় গর্ব্ব করিতে পারেন, তাঁহাদের মধ্যে ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল দে, শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হেরম্ব নাথ মৈত্র মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। বি, এ, পরীক্ষা কালে ইনি প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়াও পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু রসায়ণ পরীক্ষার দিন জ্বরাধিক্য বশতঃ উনি ঐ বিষয়েই ফেল হয়েন। বি, এ, পড়িবার সময় ইনি উহার বিজ্ঞান শাখা অবলম্বন করেন। সেই সময় হইতেই ইঁহার সঙ্কল্প ছিল, জড় বিজ্ঞান শিক্ষার পরে জীব বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া উপ-জীবিকার্থে ডাক্তারী শিক্ষা করিবেন। বি, এ, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলেও ইনি নিরুৎসাহ না হইয়া, উক্ত সঙ্কল্প অনুসারে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন, দ্বিতীয় বর্ষে বি, এ, পরীক্ষা দিয়া উহাতে উত্তীর্ণ হইলেন। মেডিকেল কলেজে ইনি নানাবিধ বৃত্তি, প্রাইজ ও রৌপ্য এবং স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। প্রথম দুই বৎসর একদিকে মেডিকেল কলেজের পাঠ এবং বি, এ, পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিয়াও, ইনি ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভায় ছাত্র-রূপে যোগ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই এবং সেখানকার বার্ষিক পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি, পারিতোষিক, পুস্তক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রবল উৎসাহই তাঁহাকে এইরূপ কঠোর অধ্যবসায়ে প্রণোদিত করিয়াছিল এবং ইহার জন্যই ঐ বিজ্ঞান সভার সংশ্রবে ইনি ডাক্তার সরকারের স্নেহ ভাজন ও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

বিজ্ঞান বিষয়ে ইঁহার এতই অনুরাগ ছিল যে, মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইবামাত্র ইনি ডাক্তার সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্তাব করেন, "এখন আমি বিজ্ঞান-সভার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, যদি

ঐ সভার কার্য্যে আপনি আমাকে গ্রহণ করেন।” ইহার উত্তরে ডাক্তার সরকার বলিলেন,—তোমার প্রস্তাব শুনিয়া আমি সুখী হইলেও তোমাকে এরূপ কার্য্য করিতে উপদেশ দিতে পারি না। তাহার কারণ এই যে, বিজ্ঞান-সভার তহবিল হইতে আপাততঃ যে বেতন তোমাকে দিতে পারিব, তাহাতে তোমার মত উৎসাহশীল যুবক প্রথম-প্রথম কয়েক বৎসর সন্তুষ্ট থাকিলেও পরে সে বেতনে তোমার পোষাইবে না। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান সভায় অধিক অর্থাগমেরও কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। এমত অবস্থায় তুমি উৎসাহী হইলেও, আমি তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তোমাকে বিজ্ঞান-সভার কার্য্যে যোগ দিতে বলি না।

ডাক্তার সরকার মহোদয়ের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, ইনি স্বাধীনভাবে কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন শুনিলেন, মেডিকেল কলেজের রসায়ণ পরীক্ষা বিভাগে একজন ডাক্তারকে লওয়া হইবে। ঐ বিভাগের কর্ত্তা ডাক্তার ওয়াডেন সাহেব প্রদত্ত স্বর্ণপদক সান্যাল মহাশয়ের ছিল; সুতরাং তিনি ঐ কার্য্য প্রার্থী হইলে বিফল মনোরথ হইতেন না। তবু সান্যাল মহাশয় তাৎকালিক ঐ বিভাগের সহকারী রসায়ণ পরীক্ষক ৺তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের পরামর্শ লইতে যান। তাহাতে তারাপ্রসন্ন বাবু বলেন, আপনি যখন প্রথম বর্ষে রসায়ণ পরীক্ষায় ম্যাকনামারা রৌপ্যপদক পাইয়াছেন এবং দ্বিতীয় বর্ষে ওয়াডেন সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত ঐ বিষয়ে স্বর্ণপদক পাইয়াছেন, তখন সাহেব আপনাকে লইতে কোনরূপ ইতস্ততঃ করিবেন না। আমিও আপনাকে বিজ্ঞান সভার সংশ্রবে বিশেষরূপেই জানি। আপনি এ বিভাগে কর্ম্ম লইলে ভালই হইবে। কিন্তু আপনি যখন আমার কাছে পরামর্শ লইতে আসিয়াছেন, তখন আপনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও যেরূপ পরামর্শ দিতাম, তাহাই আপনাকে দিতেছি। অর্থাৎ এ বিভাগের

চাকুরী বড়ই কষ্টকর এবং ইহাতে শারীরিক পরিশ্রমের একান্ত অভাব! এই দেখুন, আমি বহু মূত্র রোগে ভুগিতেছি। সুতরাং আমার পরামর্শ নয় যে, আপনি এ বিভাগে আসেন। হাসপাতাল বিভাগের কর্ম্ম এ বিভাগের কর্ম্ম অপেক্ষা বেশী প্রীতিকর এবং তাহার সঙ্গে বাহিরে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে বারণ না থাকায় মোটের উপরে বেশী অর্থকর এবং তাহা ছাড়া ইতস্ততঃ বদলীর ব্যবস্থা থাকায় নানাবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সহায়ক। আপনি যদি সরকারী চাকুরী লওয়াই স্থির করেন, তবে হাসপাতাল বিভাগেই থাকুন।

ভুক্তভোগী প্রবীণ শ্রদ্ধেয় তারাপ্রসন্ন বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত, এই বিবেচনা করিয়া সান্যাল মহাশয় ঐ চাকুরী গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন না। ইহারই কিছুকাল পরে নবাধিকৃত উত্তর ব্রহ্ম প্রদেশের জন্য গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন অ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করা স্থির করিলেন, ইনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া অ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জনের জয় পতাকা ধারণ করিলেন এবং মাত্র দুই সপ্তাহ মেডিকেল কলেজের কর্ম্ম করিয়া ১৮৮৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে ব্রহ্মদেশের জন্য রওনা হইলেন। সেই জাহাজে আরও ছয় সাত জন অ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর অন্যতম। ইঁহারা যে সময়ে ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন, তখন উত্তর ব্রহ্মপ্রদেশ সামরিক শাসনের অধীন ছিল। সর্ব্বদা অতি সন্তর্পণে বাস করিতে হইত, লোকের মধ্যে পল্টন, গোরা, সিপাহী এবং এই এই সংক্রান্ত অন্যান্য। রাত্রি আটা হইতেই ঘরের আলো ও রান্না ঘরের অগ্নি নিবাইতে হইত। সেই সময়ে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষগণ থাকিতেন মান্দালয়ে এবং নবাধিকৃত রাজ প্রাসাদই ছিল তাঁহাদের অফিস। মান্দালয়ে গিয়া সান্যাল মহাশয় ভামোয় যাইবার অনুজ্ঞা লইলেন। ভামো উত্তর ব্রহ্ম প্রদেশের সর্ব্বোত্তর ভাগে অবস্থিত।

ভামোর উত্তরেই চীন সীমানা। দেড় বৎসর সেখানে থাকিবার পরে ইনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং মেডিকেল কলেজে হাউস্-ফিজিসিয়ান্-রূপে নিযুক্ত হন। ঐ পদের নির্দ্দিষ্টকাল দুই বৎসর অতীত হইবার পরে ইনি রাণীগঞ্জ, মজঃফরপুর, সারণ, চম্পারণ ও যশোহরে কর্ম্ম করেন। তৎপরে ইনি পোর্টব্লেয়ারে যান। সেখানে প্রায় দশবৎসর থাকিয়া ইনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েক বৎসর গয়ায় থাকিবার পরে, সিবিল সার্জ্জনরূপে মনোনীত হন। এই কার্য্যে ইনি প্রথমে প্যালামো, তৎপরে নদীয়া ও পাবনায় থাকিয়া অবশেষে ময়মন-সিংহে গিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। বৃদ্ধ বয়সে ময়মনসিংহের মত বড় জেলার কার্য্য করিতে করিতে মস্তিষ্ক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তৎক্ষণাৎ ইনি কার্য্য হইতে অবসর লইলেন।

এই অবসর কাল তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেছেন। বাল্য হইতেই ইঁহার সাহিত্য-প্রীতি ছিল। যৌবনে শিক্ষাগুণে ইনি বিজ্ঞানের সবিশেষ পক্ষপাতী হইলেও, তাঁহার অন্তর্নিহিত সাহিত্য-প্রীতি কখনই নষ্ট হয় নাই। মেডিকেল কলেজে পাঠদশার শেষ ভাগে তিনি তৎকালের নব প্রকাশিত ও বহুজন আদৃত 'বঙ্গবাসী' পত্রে নিয়মিত ভাবে বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। পোর্টব্লেয়ারে থাকিতে ইনি সেখানকার অবসর কালের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, মেঘনাদবধ কাব্যের টীকা ও কুমারসম্ভবের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কিছুকাল বিশ্রামান্তে একটু সুস্থ হইয়াই ইনি সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কাব্য গ্রন্থাদির আলোচনার মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থও ইনি লিখিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার সাহিত্য চর্চ্চার নিদর্শন স্বরূপ গ্রন্থ কয়খানির নাম উল্লেখ করিতেছি।

১। নীলু খুড়ো (রস রচনা)

২। কুমার সম্ভব কাব্য – বিশদ ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত ভূমিকার সহিত সরল গদ্যানুবাদ।

৩। মেঘনাদ বধ কাব্য। বিরাট সংস্করণ। বিশদ ব্যাখ্যা ও সুবিস্তৃত ভূমিকার সহিত।

৪। সীতা ও সরমা। বিশদ ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত ভূমিকার সহিত

৫। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। (ঐ)

৬। ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা। (ঐ)

৭। তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য। (ঐ)

৮। রামায়ণ। বাল্মীকি অনুসরণে, সরল গদ্যে সার সঙ্কলন।

৯। স্বাস্থ্য বিদ্যা প্রবেশিকা।

১০। সরল স্বাস্থ্য পাঠ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড

১১। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পাঠ।

ইনি আজীবন অধ্যয়নপরায়ণ ও চিন্তাশীল। যৌবনে অবসর কাল ইনি কখনও অপব্যয় করেন নাই। গভীর বিষয়ের আলোচনা ভিন্ন হালকা সাহিত্যে কোন কালেই ইঁহার রুচি ছিল না। যে গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে গভীর চিন্তার বা প্রগাঢ় রসের উদ্রেক না হয়, সে গ্রন্থ পড়া বিফল, ইঁহার মনোভাব এইরূপ। ইনি যৌবনের বহু বৎসর হার্বার্ট স্পেনসারের দার্শনিক গ্রন্থগুলি বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। স্পেন্সারের দার্শনিক প্রণালী ইঁহার অত্যন্ত মনোনীত এবং স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ, বেদান্ত দর্শনেরই বৈজ্ঞানিক সংস্করণ, ইনি এইরূপ মনে করেন। গুণকর্ম্মভেদে শ্রেণী বিভাগ থাকা সমাজ মধ্যে শান্তির অনুকূল, সমাজ সম্বন্ধে ইঁহার এইরূপ বিশ্বাস। কারণ, উদ্দাম প্রতিযোগিতা সমাজ মধ্যে বিস্তৃতি পাইলে অশান্তির সৃষ্টি হয়। শ্রেণীবিভাগ করিলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয় এবং আহার ও বিহারাদি

বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কিত থাকায় শ্রেণী মধ্যে উদ্দাম প্রতিযোগিতার নখ-দন্তও সে পরিমাণে তীক্ষ্ণ থাকে না। স্থূলভাবে ইহার সামাজিক মত এইরূপ।

জেলা হুগলি থানা ধনিয়াখালির অন্তর্গত ভাণ্ডারহাটী গ্রামের চৌধুরী বংশ।

ভাণ্ডারহাটী গ্রামের চৌধুরী বংশ অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ বংশ। কথিত আছে যে, কল্যাণ মিশ্রীর বংশের সিদ্ধান্ত বাগীশের সন্তানগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ ভাণ্ডারহাটী গ্রামে এবং অন্য ভাগ গোবরডাঙ্গার সন্নিকটস্থ ইছাপুর গ্রামে বসবাস করিয়াছিল ক্রমে ভাণ্ডারহাটীর বংশ তিনভাগে বিভক্ত হয়। ইহা আমরা এই বংশের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জিউর ও শ্রীশ্রী৺দুর্গামাতার সেবার ও পূজার পালা পদ্ধতি হইতে দেখিতে পাই। এই বংশ প্রথমে শাক্ত এবং বহু পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপাসক হয়। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীশ্রী৺দুর্গামাতার পূজায় বলিদানের ব্যবস্থা আছে এবং বলিদানের পর হরিনাম করা হয়। বলিদানের পূর্ব্বে শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জীউর পূজা ও ভোগ দেওয়া সমাপন হয়। সাবেক পদ্ধতি অনুসারে তাঁবু ফেলিয়া মহাষ্টমীর বলিদানের সময় নিরূপণ হয়। শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জিউর একটী বহু পুরাতন পাকা মন্দির আছে এবং তৎসংলগ্ন একটী প্রশস্ত ঘেরা উঠান আছে। উক্ত মন্দির উঠান এই বংশের বাবু মতিলাল চৌধুরী কর্ত্তৃক সংস্কার হইয়াছিল। মতি বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র বাবু

কালিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দির সংলগ্ন একটী পাকা পাকশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং মতি বাবুর স্মৃতি রক্ষার্থ একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটা পাকা দ্বিতল বাড়ী ও নগদ দুই হাজার টাকা হুগলি জেলা বোর্ডের হস্তে দিয়াছেন। এই বংশের বাবু বনবিহারী চৌধুরী হুগলী জেলা বোর্ডের ও লোক্যাল বোর্ডের একজন মেম্বর এবং তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নে ও চেষ্টায় উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয় ইংরাজি ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ভাণ্ডারহাটী ও তৎপার্শ্বস্থ বহু গ্রামের হাজার হাজার লোক প্রতি বৎসর বিনামূল্যে উক্ত চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা প্রাপ্ত হইতেছেন। সম্প্রতি উক্ত চিকিৎসালয়ে একটী নলকূপ খোদিত হইয়াছে। তজ্জন্য এই বংশের বাবু অতুল চন্দ্র চৌধুরী জেলা বোর্ডের হস্তে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং বনবিহারী বাবুর একান্ত চেষ্টায় জেলা বোর্ড উক্ত কার্য্যের জন্য প্রায় ৫০০ শত টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত চিকিৎসালয়ের বর্ত্তমান সেক্রেটারী এই বংশের বাবু অনাথ নাথ চৌধুরীর চেষ্টায় ও যত্নে উক্ত চিকিৎসালয় ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ভাণ্ডারহাটী গ্রামে ৺বিধুমণি দাসীর প্রতিষ্ঠিত একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য বিধুমণি দাসী দশ সহস্র টাকার নোট দান করিয়া গিয়াছেন এবং একটী পাকা স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে উক্ত স্কুল গৃহ এই বংশের বাবু অতুল চন্দ্র চৌধুরী অনেক পরিমাণে সংস্কার করিয়াছেন এবং কয়েকটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি এক্ষণে উক্ত স্কুলের সেক্রেটারী এবং এই বংশের বাবু অনাথ নাথ চৌধুরী স্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভাপতি। তাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় স্কুলটী ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ভাণ্ডারহাটী গ্রামের চৌধুরী পাড়ার এই বংশের একটী বহু পুরাতন

৺শিব মন্দির আছে। উহা ১৬৬১ শকাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। হরিপাল হইতে ভাণ্ডারহাটী পর্য্যন্ত জেলাবোর্ডের একটী পাকা রাস্তা আছে।

এই বংশের ৺মধুসূদন চৌধুরী মহাশয় একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি কোম্পানীর কাগজের একজন প্রধান ব্যবসাদার ছিলেন। তিনি বহু টাকা উপার্জ্জন করিয়া অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং বহু দীন দরিদ্র প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহার স্বর্গীয়া মাতার "তুলট" করিয়াছিলেন এবং গ্রামে একটী মধ্য ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ স্কুল হইতে বহু ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া এখন জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। এই বংশের বাবু কালিদাস চৌধুরী ও বাবু বনবিহারী চৌধুরী এক্ষণে হুগলি জেলাকোর্টে ওকালতি করিতেছেন এবং বাবু বঙ্কুবিহারী চৌধুরী ও বাবু নলীন বিহারী চৌধুরী কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারি করিতেছেন। এই বংশের বাবু অতুলচন্দ্র চৌধুরী কলিকাতা খিদিরপুরের জাহাজে মাল সরবরাহকের (Stevedore) ইত্যাদি কার্য্য করেন এবং বহু টাকা অর্জ্জন করিতেছেন। ইনি দেশ হিতকর অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। এই বংশের বাবু বনবিহারী চৌধুরী প্রায় ৫।৬ বৎসর হুগলি জেলা বোর্ডের মেম্বর থাকিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, নলকূপ স্থাপন, রাস্তাঘাট মেরামত ও বালিকা বিদ্যালয় এবং U. P স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানাবিধ দেশ হিতকর কার্য্য করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

ভারেঙ্গা চক্রবর্ত্তী বংশ

মাতুলালয়।

পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১২৪৪ সনে ২৬শে আশ্বিন ইং ১৮৩৭ সনে ১৩ই অক্টোবর ময়মনসিংহ জেলায় ভাদোর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতুল বংশ বেশ অবস্থাপন্ন ছিলেন এবং এখনও তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই উচ্চপদাবস্থিত।

ভারেঙ্গা-পরিবার।

তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আবশ্যক। ইঁহারা রুদ্র বাগ্‌চির সন্তান এবং ইঁহাদের আদিম বাস ছিল সিমুলিয়াতে। ঐ বংশের নবম পুরুষ কৃষ্ণদেব বাগ্‌চী ভারেঙ্গার রামেশ্বর চৌধুরীর সহিত করণ করিয়া কাপ হন। উক্ত কৃষ্ণদেব বাগ্‌চী সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদা দুর্গোৎসবে চৌধুরী মহাশয়দের পুরোহিত পীড়িত হওয়ায় কৃষ্ণদেব তাঁহাদের পূজা করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই তিনি চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত হইলেন ও বংশ-পরম্পরাক্রমে সেই উপাধি চলিয়া আসিতে লাগিল। তাঁহারই অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যাদবচন্দ্র এই বংশে যাজনিক ব্যবসা কখনও ছিল না। নাটোরের প্রদত্ত প্রচুর ব্রহ্মোত্র ভূমিতেই ইঁহাদের আয় যথেষ্ট ছিল এবং তাহাতেই ইঁহাদের সংসার স্বচ্ছন্দরূপে চলিয়া যাইত। ক্রমে ব্রহ্মোত্র যমুনা নদীতে মগ্ন হওয়ায় অবস্থা পরিবর্ত্তন হয় এবং পীতাম্বরের দুই ভ্রাতা ক্রমে পাবনাতে মোক্তারী ও তিনি স্বয়ং চৌধুরী জমিদারগণের দেওয়ানী কার্য্য করেন।

বাল্য-শিক্ষা।

ভারেঙ্গা চক্রবর্ত্তী পরিবারের আদি নিবাস ভারেঙ্গা গ্রামে। উক্ত গ্রাম পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছিল এবং পরে পাবনা জেলা স্বতন্ত্র হইতেই তাহাতে স্থান পায়। ঐ গ্রামে চৌধুরী বংশই প্রধান ছিল। তাঁহাদের যত্নে এত পূর্ব্বকালেও সময়োপযোগী বিদ্যা শিক্ষার উত্তম ব্যবস্থাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যাদবচন্দ্র প্রথম ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণ পাঠশালাতেই লেখাপড়া (বাঙ্গলা) শিখিয়াছিলেন। ঐ সময় ভারেঙ্গার জমীদার ৺ চন্দ্রকান্ত চৌধুরী গ্রামস্থ সমুদয় বালকের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং যাদবচন্দ্রকে তিনি তখন হইতেই বিশেষ স্নেহ করিতেন। ইহার পরে যাদবচন্দ্র মুসলমান মুন্সীর নিকট গ্রামেই পার্শী শিক্ষা করিতেন। তাঁহার নিজের জীবন বিষয়ে যে সকল নোট আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, উক্ত মুন্সী তাহাকে প্রত্যূষ হইতে বেলা ৯টা, দ্বিপ্রহর হইতে বিকাল ৪টা ও সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত পার্শী মুখস্থ করাইতেন ও লেখাইতেন,কিন্তু অর্থ বলিতেন না। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা থাকায় যাদবচন্দ্র ঐ সামান্য বাল্য শিক্ষা লইয়াই চমপারণ ছোট আদালতে প্রচলিত উর্দ্দূতে সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সময় অন্য সকল শিক্ষার সহিত প্রত্যেক বালককেই প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া নিজ নিজ বৃদ্ধ অভিভাবকের নিকট নাম শ্লোক পাঠ করিয়া পিতৃমাতৃকুলের তিন চারি পুরুষের নাম, গোত্র, গাঁই, বেদ ব্রাহ্মণ শ্রোত্রীয় কুলের লক্ষণাদি বিষয়ে অনুশীলন করিতে হইত। যাদবচন্দ্রের এই প্রথাটী এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার নিজ পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র সকলকেই সেই নাম শ্লোক লিখাইয়া পাঠ করাইতেন। পরিণত বয়সে যে তিনি এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া কুলশাস্ত্র দীপিকা সঙ্কলন করেন, তাহারও মূল এই হইতেই পাওয়া যায়।

পাবনা (১২৫৫—১২৬৪)

১২৫৫ সনে ১২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যাদবচন্দ্র ইংরাজি পাঠের জন্য পাবনা গিয়া তাঁহার পিতৃজ্যেষ্ঠের বাড়ীতে থাকিয়া স্থানীয় ইংরাজী স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত এই স্থানেই তাহার পড়া শুনা চলিতে লাগিল। ক্লাশে তিনি বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করিতেন।

কিন্তু ঐ সময়ে সেখানে এক নূতন নিয়ম প্রচলিত হইল। ১৯ বৎসর অধিক বয়স বলিয়া তিনি পাবনা হইতে এণ্ট্রেন্স দিতে অনুমতি পাইলেন না। তাঁহার পিতৃবগণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ত্রিসন্ধ্যা করিয়া স্বপাক আহার করিতেন। যাদবচন্দ্রেরও শিশু বয়স হইতে প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব ছিল। বাল্য বয়সেই মাতুলালয়ে মদন মোহন ও রাধিকা মূর্ত্তি দেখিয়া ঐ সকল বিগ্রহের মানুষের মতই পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ঐ সময় পাবনার ৺হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার সহিত সর্ব্বদা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা পূর্ব্বক এবং অক্ষয়কুমার ও রাজ নারায়ণের পুস্তকাবলী পড়িয়া তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়। তখন বিক্রমপুরের নীলমণি সেন পাবনা স্কুলের ইন্সপেক্টার হইয়া আসেন এবং সেখানে একটী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত করেন। যাদবচন্দ্র অতি গোপনে সেখানে যাতায়াত করিতেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পাবনা বাসের শেষ দিকে পারিবারিক নানা দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয় এবং একদিকে উপার্জ্জনশীল পিতৃব্যদের মৃত্যু অপর দিকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি নদীগর্ভে ধ্বংশ ; এই দুই মিলিয়া তাহার উচ্চ

শিক্ষা লাভ অসম্ভব করিয়া তোলে। পাবনাতেই তাঁহাকে স্কুলে একটী চাকুরী দেওয়ার প্রস্তাব হয়।

কিন্তু ঐ সময়েই যাদব চন্দ্র উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ভ্রাতাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া পরিবারের পুনরায় অবস্থা পরিবর্ত্তন বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং সেই জন্য বিষম সাহসে ভর করিয়া মাত্র ৫৲ টাকা সম্বল লইয়া তিনি তাঁহার সহপাঠী হাইকোর্টের উকিল ৺ঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত ঢাকা গমন করেন। তখন দীনবন্ধু মৌলিক স্কুলের হেঃ ইঃ ছিলেন। যাদব চন্দ্র গিয়া তাহাকে নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখেন। প্রথমে তাঁহার উত্তর না পাইয়া তাঁহার সাহায্য লইতে অনিচ্ছুক হন, পরে ঐ সকল কথা দীনবন্ধু জানিতে পারিয়া আগ্রহ করিয়া যাদবচন্দ্রকে নিজ বাটীতে অভ্যর্থনা করেন এবং যাদবচন্দ্র তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিশেষ প্রিয় ভাজন হন।

ঢাকা ১৮৫৫

ঢাকায় সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে ১৮৫৫ ইং সনে তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও ৮৲ হিসাবে জুনিয়ার স্কলারশিপ পান ১৮৫৯ সনে Teachership পরীক্ষায় পাশ করিয়া ১৮৬০ সনে তিনি সিনিয়ার স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন; ঐ সময় তাঁহাকে ঢাকা কলেজের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা রচনার জন্য কুচবিহারের মহারাজা প্রদত্ত স্বর্ণ পদক ও ইতিহাসে প্রথম হওয়ার জন্য Domelly medal দেওয়া হয়, তখন তিনি তাঁহার ভ্রাতা মাধবচন্দ্র, গোপালচন্দ্র ও কেশবচন্দ্রকে পড়াইতে আরম্ভ করেন।

বিবাহ

এই সময়ে ঢাকা জেলার ধামড়াই গ্রামের ৺মাধব নারায়ণ রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতি প্রেমদা সুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

প্রেমদা সুন্দরী এখনও জীবিতা আছেন এবং সুবৃহৎ পরিবারে অকাতরে কর্ত্তব্য করিয়া গৃহকর্ত্রীরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি সংসার পরিচালনের কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া সন্তানগণের শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন পর্য্যন্ত সকল কর্ত্তব্যই চির জীবন অতি দক্ষতার সহিত পালন করিয়া আসিতেছেন।

কলিকাতায় পাঠ্যাবস্থা।

তৎপরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বি, এ, ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া ১॥ বৎসর কাল পড়ার পর যাদব চন্দ্রের আর্থিক অবস্থার এমন শোচনীয় পরিবর্ত্তন হয় যে, শেষ পরীক্ষা অবধি অপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠে।

প্রথম চাকরী—নড়াইল।

সেই জন্য তিনি নড়াইলে নূতন স্থাপিত Small Causes কোর্টে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল দুর্গামোহন দাসের সহিত আসেন এবং হেড্ক্লার্ক ও যাদবচন্দ্র সেকেণ্ড ক্লার্কের পদ গ্রহণ করেন। তাহার ১ বৎসর পর দুর্গামোহন দাস হেড্ক্লার্কের পদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন এবং তখন যাদবচন্দ্র হেড্ক্লার্কের পদে উন্নীত হন ও বিশেষ দক্ষতার সহিত ৫ বৎসর কার্য্য করেন। এই সময় তিনি নড়াইলের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে কিরূপ প্রিয় হইয়া সকলের হৃদয় অধিকার করেন, তাহা বদলীর সময় তিনি স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর যে অভিনন্দন পাইয়াছিলেন তাহা পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। সর্ব্বদাই তাঁহার এতই পরোপকার স্পৃহা ও গভীর বিদ্যানুরাগ ছিল যে ঐরূপ স্বল্প আয় হইতেও তিনি দুরবস্থাপন্ন সন্তানদিগের পাঠের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, মডেল নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। নিজ চরিত্রের আদর্শে ও প্রাণপণ

চেষ্টায় অনেক বিপথগামীকে তিনি সৎপথে আনিয়াছিলেন এবং বিশেষ পরিশ্রমের ফলে তাহার সময় ছোট আদালতে উৎকোচ লওয়া তিনি বন্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে [illegible] সুবিখ্যাত Murow সাহেব তাহার কার্য্য পারদর্শিতা ও উচ্চ স্বভাবে এতই মুগ্ধ হন যে, যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তিনি তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত যাদবচন্দ্রকে পত্র লিখিতেন।

চুঁয়া—১৮৬৭—কালনা—১৮৬৮

তৎপরে তিনি ১৮৬৭ সনে Assessor ও পরে Munsif হন। তাহার কিছুদিন পরেই আইন পরীক্ষায় পাশ না হইলে ঐ পদে কেহ নিযুক্ত হইবে না এইরূপ নিয়ম হওয়ায় তিনি পূর্ব্ব পদে ফিরিয়া যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হন, যাদবচন্দ্র ইহাতে অসম্মত হইয়া ছুটি লইয়া যাইবার আবেদন করেন। ঠিক সেই সময়ে কোচবিহার হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট উপযুক্ত কর্ম্মচারী চাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মনোনীত করিয়া ৩০০৲ টাকা বেতনে সেখানকার ফৌজদারী আহেলকার (Magistrate) রূপে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দেন।

কোচবিহার (১৮৬৯)

কুচবিহারে তিনি ক্রমে সিভিল জজ, সেসন জজ ও Judicial member পদে উন্নীত হইয়া ১৮৯৮ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ২৯ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। ঐ স্থানে তিনি যে অসাধারণ দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করেন, তাহা কমিশনর ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরগণ সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর'' উপাধি দেন। যাদব চন্দ্রের সহিত একই সময়ে ৺কালিকা দাস দত্ত রায় বাহাদুর, C. I. E গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদ হইতে কোচবিহারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন।

মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের নাবালক বয়সে ইহাদেরই ২ জনের হস্তে কোচবিহারের শাসন সংস্কার সমদয় শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে গঠিত হয় এবং উক্ত করদরাজ্য একটি আদর্শ সুশাসিত রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ২৯ বৎসর পরে যখন পেন্‌সন্ লইয়া যাদবচন্দ্র কোচবিহার হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন মহারাজা বিলাতে ছিলেন। কিন্তু তিনি বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বেই যাদবচন্দ্রের সম্মানার্থ ভোজ দেন ও তাঁহার প্রতিকৃতি প্রবর্দ্ধিত আকারে স্থানীয় বিদ্যাগারে ও টাউন হলে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাদবচন্দ্র কোচবিহারে যে কিরূপ সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অল্প কথায় বলিয়া বুঝান কঠিন; তিনি ঐ স্থান হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে বহুদিন হইতে ক্রমান্বয়ে ২।৩ বেলা নিমন্ত্রণ, সান্ধ্যসভা, বিদায় সম্বর্দ্ধনা প্রভৃতি ধারাবাহিক রূপে চলিয়াছিল এবং তিনি ট্রেণে উঠিবার প্রাক্কালে শুধু যে ষ্টেসনে বিরাট জনতা হইয়াছিল তাহা নহে, অনেকেই তাঁহার বিদায়ের শোকে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। পরে তাহার মৃত্যু হইলে কোচবিহারে ১৯১১ সালের ১৭ই জুলাই একটা Extraordinary Gazatte বাহির হয় এবং তাহাতে তাহার কার্য্য কলাপের বিবরণ ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয়। তাহার সম্মানার্থ সেদিন কোচবিহার ষ্টেটের সব আফিস আদালত বিদ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ ছিল।

গৌরীপুর

কোচবিহারের কার্য্য কাল ক্রমাগত ৭ বার বাড়াইয়া দেওয়ায় যাদবচন্দ্র যখন পেন্সন লওয়াই ঠিক করেন, তখন ৺নৃপেন্দ্র নারায়ণের অনুরোধে তিনি আসাম গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়ের ম্যানেজারীর কার্য্য গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে ভগ্ন শরীরে তিনি এই কার্য্যে যেরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন, তাহাতে দুই বৎসর

পরেই তাঁহাকে অবসর লইতে হয়। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জমিদারী পরিচালনার সুব্যবস্থা করিয়া সম্পূর্ণ ঋণ শোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কুমার প্রভাতচন্দ্র "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ঐ দরবারে স্বনামধন্য Sir Henry Cotton সাহেব প্রকাশ্যভাবে যাদবচন্দ্রের কার্য্যের বিশেষ সুখ্যাতি করেন রাজা প্রভাতচন্দ্র তাঁহার এই অল্প সময়ের কার্য্যে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বেতনের অর্দ্ধেক পেন্সন্ আজীবন তাঁহাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সুদীর্ঘ কাল যশের সহিত চাকুরী করিয়া পরে পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া যাদবচন্দ্র কলিকাতায় নিজ বাটীতে বাস করেন; তাহার পর তিনি দেওঘরে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া সেইখানেই বাস করেন। তাঁহার জীবনকালে চক্রবর্ত্তী পরিবার সকল বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া পাবনা জেলার মধ্যে বিশিষ্টতা লাভ করে। পৃথিবীতে দক্ষতার সহিত চাকুরী, অর্থ উপার্জ্জন অনেকেই করেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরের উপকার ব্রত লইয়া সংসারের মঙ্গল কার্য্যকে আপনার কর্ত্তব্যের অঙ্গ করিয়া লওয়া খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। যাদবচন্দ্রের প্রাণ সর্ব্বদাই পরদুঃখে কাতর হইয়া উঠিত এবং আজীবন তিনি পরের সেবা করিতে ক্রটী করেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, মানুষের সাধনায় যদি যথার্থ নিষ্ঠা থাকে এবং আদর্শের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত যদি সে না হয়, তবে তাঁহার সাধনা জীবনে সফল না হইয়া পারে না। তিনি বাল্যকাল হইতে নিজের পরিবার ও গ্রামের উন্নতি, কলিকাতায় বাড়ী করা, গ্রামে বালিকা বিদ্যালয়, স্কুল, পুস্তকালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন এবং ইহার প্রত্যেকটী তিনি তাঁহার জীবিত কালেই দেখিয়া গিয়াছেন। ছাত্র জীবনে গ্রামে প্রথমেই মাইনর স্কুল স্থাপন করিয়া পরে পেন্সন প্রাপ্তির পর তিনি উহাকে এণ্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত করেন। চির জীবনই

সকলের প্রতি তাঁহার হৃদয় মুক্ত ছিল। কেহই তাঁহার নিকট হইতে যথার্থ দুঃখ কষ্টে সহানুভূতি না পাইয়া ফিরে নাই। তাঁহার এই সমবেদনা কেবল মৌখিক ভদ্রতার নামান্তর ছিল না, সমস্ত অন্তরের সহিত তিনি অন্যের জন্য অনুভব করিতেন এবং এজন্য যখন তিনি কাহাকেও কোন বিশেষ সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তখনও সে কৃতজ্ঞতা চিত্তে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে। সকলকেই তিনি নিজ আত্মীয় বলিয়া জানিতেন এবং সেই কারণে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। ভয়ের দ্বারা অন্যের উপর প্রভুত্ব করিয়া সেবা আদায় করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। অথচ তাঁহার চরিত্রের এমন একটা স্বাভাবিক দৃঢ়তা ও মাধুর্য্য ছিল যে, তাঁহার কথা মত চলিতে সকলেই ভালবাসিত। তিনি টাকা জিনিষটাকে জমাইয়া রাখিয়া কেবল নিজের স্বার্থের জন্য ব্যয় করিবার সামগ্রীরূপে দেখিতেন না। বরাবরই তিনি নিজ উপার্জ্জনের কিছু অংশ রাখিতেন। পরের উপকারে তিনি অর্থ ও সামর্থ্য দুইই অকাতরে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস উদার ও সার্ব্বজনীন ছিল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে বাহ্যিকভাবে দীক্ষিত না হইলেও সেই দিকেই তাঁহার চিত্তের আনুকূল্য ছিল। আজীবন তিনি নিজ গৃহে মাঘোৎসব প্রভৃতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানিক কৃত্রিমতা তাঁহার কাছে যেমন অসহ্য ছিল, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাও তিনি সেই রকমেই দূরে পরিহার করিতেন। তাছাড়া অন্যের বিশ্বাসে আপনা হইতে আঘাত করা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। সকল ধর্ম্মের প্রতিই তিনি মুক্ত মনোভাব পোষণ করিতেন। তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল রোগ ভোগের সময় তিনি অন্তিম মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুতও ছিলেন। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর সময় আত্মীয় স্বজন সকলকে কাছে দেখিয়া যেন যাইতে পারেন এবং

তাঁহার সে সাধ সম্যকভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। ১৯১১ সালের ১০ই জুলাই বুধবার তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রগণের প্রত্যেকেই কৃতী ও স্বনামধন্য। তৃতীয় পুত্র Major সতীশচন্দ্র I. M. S Civil Surgeon এর কার্য্য করিতেন। সম্প্রতি বিলাত যাত্রাকালে পথে তাঁহার মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এখন ভবুয়ার Sub divisional officer. মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গৌরীপুর রাজার দেওয়ান। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এখন বাঁচিতে Co-oporative Store এ ম্যানেজারের কার্য করিতেছেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহ।

১২৭০ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখে নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা

. . . .

যোগেন্দ্র নাথের পূর্ব্ব পুরুষগণ হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈঁচিগ্রামে বসবাস করিতেন। যোগেন্দ্রনাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ স্বর্গীয় নাথ্ চরণ মহাশয় মুরশিদাবাদে স্বাধীন নবাব সরকারের ওকালতি করিতেন। তখন খয়েরহুদা একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে অনেক দেশ হইতে লোক সমাগম ছিল। নাথ্‌চরণ কোনও কার্য্যোপলক্ষে উক্ত গ্রামে আগমন করেন এবং উক্ত গ্রামস্থ সেন বংশীয়া এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। শেষ বয়সে নবাব সরকারের অধীনস্থ নাটোরাধিপতির নিকট উক্ত খয়েরহুদার নিষ্কর সম্পত্তি পাইয়া বৈঁচি গ্রামের পৈত্রিক বাসস্থান ও তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতাগণকে দিয়া

উক্ত খয়েরহুদা গ্রামে বাস করেন। তিনি এক নাবালক পুত্র নিতাই চরণকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। নিতাই চরণের তিন পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র, প্রেমচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। কনিষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দ্বারকানাথের সাত পুত্র—যোগেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীশচন্দ্র, চারুচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র।

যোগেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ খুব তেজস্বী, উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। তখন বাঙ্গালা দেশে নীলকুঠি সাহেবদিগের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাহাদিগের অত্যাচার ইতিহাস প্রসিদ্ধ। খয়েরহুদার সন্নিকটে শিয়ালমারি নামক স্থানে সাহেবদের একটা কুঠি ছিল। দ্বারকানাথ সামান্য জমিদার হইয়াও প্রবল প্রতাপশালী নীলকুঠি সাহেবদের বিরুদ্ধে নিজের ন্যায্য দাবী রক্ষা করিবার জন্য ও নিজের প্রজাদিগকে তাহাদিগের অত্যাচার হইতে বাচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহাকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। যোগেন্দ্রনাথ পিতার এই তেজস্বিতা ও কর্ম্মদক্ষতা সম্পূর্ণরূপেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ কিছুকাল দৌলতগঞ্জ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বাস্থ্য ভগ্নহেতু কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া হুগলি কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখানে এক বৎসর থাকিয়া অসুবিধা হওয়ায় কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজে কিছুদিন থাকিয়া এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভূতপূর্ব্ব জেনারল এসেম্ব্লি কলেজ হইতে সম্মানের সহিত (With honours) বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে অন্যান্য সরিকদের সহিত নানা রকম সাংসারিক বিবাদে আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয় এবং অদৃষ্ট চক্রে দ্বারকানাথ সপরিবারে খয়েরহুদা গ্রাম কিছুকালের জন্য ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে আসিয়া

বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সমস্ত পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র অবলম্বন যোগেন্দ্রনাথ।

তিনি সকালে এবং বৈকালে কলিকাতায় ছাত্র পড়াইয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই কোন রকমে পরিবারস্থ সকলের দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান হইত। এই আর্থিক দুরবস্থার মধ্য হইতেও যোগেন্দ্র নাথ বি এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইহার পর কিছুদিন কৃষ্ণনগরে ওকালতি করিয়া চুয়াডাঙ্গায় স্থায়ীভাবে ওকালতি আরম্ভ করেন।

ইনি ১৮৮৯ সালে ষড়দশায় অবৈতনিক বিচারকের পদে (Honarary Magistrare) নিযুক্ত হইয়া প্রথম বিভাগের বিচারকের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যশের সহিত কাজ করিতেছেন। ২৭ বৎসর কাল চুয়াডাঙ্গার লোকালবোর্ডের সহকারী সভাপতির ও সভাপতির এবং নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বরের কাজ করিয়া চুয়াডাঙ্গা মহকুমার রাস্তা-ঘাট সংস্কার ও প্রস্তুত, কূপ খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন করাইয়া সাধারণের অশেষ উপকার করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয় ও উচ্চ ইংরাজি স্কুলের সম্পাদক পদ অধিকার করিয়া তাহাদের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি নদীয়া জেলার নদী সংস্কারের একজন প্রধান উদ্যোগী। ১৮৯৭—৯৮ এবং ১৯০৭।৮ সালে দুর্ভিক্ষ সময়ে গভর্মেণ্টের নিকট হইতে ও সাধারণের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুঃখিগণের সাহায্য করিয়াছিলেন এবং গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া তাহাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় People Bank ও Supply and Sale Society র ডিরেক্টার। তিনি এই মহকুমার প্রায় সমস্ত সাধারণ কার্য্যেই লিপ্ত আছেন।

যোগেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি

দেখিতেন। তিনি সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তৃতীয় ভ্রাতা সুরেন্দ্র নাথ কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাস করিয়া বামড়া করদরাজ সরকারে প্রধান চিকিৎসকের (Chief Medical officer) পদে কাজ করা অবস্থায় অকালে পরলোক গমন করেন। ষষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র মেহেরপুর মহকুমায় ওকালতি করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন

যোগেন্দ্রনাথ প্রথমে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পাংশার সন্নিকট দুর্গাপুর নিবাসী রামকমল দত্ত মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। [illegible] সালে নিঃসন্তানে সে পত্নী বিয়োগ হয়। তৎপরে উক্ত রামকমল দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা রাজবাড়ীর প্রসিদ্ধ উকিল কেদারেশ্বর দত্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন।

তাঁহার গর্ভে চারিপুত্র ও চারি কন্যা হয়। একপুত্র ও এক কন্যা শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। প্রথম পুত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস, সি, ও এম, এস, সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৭৫ টাকা বৃত্তি পান। সম্প্রতি তিনি হাওড়া আদালতে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র আই, এস, সি পড়িতেছে। কনিষ্ঠ পুত্র ঢাকা [illegible] স্কুলে পড়িতেছে।

যোগেন্দ্রনাথ [illegible] সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেকে উপলক্ষে প্রশংসাপত্র (Certificate of Honour) [illegible] সালে 'রায় সাহেব' উপাধি ও বর্তমান বর্ষে 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছেন।

মাটিয়ারীর জমিদার বংশ

মাটিয়ারীর জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৺বলরাম বন্দোপাধ্যায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার অধীন দেবগ্রামের বিখ্যাত বন্দোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং দেবগ্রামের বন্দোপাধ্যায় বংশের সহিত মাটিয়ারীর জমিদার বংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বলরাম বাবুরা পাঁচ ভ্রাতা ছিলেন, তন্মধ্যে বলরাম বাবুই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। কোন কারণে বলরাম বাবু দেবগ্রাম হইতে চলিয়া আসিয়া মাটিয়ারীতে বাস করিতে থাকেন এবং পৈতৃক সম্পত্তির সহিত সকল রকম সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিছুদিন পরে একদিন একটা ঘটনাতে বলরাম বাবুর ভবিষ্যত জীবনে আশাতীত উন্নতির কারণ ঘটিয়াছিল। মাটিয়ারি গ্রামের দক্ষিণে ৺গঙ্গানদী প্রবাহিত। একদিন বলরাম বাবু গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে রংপুর জেলার কালেক্টর সাহেব বাহাদুর কলিকাতা হইতে বজরা করিয়া মাটিয়ারি ঘাট হইয়া রংপুর যাইতেছিলেন। বলরাম বাবু দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সুন্দর চেহারায় আকৃষ্ট হওয়ার জন্যই হউক কিংবা তাঁহার প্রতি ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হওয়ার জন্যই হউক তাঁহাকে দেখিয়া কালেক্টর সাহেব বাহাদুর তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং মাটিয়ারির ঘাটে তাঁহার বজরা বাঁধিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। বলরাম বাবু যে কেবল সুন্দর পুরুষ ছিলেন তাহাই নহে, তিনি বুদ্ধিমান, ভাগ্যবান এবং তৎকালীন পার্শী ইত্যাদি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কালেক্টার সাহেব বাহাদুর তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আরও মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং বলরাম বাবুকে তাঁহার সহিত রংপুর যাইতে এবং তাঁহার অধীন কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। বলরাম

বাবু সাহেবের অনুরোধ মত তদ্দণ্ডেই তাঁহার সহিত রংপুর যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়া চাকরী গ্রহণ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই নিজ বুদ্ধি এবং উত্তম গুণে তিনি রাশি রাশি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। বাঙ্গালা ১২০০ সালে কৃষ্ণনগর রাজবংশের কতকগুলি সম্পত্তি নিলাম হয়। বলরাম বাবু অত্যন্ত বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, তিনি সেই সময়ে মাটীয়ারিদিগের এবং পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী কালেক্টারী সম্পত্তি নিলামে খরিদ করেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি নিজের অবস্থার উন্নতি করিয়া তদঞ্চলের একজন প্রথম শ্রেণীর ধনাঢ্য বলিয়া গণ্য হন। তাঁহার নিজের আর্থিক অবস্থার জন্য এবং তিনি নানা সদগুণ বিভূষিত ছিলেন বলিয়া দেশে তিনি যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষ গুণের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বলরাম বাবু তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে ও তাঁহার নিজ বুদ্ধিবলে তিনি নিজ অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া পুনরায় তাঁহার অপর ভ্রাতাদের যথেষ্ট রকমের অর্থাদি দিয়া তাঁহাদের অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি করিয়া দিয়াছিলেন। বলরাম বাবু কেবল যে বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তাহা নহে, তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি বাটীতে রাধামাধব মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া জনসমাজে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে।

কথিত আছে, বলরাম বাবুর মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি স্বপ্নে ৺রামচন্দ্র ঠাকুর দর্শন করেন এবং তাঁহার বংশে তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি সে কার্য্য নিজ হস্তে করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বপ্নপূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার

বংশের গৌরব স্বরূপ তাঁহার একমাত্র পুত্র রামমোহন বাবুর উপর অর্পণ করিয়া অল্পদিন মধ্যেই স্বর্গারোহণ করেন।

বলরাম বাবুর পুত্র ৺রামমোহন বাবু স্বীয় অসাধারণ সাধুতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা গুণে তাঁহাদের কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি অশেষ গুণ সমন্বিত ছিলেন এবং বিবিধ সদ্‌গুণ বিভূষিত হইয়া স্বকীয় উচ্চ লক্ষ্য সাধারণ জন সমাজে প্রচার করতঃ অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। স্বদেশে তাঁহার নিজ চরিত্র গুণে তিনি সমাজের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং সাধারণে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া এবং পরের কষ্টকে নিজের কষ্ট জ্ঞান করিয়া তাহা বিমোচনের জন্য রামমোহন বাবু সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। অভাবী লোক তাঁহার নিকট হইতে কখন বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। তিনি অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যহ তাহাতে বহুলোক অন্ন পাইত। ঐ কার্য্যে তিনি কর্ম্মচারীদিগের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন এবং আগন্তুকদিগের কোন অভাব অভিযোগ থাকিলে নিজেই তাহা মোচন করিতেন। পিতার শেষ আদেশ তিনি বিস্মৃত হন নাই। পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও মহাবীর আদি বিগ্রহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের অবধিকাল পর্য্যন্ত আপনার নাম অবিচ্ছিন্ন রাখিবার উপায় করিয়াছেন এবং উক্ত বিগ্রহাদির পূজা ভোগের সুনিয়ম নিজবংশে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বিগ্রহগুলি অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত এবং এই ধাতুময় মূর্ত্তিগুলি কোনটিও দশ মণের নীচে নহে। লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তি ত্রয়োদশ মণ ভার বিশিষ্ট। শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাম মোহন বাবু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ রামচন্দ্রের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন এবং একপও অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, আহারের সময় তাঁহার যে জিনিষ খাইতে ভাল লাগিত, তাহা তাঁহার

উচ্ছিষ্ট হইলেও তাঁহার দেবতা রঘুনাথকে তাহাই নিজ হস্তে খাওয়াই-তেন। এই ভাব কেবলমাত্র সিদ্ধ পুরুষে ভিন্ন অন্যে সম্ভবে না; এই জন্য লোকে তাঁহাকে সেইরূপ জ্ঞানে ভক্তি করিত। আরও শুনিতে পাওয়া যায় যে, যখন তিনি ঠাকুরের পূজা করিতে বসিতেন, তৎকালীন তাঁহার বাহ্য জ্ঞানের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইত না। তিনি কখন হাসিতেন কখন কাঁদিতেন। রামমোহন বাবু একদিকে যেমন ধর্ম্মভাবাপন্ন ছিলেন অন্যদিকে তিনি তেমনই বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন এবং নিজেও কয়েকটী নীলকুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা হইতেও তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রামমোহন বাবু বিদ্বান লোক ছিলেন, তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ রামায়ণ প্রত্যহ ঠাকুর বাটীতে পাঠ হইত যে দিন রামমোহন বাবুর মৃত্যু হয়, সেইদিন তাঁহার দেবতা রঘুনাথজীর সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়াছিল। তাহা দর্শন করিয়া স্থানীয় লোক চমৎকৃত হইয়াছেন এবং সকলেরই ধারণা যে ভগবান প্রিয় ভক্তের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই অবস্থা যাঁহারা চাক্ষুষ দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটেই ইহা জানা গিয়াছে।

বঙ্গবীর ৺ রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২২৬ সালের বৈশাখ মাসের পঞ্চদশ দিবসে রাত্রে রামদাস ভূমিষ্ঠ হন, রামমোহন বাবুই তৎকালে গণ্যমান্য জমিদার সুতরাং তদ্বংশে একমাত্র পুত্র রামদাসের জন্ম অতি উপভুক্তই হইয়াছিল।

সেই রামদাসের জন্মবার্ত্তা পিতার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি অমনি গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া সর্ব্বপ্রথমে নিঃশব্দে রামসীতা-ঠাকুরবাটী গমন করিলেন এবং সেই অসময়ে বিগ্রহের দ্বার উন্মোচন করাইয়া এক দৃষ্টে অভীষ্টদেব সন্দর্শন করতঃ হাস্য মুখে পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, পারি-

পার্শ্বিকগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর করেন যে "যাহার প্রসাদে আমার সমস্তই, অগ্রে তাঁহার প্রসন্ন মুখ দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা উচিত"। অনন্তর রামদাসের জন্মবার্ত্তা গ্রামময় প্রচারিত হইয়া প্রজা সাধারণ মধ্যে কোলাহল উঠিল। শুনিতে পাই এতদুপলক্ষে ঘাটে পথে কয়েকদিন মিষ্টান্নাদির ছড়াছড়ি হয় এবং দূর-স্থানাগত নানা বাদ্য ভাণ্ডেরও অবধি ছিল না।

রামদাসের জন্মের পর তৎপরিবারের কয়েক খণ্ড জমিদারি ক্রয় ও অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল. তাহাতে রামদাসের আরও সমাদর হইল, রামদাস অতি শিশুকাল হইতেই ভাবি ক্ষমতার পরিচয় দিল, ক্রমে শিশুকাল অতিক্রম করিয়া বাল্যকালে উপনীত, অনন্তর দশ কর্ম্মানুসারে উপনয়নাদি সংস্কার মহাধুমে প্রদত্ত হইল। অন্নপ্রাসনের ঘটা দিগ্বিদিগ প্রচার হইয়াছিল এবং কুলদেবতার দাসস্বরূপ বিনীত নাম "রামদাস" পিতা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইল।

বাল্যকালে রামদাস ভোজন লোলুপ ছিলেন না, কিন্তু সেই সময় হইতেই স্বভাবতঃ মল্লপ্রিয় ছিলেন; তাহার অধিকাংশ বাল্যক্রীড়া পশ্চিম প্রদেশীয় বালকদিগের ন্যায় আচরিত হইত। তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও সুন্দর পুরুষ ছিলেন, সর্ব্বকলেবর সম্পূর্ণ বলব্যঞ্জক, অথচ রুক্ষতা বর্জ্জিত, অতি শৈশব কাল হইতেই সেই এক সহাস্যভাব, সারল্যের প্রতিরূপ স্বরূপ, যেন এরূপ আধারে তাদৃশ সরলতাই এক অসাধারণ গুণ, তাহাতে আবার অন্য সদ্গুণের অভাব ছিল না।

রামদাস ক্রমে বাল্যকাল অতিক্রম করিতে করিতেই ব্যায়াম শিক্ষায় অনুরক্ত হইলেন, বঙ্গদেশের বড়লোকের ছেলের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন নানাবিধ দুগ্ধ পানাদি ও বিবিধ মিষ্টান্নমাত্র ভোগী ছিলেন না। প্রত্যুত তদীয় পিতার নিয়োগানুসারে তিনি প্রাত্যহিক পান ভোজনের ন্যায় অগ্রে ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন, পল্লীর ধনী সন্তানগণ অনেকেই

পিতামাতার অনৈতিক প্রশ্রয়ে অভিমত্ত হইয়া অন্দর বাহিরে আবদার করিতে প্রবৃত্ত হয়, অগ্রে আত্ম দাসদাসী প্রভৃতি আশ্রিত জনকে কথায় কথায় প্রহার, যথেচ্ছা কটুবাক্য প্রয়োগ তৎকাল হইতেই অভ্যস্ত হইতে থাকে, এমন কি জীবনান্তেও সে স্বভাব ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু আনন্দের বিষয় এই আমাদের কথিত রামদাস পল্লীবাসী ধনী পিতামাতার একমাত্র আদরের সন্তান হইয়াও সেরূপ কুশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই. তিনি এ সময়ে অধিকাংশ কাল দ্বারবান আদি পশ্চিম দেশীয় বলবান দিগের সংশ্রবে থাকিতেন না, তাহাদের দৈনিক কুস্তী দৃষ্টে প্রথম প্রথম আমোদার্থে নিজে কুস্তী শিখিতেন, এক একদিন মল্লদিগের কোন একপক্ষ আশ্রয় করিতেন, ইহাতে তাঁহার কত আনন্দ! বুদ্ধিমান রামমোহন বাব এই অবস্থা বিদিত হইয়া দুইজন বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী পালোয়ানকে শুদ্ধ পুত্রের ব্যায়াম শিক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন।

ক্রমে এই ভাবে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া রামদাস কিশোর বয়সে পদার্পণ করিলেন এবং সেই সময় হইতেই তাহার অসাধারণ বলশালীত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। এই সময়ে সমবয়স্ক মণ্ডলীতে তিনি অধিনেতা হইয়া বাল্যক্রীড়া সম্পাদন করিতেন। দিন দিন তাঁহার অবয়বে বীর ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু ধনবান পুত্র বলিয়া তাহার বাহুবলের কার্য্য বা পরীক্ষা প্রকাশ হইত না।

দিন দিন রামদাস কিশোর বয়স অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন, ক্রমে মানসিক বৃত্তি সকল শনৈঃ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তিনি যেরূপ বাহুবল সম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে অর্থাভাব ছিল না, এরূপ অবস্থায় ধনি সন্তানগণ অনিবার্য্য ইন্দ্রিয় দাস হইয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন কলঙ্কিত করিয়া থাকে, হয়ত অকিঞ্চিৎকর রিপু চরিতার্থ কামনায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া বীভৎস পীড়া সকলে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। আজীবন শুদ্ধ নিজেই যে পীড়ার কষ্ট ভোগ করেন তাহা নহে। প্রথমে পত্নী

অনন্তর পুত্রদিগকেও অনন্তকালের নিমিত্ত কুৎসিৎ রোগ প্রদান করেন। এমন কি পুরুষপরম্পরা ক্রমে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না, হিতৈষী মাত্রেই এই শোচনীয় ঘটনা চিন্তা করিয়া আমাদের জাতীয় হতাশেরই ভাব কল্পনা করিবেন, সমাজ হিতেচ্ছু এই ভয়াবহ উচ্ছেদক-ভাব অপনোদনের অগ্রে যত্ন করিবেন।

এই সময়ে রামদাস বাবু বয়স্যদিগের সহিত কৌতুক করিতে করিতে বহির্ব্বাটীস্থ একটী জলপূর্ণ পিত্তল নির্ম্মিত জালা দুই হস্তে তুলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া রহিলেন। আমরা জানি ঐ পিত্তল জল পাত্র আট মণ ভারী। এই হইতেই তাহার অসাধারণ বাহুবলের প্রকৃষ্ট পরিচয় সাধরেণ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল।

এক সময়ে ভাগীরথীর দুর্দ্দমনীয় কুলভঙ্গের প্রভাবে যৎকালে রাম সীতার বৃহৎ অট্টালিকার কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হইল, তখন রামমোহন বাবু প্রভৃত ভার সম্পন্ন বিগ্রহগুলি পাছে শূদ্র স্পৃষ্ট হয় এই ভাবনায় একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শুনিতে পাই রামদাস বাবু তৎশ্রবণে অতি অল্পকাল মধ্যে সমস্ত দেবমূর্ত্তি উর্দ্ধ হইতে নিম্নে, পরে বহুদূরে প্রতিস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই ধাতুময় মূর্ত্তিগুলি কেনটাই দশমনের নীচে নহে. লক্ষ্মণের প্রতিরূপ ত্রয়োদশ মন ভার বিশিষ্ট। একদিন রামদাস বাবু বন্ধুবান্ধব মিলিত হইয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন. সমবয়স্ক মণ্ডলীতে সন্তরণাদি জল ক্রীড়া চলিতেছে, সেই সময় একখানি পাইল বিশিষ্ট উজান নৌকা কাটোয়াভিমুখে যাইতেছিল, তাহা মাটীয়ারীর ঘাট দিয়া যাওয়ায় সন্তরণের ব্যাঘাত আশঙ্কায় বন্ধুবর্গের ইঙ্গিতে রামদাস বাবু একাকী সেই বৃহৎ নৌকার তাদৃশ প্রবল গতি অনেকক্ষণ প্রতিরোধ করিয়া রহিলেন; কি আশ্চর্য্য বাহুবল!

এক সময়ে রামদাস বাবু কাটোয়া সমীপস্থ বনওয়ারী আবাদ (সোনারুন্দী) রায় দীনেশ মন্দের রাজ বাড়ীতে গমন করেন, কতিপয় সম্মানিত

ব্যক্তির উপরোধে কৌতুক দর্শাইবার মানসে রাজবাটীর প্রকাণ্ড হস্তী আনীত হইল। সেই হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া রামদাস বাবু প্রথমে এরূপ বলে নিষ্পেষণ করেন যে, দণ্ডীরাজ মর্ম্ম পীড়ায় অধীর হইয়া ভীতি চিৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই রামদাস বাবুর হস্ত শুণ্ডস্খলিত হইল না। যখন তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক শুণ্ডত্যাগ করিলেন, তখন করিবর দুই তিন ঘটিকা কাল সমস্ত গ্রাম বৃংহিত নাদে পরিপূর্ণ করিয়াছিল! কি অলৌকিক বলবত্তা!!

অনন্তর বাহিরে এই হস্তী যুদ্ধ হওয়ায় অন্তঃপুর রাণীগণ রামদাস বাবুকে একবার দেখিতে চাহিলেন। তাহাতে অন্দরের উপর ঘরে রাত্রি আহারের বন্দোবস্ত হয়, যথাসময়ে রামদাস বাবু আহারে বসিয়াছেন, রাণীরা অন্তরাল হইতে বীরপুরুষ অবলোকনে কানাকানি করিতে লাগিলেন। কেহ স্ত্রীস্বভাবসুলভ অনুচ্চে বলিলেন "হাতীর সহিত লড়াই করিলে কি হয়? কৈ দালান কোঠা ভাঙ্গুন দেখি? তবে ত আমরা বুঝি?" ইহা রামদাস বাবুর কর্ণে পৌঁছিল। আহারান্তে নীচে নামিবার সময় সিঁড়ির খিলানের উপর একটী পদের বলদর্পিত ভর দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভগ্ন করিয়া যান। এই **খিলান** অকস্মাৎ ভঙ্গ শব্দে সকলেই ভীত হইয়া স্তম্ভিত প্রায় হইলেন! *

এস্থলে বলা প্রয়োজন যে রামদাস বাবুর শরীর ধারা অবয়বের সৌসাদৃশ

* দুই একবার শীকারের সময় এরূপও ঘটিয়াছিল যে গুলি খাইয়া ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করায় তিনি পুনরায় গুলি করিবার সময় না পাইয়া এক হস্তে ব্যাঘ্রের গ্রীবা ধারণ করিয়া অপর হস্তে তাঁহার বন্দুকের আঘাতে ব্যাঘ্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। এরূপ অসীম সাহস ও বীর্য্য সাধারণ মানুষে সম্ভবে না। একবার তিনি একটী প্রকাণ্ড বাঘ শীকার করিয়া তৎকালীন কৃষ্ণনগরের Magistrate Stephen সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহার জন্য Magistrate সাহেব তাঁহাকে একখানি ভাল প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন।

স্থূলতার জন্য তিনি কখনও পাল্কীতে চড়িতে পারেন নাই। পাল্কীর ক্ষুদ্র দ্বারে তদ্দেহ প্রবিষ্ট হইত না, তজ্জন্য প্রায় তিনি জল পথে যাতায়াত করিতেন। স্থল পথে তদ্দেহ বহনশীল অশ্বাভাবে অশ্বারোহণের ন্যায় গজারোহণে ভ্রমণ করিতেন।

এইরূপে রামদাস বাবু পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইলে প্রদেশ মধ্যে "বীরাবতার" বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, বঙ্গের কুলবধূগণ পর্য্যন্ত তাঁহার বীরত্বের কাহিনী কহিতে লাগিলেন, বালকেরাও মৃন্ময় মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহার নাম "রামদাস বাবু" রাখিল। কি গৌরবময় জীবন !!

এই সময়ে বীরাবতার রামদাস বাবুর পরিণয় কার্য্য বীরাচারে সম্পন্ন হইয়াছিল। নদীয়া জেলার অগ্রদ্বীপ গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। আহ্লাদের বিষয় অদ্যাপিও সেই বীর পত্নী জীবিতা রহিয়াছেন। মাটীয়ারী অগ্রদ্বীপ দুই ক্রোশ ব্যবধান, ইহার মধ্যে কুত্রাপিও জন-স্রোতের বিচ্ছেদ হয় নাই, অবিরত বিবাহ সমারোহ; বহুসংখ্যক বাহক-পৃষ্ঠে রজত সুখাসনোপরি সজ্জীভূত রামদাসকে সমাসীন দৃষ্টে দর্শক মাত্রেরই মনে অতুল আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। শুনা গিয়াছে, বিবাহান্তে বাসর গৃহে অসংখ্য কুলমহিলা সমীপে তিনি সময়োচিত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে রামদাস বাবুর খ্যাতির সীমা ছিল না।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরে রাম রাম ভূমিষ্ট হন, মধ্যে আরও কয়েকটী পুত্র কন্যা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহারা অকালেই কাল কবলে নিপতিত হয়, অবশেষে অনেক দৈব অনুষ্ঠানের পর কনিষ্ঠ পুত্র রাম কমল ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, এই কারণেই রাম কমলের অপর নাম "তিনুবাবু"। পত্নী সম্বন্ধেও বিবিধ বীরত্ব প্রকাশিত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, সে সমস্ত বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইল। ফলতঃ রামদাস বাবু

সম্বন্ধে সকল জনবাদ আছে, তাহা সমস্তই প্রায় সত্যমূলক, কেননা অতি অল্পদিন মাত্র হইল তিনি এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে একজন পাঞ্জাবি পালোয়ান রামদাস বাবুর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত হয়। একদা পাঞ্জাবীর বাহুবল পরীক্ষার্থ তিনি হস্ত নিপীড়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বলবানের হস্তের অস্থি একেবারে ভগ্ন হইয়া যায় এবং তদবধিই তাহার বাঙ্গালার ভাত সিকায় উঠিয়াছিল।

আমরা শুনিয়াছি বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় রামদাস বাবু বিলক্ষণ সুনিপুণ ছিলেন। একদা সেওড়াফুলির জমিদার (নায়ারণ পূবরাজ) যোগেন্দ্র চন্দ্র রায় ও তাঁহার একজন শীকারী মুসলমান ভৃত্য সহ তিন জনে শীকারে বহির্গত হন, তাহাতে আমাদের রামদাস বাবুই তদুভয়কে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিয়াছিলেন।

একবার বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা প্রতাপ চন্দ্র বাহাদুরের সহিত সাক্ষাতার্থ রামদাস বাবু গমন করেন। অন্যান্য কথোপকথন চলিতেছে বর্দ্ধমানরাজ রামদাস বাবুর লোক বিশ্রুত বাহুবলের পরীক্ষার্থ নিকটস্থ শীষক নির্ম্মিত কুক্কুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন যে, এই কুক্কুরটী অত্যন্ত ভারী, ইহা আমার বয়স্য কীর্ত্তি বাবু ব্যতীত কেহই তুলিতে পারেন নাই। রামদাস বাবু মহারাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া আসনোপরি উপবিষ্টাবস্থায় অবলীলাক্রমে বাম হস্তে সেই শীষক কুক্কুর উত্তোলন করিয়া ধরিয়া রহিলেন। রাজা অপ্রতিভ হইয়া হাস্য করিতে করিতে শীষক কুক্কুর নামাইতে বলিলেন। শুনিতে পাই সেই কুক্কুরটী সাত মণ শীষক নির্ম্মিত।

আর একদিন বর্ষাকালে গঙ্গায় গিয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় বৃষ্টি আসিলে ভৃত্য-হস্তস্থ বস্ত্রাদি ভিজিবার উপক্রম হওয়ায় নিকটস্থ একখানি জেলেডিঙ্গী তুলিয়া ভৃত্য সহ ছত্রতলে বাসের ন্যায় বৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত থাকিলেন। উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রই তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিল।

রামদাস বাবু মধ্যে মধ্যে ভ্রমণার্থ কলিকাতা আসিতেন। মৃতা মতুবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লাটুবাবু তাঁহার অকৃত্রিম মিত্র ছিলেন; তিনি কলিকাতায় প্রায় তাঁহারই বাড়ীতে থাকিতেন, একদা বল বিষয়ক কথোপকথন ও তৎসূত্রে আমোদ করিতে করিতে লাটুবাবুর খর চালিত ঘড়িগাড়ির বেগ দুই হস্তে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে কলিকাতা অঞ্চলে তাঁহার অসাধারণ বলবত্তা প্রচারিত হয়। একদিন লাটুবাবুর ঘড়ি গাড়ীতে উভয়ে উইলিয়ম দুর্গে প্রবেশ করেন, বলবানের সর্ব্বত্র জয় জয়!! রামদাসবাবুর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কয়েকজন গোরা তাঁহাদের গাড়ীর সমীপস্থ হইল, একজন গুপ্ত সৈনিক কাল মূর্ত্তিতে বীরভাব দেখিয়া বল পরীক্ষার্থ হস্ত প্রসারণ করিল, রামদাস বাবুও গাড়ীতে বসিয়া হাত দিলেন, বিদেশী অগ্রেই বল প্রয়োগ করায় তিনি এরূপ স্ববলে কর নিপীড়ন করেন যে গোরাঙ্গ ঘন ঘন পরিত্রাহি ডাকিয়াছিল। অনন্তর লাটুবাবুর গাড়ি দ্রুত চালিত হইয়া আসিল। শুনিতে পাই কতিপয় সৈনিক তৎপ্রতিশোধার্থ গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ লাটুবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়।

আর এক সময়ে বড়দিন পর্ব্বে রামদাস বাবু ও কয়েকজন বন্ধু বান্ধব পৃথক পৃথক গাড়িতে গড়ের মাঠে যান, বড়দিনের আমোদে সকলেই লিপ্ত ছিল, একস্থানে তাহাদের কৌতুক দর্শন নিমিত্ত রামদাস বাবু সবান্ধবে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন, এদিকে তাঁহার অসাধারণ বীরাবয়ব দৃষ্টে একে একে দুর্গবাসীমাত্রেই তৎসমীপে উপস্থিত হইল, দুর্গস্থ সমস্ত সৈনিক রামদাস বাবুকে ঘিরিয়া দাড়াইল। তাঁহারা বড় দিনের আমোদ করিবে কি? এই এক অভিনব আমোদে যোগ দিল। ক্রমে ক্রমে প্রধান প্রধান সৈনিক ও সেনাপতিগণ আসিয়া হিন্দীতে রামদাস বাবুকে প্রীতি সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ কৌতূহল প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শাদিতে বল পরীক্ষায় নিযুক্ত হইল,

সকলের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া রামদাস বাবু দক্ষিণ হস্তের একটী অঙ্গুলী বক্র করিলেন, কিন্তু তজ্জন্য সকলের বল প্রয়োগ বৃথা হইল কেহই বক্র তর্জ্জনী সোজা করিতে পারিল না। এই সকল গতিক দৃষ্টে এক জন সেনাপতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামদাস বাবুকে সমর সম্বন্ধীয় কোন উচ্চ কর্ম্ম দিবার প্রস্তাব করিলেন, পরিশেষে তাহার অবস্থা শ্রবণে আহ্লাদিত চিত্তে তদনুরোধে নিবৃত্ত হন, পরন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে রামদাস বাবুর সম্মানের ইয়ত্তা ছিল না। এমন কি বহির্গমন কালে অনেকে কেল্লার বাহির ফটক পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎগমন করিয়াছিল।

কোন সমারোহ ক্ষেত্রে রামদাস বাবু লোকারণ্য মধ্যে থাকিলেও বন মধ্যে দেবতরু বা ঐরাবত বৃক্ষের ন্যায় সকলের নেত্র গোচর হইতেন। এক সময়ে আড়াআড়ি সূত্রে দাইহাটবাসীদিগের সহিত মাটিয়ারি গ্রামের বারোয়ারী পূজার দলাদলি হয়; তাহাতে উভয়পক্ষ পরস্পর বিদ্রূপাত্মক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শ্লেষ করিত। একবার মাটীয়ারীর পূজার নহবত প্রস্তুত জন্য চারিটী অত্যুচ্চ আস্ত তাল গাছ আনীত হয়। মঞ্চ নির্ম্মাতাদিগের অসাবধানতায় একটী তাল গাছ একহস্ত অধিক প্রোথিত হওয়ায় উপরের সমানতা সাধিত হয় নাই. অনেক লোক সেই তালগাছলইয়া টানাটানি করিল, কিছুতেই সুবিধা করিতে পারিল না। রামদাস বাবু দূর হইতে মজুরদিগের সেই দুর্দ্দশাবলোকনে দয়াদ্রচিত্তে তৎক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, রামদাসবাবু একেবারে অভিমান শূন্য হইয়া প্রজাদিগের অসাধ্য কার্য্যের সহায়তা করিতে চাহিলেন। তাহার নির্দ্দেশে শ্রমজীবিগণ অন্তর হইল, অনন্তর আজ্ঞাক্রমে তদীয় বক্ষঃস্থলে কয়েকখণ্ড বৃহৎ বস্ত্র জড়িত হইলে তিনি অবলীলাক্রমে সেই বহুজন অসাধ্য তাল বৃক্ষকে অনেকক্ষণ তুলিয়া রাখিলেন। এদিকে

অন্যান্য লোকে গর্ত্তে মৃত্তিকা দিয়া নহবত মঞ্চ সমান করিয়া দিল।

আর একদিন স্নান কালে নদীগর্ভ প্রোথিত একখানি বৃহৎ নৌকা বহুসংখ্যক লোক উপকূলে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহারা নানা উপায়ে অভিষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিতেছিল না দেখিয়া রামদাস বাবু অৰ্দ্ধস্নান রাখিয়া সেই নৌকার নিকটে গেলেন এবং উপস্থিত সকলকে একদিক ধরিতে বলিয়া নিজে প্রোথিত দিকে ধরিয়া ক্ষণমধ্যে তাহা তুলিয়াছিলেন।

অনেকে এই সকল অলৌকিক বলবত্তার কাযা পাঠ করিয়া ভাবিতে পারেন যে, বুঝি রামদাস বাবু শুদ্ধ আসুরিক বাহুবলেই বলীয়ান ছিলেন, তাঁহার দৈহিক বৃহদাকৃতির সহিত বুদ্ধিবৃত্তিও তাদৃশ স্থূল ছিল, কিন্তু তাহা নহে। প্রত্যুতঃ রামদাসের সমসাময়িক ও বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকেই জীবিত, তাঁহাদের মুখে শুনিতেছি যে রামদাস বাবু একজন প্রতিভাশালী বাকপটু ধনী সন্তান, তিনি স্বতঃ প্রশান্তচিত্ত ও বিনীত এবং সচ্চরিত্র ছিলেন, তাঁহার গুণের ইয়ত্তা ছিল না।

এই সকলের সহিত তাঁহার বিষয় বুদ্ধিও নিতান্ত হীন ছিল না। মাটিয়ারী প্রভৃতি তাহাদের নিজ জমিদারী। এক সময়ে গঙ্গাতীরোপরি বিস্তৃত প্রান্তরে তিনি একলক্ষ বাবলা গাছ রোপিত করাইয়াছিলেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে ‘কালে এই বাবলা গাছ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হইবে”; বস্তুতঃ সে কথা মিথ্যা নহে। দুঃখের বিষয় এই নদী মাটিয়ারীবাসীদিগকে পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত করিলেও জন্মভূমির এমনি দুর্ভেদ্য মায়া যে গ্রামবাসিগণ পুনঃ পুনঃ মাটিয়ারীর নূতন পত্তন করিয়া রাশি রাশি অর্থ বিনষ্ট করিয়াছে।

এক্ষণে দেখিতেছি কয়েক বৎসর হইতে গঙ্গাদেবী মাটিয়ারীর প্রতি সনুকলা হইয়াছেন, তাহাতে গ্রামবাসিগণের কত আনন্দ !

রামদাস বাবু প্রচুর পরিমাণে নিত্য আহার করিতেন খাদ্য সামগ্রীর তাদৃশ পরিপাটী ছিল না বটে, কিন্তু প্রতিদিন পাঁচ ছয় বার খাইতেন ; প্রভাতে নিয়মিত ব্যায়ামাদির পর পূর্ণ এক কলসী চিনির সরবং পান করিতেন। প্রতিদিন পনর ষোল সের খাইতেন ভাত অপেক্ষা রুটী লুচী প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন করিতে ভালবাসিতেন জল খাবারের ঘটা বড় বড় নৈবিদ্যের ন্যায় লক্ষিত হইত, কোথাও নিমন্ত্রণে গেলে অনেক অধিক খাইতে পারিতেন, কোন সময়ে শরীর অসুস্থ হওয়ায় উপবাসের পর বৈদ্য একদিন ফল বাতাসা খাইয়া জলপান ও বেগুন পোড়া পথ্য ব্যবস্থা করেন, (রামদাস বাবুর খাদ্য সম্বন্ধে সচ্ছলতা জানিয়াই কবিরাজ মহাশয় একখণ্ড বাতাসা ও কিঞ্চিৎমাত্র বার্ত্তাকু দগ্ধ খাইতে পুনঃ পুনঃ বলিয়া যান। কিন্তু তৎপর দিন বৈদ্যরাজ শুনিতে পাইলেন যে রামদাস বাবু মোদককে গৃহে ডাকাইয়া পাঁচ সের পরিমিত চিনির বাতাসা একখণ্ড ও ত্রিংশৎ সংখ্যা বৃহৎ বার্ত্তাকু দগ্ধ ভোজন করিয়া বৈদ্য মহাশয়ের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই স্বেচ্ছাহার জঠর প্রবল অগ্নিতে কোথায় ভস্মীভূত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি রামদাস বাবু বিনীত ও বাক্‌পটু ছিলেন, কোন সমবেত স্থলে তিনি প্রায়ই বক্তার আসন গ্রহণ করিতেন, বাল্যবন্ধুগণের সহিত তাঁহার আজীবন সহৃদয়তা ছিল, কোন অভিমান ছিল না, কপটতা বা কৃত্রিমতা তিনি একেবারে জানিতেন না। রামদাস বাবু সকলের প্রতি বিধি করিতেন, যে কেহ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি বিনা আপত্তিতে ও বিনা আড়ম্বরে তাঁহার বাটীতে গমন করতঃ আমোদ আহ্লাদ করিয়া আসিয়াছেন! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! রামদাস বাবু সামান্যরূপ পাঠশালায় শিক্ষা পান মাত্র, পিতার নির্দ্দেশে কিয়দ্দিবস

মাত্র একজন শাস্ত্র ব্যবসায়ী অধ্যাপক সমীপে ব্যাকরণাদি কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এ সময়ে তৎপ্রদেশে অন্যবিধ বিশেষ শিক্ষার তাদৃশ উপায় ছিল না। কিন্তু অতি সামান্য শিক্ষাতেই তাহার বিশেষ বশ হইয়াছিল. অধিকন্তু তিনি পাখোয়াজ আদি বাদ্য বাদনে সমধিক পটুতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স্যমণ্ডলী গীত বাদ্য সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিতেন, রামদাস বাবু বন্দ্যোপাধিক উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন. কিন্তু অন্য ব্রাহ্মণ বা শূদ্র বান্ধবীদিগের সহিত এক প্রকার ব্যবহার করিতেন,এখনও তাহার অনেক সহচর জীবিত. তাঁহাদের মুখেই অনেক কথা শুনিয়া লিখিতেছি,সুতরাং লিখিত বিষয়ের সত্যতার অমোঘ প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রামদাস বাবু স্বভাবতঃ স্থূল শরীরী ছিলেন। প্রথমতঃ স্থূলতা বলব্যঞ্জক হইয়া ক্রমে তাহাতেই তাঁহার অনিষ্টোৎপাত করিয়াছিল নানা অসাবধানতায় শরীর ক্রমেই স্থূলতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এমন কি উত্থান শক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইল. তদুপরি জ্বর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন. এই সময়ে তাঁহার উদরের বলিত মাংস মধ্যে একটী বৃহৎ বৃশ্চিক প্রবেশ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়. কয়েকদিন পরে তাহা দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল। রামমোহন বাবু একমাত্র পুত্রের নানাবিধ স্বস্ত্যয়নাদি দৈব ক্রিয়া ও তৎকালোচিত বৈদ্য চিকিৎসা করাইলেন, একে পল্লীগ্রাম তাহাতে চিকিৎসা বিনা তাদৃশ আস্থা বা সুবিধা ছিল না; সুতরাং রামদাস বাবুকে একরূপ অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়।

রামদাস বাবু ১২২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১২৬৩ অব্দের ভাদ্র মাসে চল্লিশ বর্ষ বয়ক্রমে জ্বর পীড়ায় লোকান্তর গমন করেন. বীরদিগের শেষ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও বিস্ময়জনক.

ইহা শোচনীয় কথা হইলেও এই বিবেক ও বীর ভাবের খেদ জনক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, অনন্তর দৈব বা লৌকিক কিছুতেই ফল হইল না, যৎকালে রামদাসের পীড়া সংশয়, রামমোহন বাবু অসাধারণ বিবেকীর ন্যায় প্রিয় পুত্রের চিতা সজ্জার আয়োজন করিয়াছিলেন, অন্যূন ত্রিংশৎ সুব্রাহ্মণ স্কন্ধে রামদাস বাহিত হইয়া গঙ্গাতীরস্থ হইলেন, শুদ্ধ চন্দন কাষ্ঠ মাত্রে ঘৃতাদি মূল্যবান পদার্থে বীর রামদাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হইল।

উপসংহার কালে আমরা রামদাস বাবুর পিতা রামমোহন বাবুর অমানুষিক ধৈর্য্য ও বিবেক কথা লিখিয়া এই বঙ্গ বীরের জীবনী শেষ করিব। এদিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্রব্যাদিসহ মহাধূমে বীর পুত্রকে জন্মের মত বিদায় দিলেন, অনন্তর রাম সীতার ঠাকুর বাটীর প্রাঙ্গনে মূর্ত্তিমান ধৈর্য্যের ন্যায় উপবেশন করিলেন। কোন আত্মীয়বন্ধু সম্মুখে আসিতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তিনি সাদরে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া লইলেন। রামমোহন বাবু বিলাপ পরিত্যাগ করিবেন কি? তিনিই সকলকে ধৈর্য্য শিক্ষা দিলেন, নিয়মিত গায়কদিগকে স্বপ্রণীত রামায়ণ গান করিতে বলিতে লাগিলেন, উপস্থিত জনগণ অবাক্! কি অলৌকিক ধর্ম্মভাব! সুধু ইহাই নহে? প্রিয় পুত্র গতাসু হইলে তিনি বহুদিন জীবিত থাকিয়া অবিচলিত চিত্তে অনেক ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান।

রাম দাস বাবুর দুই পুত্র ৺ রাম রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺ রাম কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহারা উভয়েই খুব বলশালী ছিলেন। রাম রাম বাবুর কোন সন্তানাদি ছিল না। রাম রাম বাবু বংশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে তিনি মাটীয়ারী গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। রাস্তা, ঘাট তিনি ভালরূপে নির্ম্মাণ

করাইয়াছিলেন। নানা বিষয়ে প্রজাদের মনোরঞ্জন করিতেন এবং দানে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। ৫০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিধবা পত্নী এখনও জীবিত আছেন।

রামদাস বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ৺ রাম কমল বাবু (তিনু বাবু) পিতার ন্যায় নানা গুণ বিভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সময়ে দেশ মধ্যে সর্ব্ব প্রধান শিকারী ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার ২০ বৎসর বয়স হইতে ২৪ বৎসর বয়সের মধ্যে স্বহস্তে অনেকগুলি বড় বড় ব্যাঘ্র শিকার করিয়া পিতৃ খ্যাতির অনেক সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি ২৮ বৎসর বয়সে দুই পুত্র ১ কন্যা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

রামকমল বাবুর দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ শ্রীরামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ শ্রীরাম রেণু বন্দ্যোপাধ্যায়। উঁহারা উঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজারঞ্জক হইয়াছেন। পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় ইঁহারাও সর্ব্বদা অভাবীর অভাব মোচনে মুক্ত হস্ত এবং পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি বজায় রাখার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টাবান। পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটা সত্ত্বেও কুলদেবতা ৺রঘুনাথ জীউর পূজা ভোগাদির সুবন্দোবস্ত যথাসম্ভব রক্ষা করিতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রী৺রাম নবমী দিবসে শ্রীরাম-চন্দ্রের জন্মোৎসবের উত্তমরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত সময়ে মাটীয়ারী গ্রামে ১০।১৫ দিন কাল একটী মেলার অধিবেশন হয় এবং যাত্রা গান, রামায়ণ ইত্যাদি নানারূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এইরূপ নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দেশ মধ্যে কীর্ত্তিমান হইয়াছেন। রামরেণু বাবুর বিবাহ হেতমপুরাধিপতি মহারাজ ৺রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের কন্যার সহিত হইয়াছে এবং

তাহাদের ভগ্নীর বিবাহ কলিকাতাস্থ স্বনামখ্যাত এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রিয় শিষ্য ৺ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি বর্ত্তমানে বিধবা

বারেন্দ্রশ্রেণী কায়স্থ নাগ বংশ।

৺যদুনন্দনের "ঢাকুরী" ও সংরক্ষিত বংশাবলি হইতে যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে কান্যকুব্জ প্রদেশের অন্তর্গত কোলাঞ্চ নগর একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। তথায় নাগ বংশীয় শঙ্কর রাম পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন। তাহার যথেষ্ট লাভজনক জমিদারী ছিল। কোন প্রতিজ্ঞা বশতঃ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন ও শৈলকূপা গ্রামে বাসস্থান স্থির করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন এবং তাঁহার উজিয়াল পরগণার জমিদারী অর্জ্জন করেন। তাহার পুত্র প্রতাপ, পৌত্র চিন্তু, প্রপৌত্র চম্প বা চাপা নাগ দ্বারা সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শঙ্কর রাম "জগপতি" আখ্যা লইয়াছিলেন। তিনি সুশীল, সদাচারী অসীম মহিমাশালী, বর্ণ ধর্ম্ম প্রতিপালক, ধর্ম্ম নিপুণ, যশস্বী ও যোড় লক্ষণ যুক্ত ছিলেন। তাহার সময়ে সোনাবাজু পরগণা অর্জ্জিত ছিল না; তাঁহার পুত্র প্রতাপ যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার নাম "প্রতাপ বাজু"। প্রতাপের পুত্র চিন্তা যে জমিদারী অর্জ্জন করেন, তাহার নাম "চিন্তা বাজু" এবং চিন্তার পুত্র চম্প বা চাঁপা নাগ প্রথমে যে জমিদারী অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার নাম "চাঁপাবাজু" এবং পরে যাহা

অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা "বড় বাজু" নামে অভিহিত ছিল। চাপার পুত্র শিব নাগ রায়ের আমলে এই বাজুগুলির সমষ্টির সাধারণ নাম হইয়াছিল পরগণা "সোণার বাজু" বা সোণা বাজু। উপরোক্ত তারা উজিয়ান ও ঐ সোণা বাজু পরগণায় শিবনারায়ণ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই পরগণার ভূমি ইদানীন্তন বারেন্দ্র ভূমির অনেক অংশে বহুদূর লইয়া বিস্তৃত ছিল

উক্ত শিবনাগ রায়ের দুই পুত্র কর্কট ও জটাধর পিতার অভাবে তাঁহারা কিছু কাল এক সংসারভূক্ত ও উভয়ে শৈলকূপবাসী ছিলেন ও কখন কখন শরগ্রামেও বাস করিতেন। পরে উভয়ের মধ্যে সম্পত্তি সকল বিভাগ বণ্টন হইয়াছিল।

এই বিভাগ বণ্টন মতে রাজা কর্কট তারা উজিয়ান পরগণা পাইয়া শৈলকূপা পৈতৃক রাজধানীতে বাস করেন এবং রাজা জটাধর সোনা বাজু পরগণাটী লইয়া শরগ্রামে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বাস করেন এই শরগ্রাম সোনা বাজু পরগণার অন্তর্গত ও বর্ত্তমান জেলা পাবনায় এই স্থানে এই বংশের কেহ আর নাই। বংশধরগণ প্রসিদ্ধ রাজা রূপ নারায়ণ রায় হইতে যশোবাড়ী ও অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছেন উক্ত কর্কট জটাধর এক সংসারভূক্ত অবস্থায় শৈলকূপা রাজধানীতে থাকা কালে ভৃগুরাম নন্দী, নরহরি দাস ও মুরহর চাকী পশ্চিম হইতে অর্থাৎ রাজা বল্লাল সেনের গঙ্গা তীরস্থ রাজধানী প্রসিদ্ধ "বল্লাল দিঘী" হইতে একদা শৈলকূপা অঞ্চলে শুভাগমন করিলেন।

কর্কট ও জটাধর যথোচিত সম্মান সহকারে অতি আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় বিশ্রামান্তে তাহাদিগের ঐরূপ অকস্মাৎ আগমনের কারণ ও বৃত্তান্ত সকল ক্রমে অবগত হইলেন

ঐ সময়ে গৌড়াধিপতি বল্লাল সেন পূর্ব্ব প্রচলিত কৌলিন্যের নিয়ম

প্রণালী পরিবর্ত্তন ও পুনঃ সংগঠন করিতেছিলেন। অনেক অপদস্থ ব্যক্তিকে এই উপলক্ষে তিনি সমাজে মিশাইয়া লইতেছিলেন। যে সকল ব্যক্তির জল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ দ্বারা গৃহীত হইত না, তাহাদিগের মধ্যে অনেকের জল চলনের ব্যবস্থা তিনি করিতে লাগিলেন। অনেক নিম্ন পদস্থ ব্যক্তিগণ সম্মান পাইলেন এবং অনেক অনুপযুক্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের সম্মানের হ্রাস হইল। রাজা বল্লালের ব্যবস্থা মত অনেক কুলীন কুল হারাইতে ও অনেক অকুলীন কুল পাইতে লাগিল।

ফলতঃ নিম্ন শ্রেণীর ও অস্পৃশ্য ব্যক্তিগণকে (Depressed and untouchable class) তিনি রাজ কর্ত্তব্য বিবেচনায় উঠাইয়া লইতে লাগিলেন। রাজ আজ্ঞা প্রতিপালনকারিগণের কোন বিপদ ঘটিল না, কিন্তু বিরোধিগণকে নানা অশান্তি ভোগ করিতে হইল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্থান ত্যাগ করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। রাজ সভাসদগণ মধ্যে কেহ কেহ রাজার এইরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিস্ময়যুক্ত হইলেন। রাজ মন্ত্রী কায়স্থ প্রধান ভৃগুরাম নন্দী বহু প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রাজ কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং রাজাকে ঐরূপ কার্য্য করিতে বারংবার নিষেধ করিলেন।

কিন্তু ফলে এই দাঁড়াইল যে নৃপবর মহাকোপে ভৃগুরাম নন্দী মহাশয়কে বন্দী (intern) করিলেন। ভাবিলেন যে অনবরুদ্ধ রাখিলে এ ব্যক্তি অন্যান্য বিরুদ্ধচারিগণকে লইয়া প্রবল দলবদ্ধ হইবে ও তাহাদিগের সাহায্যে তাঁহাকে নূতন ভাবে কৌলীন্য নিয়ম প্রচলন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে দিবে না। ভৃগুরামের সংসর্গে থাকিয়া রাজপুত্র লক্ষ্মণ সেনের মনোবৃত্তি ও আচরণ পিতৃ-মনস্কামের প্রতিকূল হইতেছে বুঝিয়া তাঁহার ঐরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং এই জন্যই অনতিবিলম্বে ভৃগুরাম কারারুদ্ধ হইলেন। এই সকল ঘটনা "বল্লাল দিঘী" নামক স্থানে ঘটিয়াছিল এবং নূতন

রূপে কুল প্রথা প্রচলন কালে বল্লালসেন এই স্থানেই ছিলেন এবং ইহাই তাঁহার শেষ রাজধানী। মহম্মদ বিণ বকতিয়ার খিলিজী যখন বাঙ্গালা দেশ জয় করিবার জন্য মগধ হইতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন এইস্থানে ছিলেন এবং মুসলমানগণ নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন এই স্থান হইতেই খিড়কি দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বল্লাল দিঘী বর্ত্তমান ভাগিরথী ও বর্ত্তমান জলঙ্গী বা খড়িয়া নদীর সংযোগ স্থানের অনতিদূরে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ভৃগুরাম নন্দী এই স্থান হইতেই মুরহর চাকী ও নরহরি দাস সহ পূর্ব্বাভিমুখে যাইয়া শৈলকুপা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এই স্থানে রাজ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ স্তুপাকারে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বল্লালের দিঘী বা প্রকাণ্ড জলাশয় স্থানীয় ব্যক্তিগণ একটা বিস্তৃত নিম্ন ভূমি খণ্ডে আছে বলিয়া প্রদর্শন করেন। এখানে এখনও অনেক ভদ্রলোকের বাস আছে। রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ বন্দী হওয়া হেতু ভৃগুরাম যারপরনাই লজ্জিত হইলেন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পৃথক একটা পাঠা (পঙক্তি) করিবেন এবং বল্লাল মর্য্যাদা লইবেন না। অনন্তর নরহরি দাস ও কুটুম্ব প্রধান মুরারী বা মুরহর চাকীকে সসম্মানে আনয়ন করিলেন এবং তিনজন একত্রে নির্জ্জনে রাজার চরিত্র দোষ আলোচনা করিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। রাজধানীতে থাকিলে রাজা অনিষ্টকারী হইবেন এবং রাজ আদেশে কৌলীন্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে থাকিলে ও তাহাদের সহিত আহার বিহার করিলে ধর্ম্ম ও জাতি রক্ষা হইবে না এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া অন্যদেশে যাওয়াই স্থির করিলেন এবং অনন্তর রাজধানী ত্যাগ করিয়া তিন জনেই পূর্ব্বাভিমুখে পলায়ন করিলেন ও বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে দুরন্ত রাজার চর নিরন্তর ঘুড়িয়া বেড়ায়, তাহারা বল প্রয়োগ

দ্বারা ধরিয়া লইতে পারে ; সহায় রহিত স্থলে শত্রু শঙ্কা হয়, এমন স্থলে যাইতে হইবে যেখানে গেলে ধরিতে পারিবে না। তাহারা কথায় কথায় ক্রমে শৈলকুপার নিকটবর্ত্তী হইলে, ভৃগুরাম নন্দী মহাশয় তখন বলিলেন যে, এই স্থানে পূর্ব্বে শিব নাগ রায় ছিলেন। তাহার দুই পুত্র ককট ও জটাধর। তাঁহারা শৈল কুপা ও শরগ্রাম এই দুই স্থানে বাস করেন। তাঁহারা ধনবান, মহাবল ও কীর্ত্তিমান। মাত্র তাঁহাদিগের সহিত একত্রিত হইলে বল্লালের হাতে রক্ষা পাইতে পারি। তাঁহার এই হিতোপদেশ সকলেই গ্রহণ করিলেন এবং নাগ ভ্রাতার পার্শ্বে গমন করিলেন। নাগ ভ্রাতাদ্বয় পরম আদরে তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন ও শৈলকপার অনতিদূরে নন্দি গাতি, দাস গাতি ও চাকি জাঁতি গ্রামে তিনজনের তিন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন ও তথায় তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন। ঐ নন্দি গাতি ও চাকি গাতি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, দাস গাতি কুমার নদের গর্ভস্থ হইয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

অনন্তর উক্ত ভৃগুরাম নন্দি, নরহরি দাশ ও নুরহর চাকি ককট ও জটাধরকে রাজা বল্লাল সেনের কার্য্যাবলী বিশেষ করিয়া বলিলেন। নাগ ভ্রাতাদ্বয় বল্লাল সেনের চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন ও তাহার মত গ্রহণ অন্যায় হইবে বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণী সৃষ্টি করিবার জন্য নিবেদন করিলেন। তাহাতে সকলের মত হইলে দাস, নন্দী, চাকী ও নাগ হর্ষযুক্ত হইয়া "বারেন্দ্র শ্রেণী কায়স্থের" সমাজ গঠন করিলেন। তাঁহারা সিংহ ও দত্ত গরকে যত্ন পূর্ব্বক ঐ শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। তাহাদিগের মতে কন্যাগত বা পুত্রগত কুল বন্ধন সমীচিন হইল না। দান গ্রহণকেই তাহারা সকলের মূল কুল স্থির করিলেন। কন্যা দাতার নিকট অর্থ গ্রহণ মহাপাপ সিদ্ধান্ত হইল। উপরোক্ত ৭ ঘর লইয়া যে "বারেন্দ্রশ্রেণী"

কায়স্থ সমাজ সংগঠিত হইল তন্মধ্যে দাস, নন্দি, চাকী, ঘর সিদ্ধ বা কুলীন এবং নাগ, সিংহ দেব, দত্ত, ঘর, সাধ্য বা মৌলিক বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন। ঐ সিদ্ধ তিন জন নাগকে সিদ্ধ পদ দিতে বহু যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য তিন ঘরকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধ পদ লইতে নাগ সম্মত হইয়াছিলেন না। দাস, নন্দী চাকীকে নাগ নিজালয়ে মহা সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেবনীয় অতিথি এজন্য ঐ তিন জন মাত্রকেই সিদ্ধ পদ দেওয়া স্থির হইয়াছিল; কিন্তু পরে সিদ্ধগণের বিচারে নাগ সাধ্য ঘর ও সকলের চলন ঘর হইলেন এবং সিদ্ধতুল্য মর্য্যাদা পাইলেন। এই সময় ভৃগুরাম নন্দীর ভৃত্য নর সুন্দর সরমা নামক একব্যক্তি কুল পাইবার আকাঙ্খায় এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, বল্লাল সভায় তাঁহার তুল্য লোকে বহু মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বারেন্দ্র সমাজে তাঁহাকে কুল না দিলে তিনি আর তথায় থাকিবেন না। এ কথা শুনিয়া নন্দী ও চাকী তাঁহাকে অৰ্দ্ধ কুল দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু নাগ জটাধর তাহা শুনিয়া ক্রোধে তাঁহাকে দেশান্তরে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি বারেন্দ্র প্রবীণ মধ্যে মিশিতে পারেন নাই এবং তাঁহার বংশধর কেহ আছেন কিনা তাহাও জানিবার উপায় নাই। এইরূপে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ গঠিত হইয়াছিল। এই সমাজে বল্লাল-মর্য্যাদা গৃহীত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন বাহাত্তর ঘরের একটি কথা আছে তাহা এই:—রাজা বল্লাল সেনের ৭২ ঘর কাহার ব্যবসায়ী ভৃত্য ছিল, তাহারা অক্ষম, অকৃতকর্ম্মা, নীচ শূদ্র, ধনহীন, গুণহীন ও নীচ কৰ্ম্মে রত। তাহারা রাজা বল্লালের সহায়তায় ক্রমে কায়স্থ সমাজে মিশিতেছিল। আর ৪০ ঘর যে ছিল তাহাদের মধ্যে ভাল মন্দ দুইই ছিল, কিন্তু আচরণ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির ন্যায় ছিল না। তৎকালে বারেন্দ্র সমাজে এই ৭২ ঘর গৃহিত হইয়াছিল না। কিন্তু বল্লালের

সাহায্যে কেহ কেহ উত্তমের সহিত মিশিতে পারিয়াছিলেন এবং অনেকেই অবস্থাপন্ন হইয়া ধীরে ধীরে বারেন্দ্র সমাজেও মিশিয়াছিলেন। ইহাদিগের মুল পরিচয় পাওয়া না গেলেও মুলজ বারেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ সংঘটন হেতু বলা যায় না যে ইহারা আধুনিক বারেন্দ্র কায়স্থ নহেন। অনেকে ঐ সপ্ত ঘরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সত্য কি মিথ্যা তাহা স্থির করা অতি কঠিন, তবে এই মাত্র বলা যায় যে খাটি সপ্ত ঘরের বংশধরগণ অধিকাংশই পরস্পরের নিকট সুপরিচিত আছেন। সমাজ গঠন কার্য্যে নাগকে সহায় করিয়া দাস, নন্দী, চাকী, বল্লালের সহিত প্রতিযোগিতায় এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং পাঠি নির্ম্মাণ কার্য্যে ভৃগুরাম, নন্দীই প্রধান ছিলেন। বল্লাল সেন চর সাহায্যে ভৃগুরাম নরহরি দাস ও মুরহর চাকীর পলায়ন বৃত্তান্ত ও অবস্থিতির স্থান অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা কর্কট ও জটাধরের সহিত অনর্থক কলহ এড়াইবার ইচ্ছায় তিনি পলায়নকারিগণকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিবার চেষ্টা করেন নাই. তবে মনো রাগ বশতঃ তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর কায়স্থ গণের কুল নিয়ম প্রণালী প্রচলন কালে দাস নন্দি ও চাকী বংশকে কৌলিন্য দেন নাই। সমাজ সংস্থাপন ক্রিয়ায় বল্লালের কার্য্য ভাল কি ভৃগুরামের কার্য্য ভাল হইয়াছিল তাহা বিবেচ্য বিষয় বটে। যে কারণেই হউক বল্লাল বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে সমাজভুক্ত করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য বংশ পরম্পরায় তাহাদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব ঘটিয়া অধিকাংশের বিস্তৃত উন্নতি সম্বন্ধ সংস্থাপনের সুবিধা ও পরস্পরের সহানু ভূতি প্রাপ্তির উপায় হইয়াছিল, তিনি বহু নিম্ন পদস্থ অস্পৃশ্য ব্যক্তি গণকে (Depressed and untouchable class) উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। রাজার যে রাজ ব্যবহার উপযুক্ত তাহাই তিনি করিয়াছিলেন। অল্প সংখ্যক কুলিন রাখিয়া মৌলিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করায় সমাজস্থ ব্যক্তিগণ অনেক সুবিধা

ভোগ করিতেছেন। ভৃগুরাম মাত্র সাত ঘর সমাজকে আবদ্ধ করায় ঐ সকল ঘরের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা পরে বাধ্য হইয়া ক্রমে পূর্ব্ব পুরুষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া আসিতেছেন এবং শেষোক্ত ঘরগুলিও ক্রমে কুল কার্য্য করিয়া বারেন্দ্র সমাজে আদরান্বিত হইতেছেন। ভৃগুরামের নির্দ্দিষ্ট সপ্তঘরের আবদ্ধ থাকা যে অসম্ভব তাহা অল্পকাল মধ্যেই ঐ সকল ঘরের বংশধরগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং অপ্রসারিত সমাজে আবদ্ধ থাকা হেতু স্বাভাবিক যে সকল দোষ ঘটে, সেই সকল দোষ হইতে আপনাদিগকে ক্রমে প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ ভৃগুরামের সংগঠিত সমাজ এইক্ষণে অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা ভালই হইয়াছে। অধিক সংখ্যক লোক লইয়া যে সমাজ তাহাই সুফলপ্রদ।

উক্ত তারা উজিয়ান পরগণায় কতকাংশ পরে তারাগনিয়া নামে এবং অধিকাংশই সুবাদারের নাম অনুসারে পরগণা মহম্মদ সাহী নামে পরিচিত হইয়াছিল।

যে অংশে তারা উজিয়ান নাম বর্ত্তমান আছে, এখন তাহা পাবনা ও যশোহর জেলার অন্তর্ভূক্ত আছে। তারাগনিয়া পরগনার ভূমি সকল বর্ত্তমান পাবনা, যশোহর, নদীয়া ও রাজসাহীর অন্তর্গত আছে এবং মহম্মদ যা মামুদশাহী পরগণার ভুমি সকল বর্ত্তমান পাবনা, যশোহর ও নদীয়া জেলার অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই তিন পরগণার ভূমিই তারাউজিয়ান নামে পরিচিত ছিল এবং তাহার ভূমির পরিমাণ ৮৯০৪২০ বিঘা ছিল। এই সমুদায় ভূমি এক্ষণে ১৬৯টী ভিন্ন ভিন্ন মহাল ভুক্ত আছে (Hunter)। এই তারা উজিয়ান পরগণাই বিভাগ বণ্টন ক্রমে রাজা কর্কট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সোনা বাজু পরগণা ৪টী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণার সমষ্টি লইয়া হইয়াছিল। পরে তাহা ৭টী ক্ষুদ্রতর পরগণায় পরিণত হইয়াছে।

যথা:—বর্ত্তমান রাজসাহী ও পাবনা জেলার অন্তর্গত সোনা বাজু পরগণা, ঐ পাবনা ও বর্ত্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত বড় বাজু পরগণা, ঐ রাজশাহী ও বগুড়া জেলার অন্তর্গত প্রতাপ বাজু ও চিন্তা বাজু পরগণা ঐ পাবনা জেলার অন্তর্গত বাজু চম্পা ও বাজুরস নাজিরপুর পরগণা ও ঐ রাজশাহী ও পাবনা জেলার অন্তর্গত বাজুরস মহরতপুর পরগণা। এই সকল লইয়া মূল সোনা বাজু পরগণায় ১২৮৩৭২৫ বিঘা জমি ছিল। এই সমুদয় জমি এক্ষণে ৩৩৮টী ভিন্ন ভিন্ন মহাল ভুক্ত আছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণার সমষ্টি সোনা বাজু পরগণাই বিভাগ বণ্টন সূত্রে রাজা জটাধর পাইয়াছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে "বারেন্দ্র ভূমিতে" বাস করিতেন বঙ্গদেশের যে অংশ বরেন্দ্র ভূমি নামে পরিচিত তাহার উত্তরে কোচ রাজ্য, দক্ষিণে পদ্মানদী, পূর্ব্বে করতোয়া নদী, পশ্চিমে মহানন্দা নদী এই বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণস্থ পদ্মানদীর অপর পারে তৎসংলগ্ন শৈলকুপা গ্রাম অবস্থিত ছিল ঐ পদ্মানদী ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে সরিয়া গিয়া বর্ত্তমান পাবনার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বর্ত্তমান শৈলকুপার উত্তর গা হইতে বর্ত্তমান পদ্মানদীর দক্ষিণ গা পর্য্যন্ত যে স্থান তাহা পদ্মার চর ভূমি মাত্র। এই ভূমিতে প্রাচীনত্ব দেখাইবার কিছুই নাই, কোন প্রাচীন হিন্দু দেবালয় কি কোন প্রাচীন মসজিদ কি প্রাচীন ইষ্টকালয় কিংবা কোন প্রাচীন মহাবৃক্ষ দেখা যায় না। যাহা আছে সমস্তই নূতনত্বের পরিচয় দেয়। কিন্তু শৈলকুপা গ্রাম যে অতি প্রাচীন তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। উহার দক্ষিণ গায়ে কুমারনদ অদ্যাপিও প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে পদ্মানদীর শাখা "কালী গঙ্গা" নদী এবং অতি বেগবতী গৌরী (গরাই) নদীর শাখা ডাউকী নদী শেষাংশে কচুয়াখাল নামে শৈলকুপার কিছু উত্তরে পরস্পর মিলিত হওয়ায় কালীগঙ্গা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এই বেগবতী ও ক্রমে

প্রশস্ত কালীগঙ্গা নদী শৈলকুপার অনতিদূরে কুমার নদের সহিত মিলিত হওয়ায় কুমার নদের প্রাবল্য এই সংযোগ স্থান হইতে অতি বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কুমার নদের পশ্চিম দিকের অবশিষ্ট অংশ অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। শৈলকুপার দক্ষিণস্থ কুমার নদের অংশ প্রবলবেগে ক্রমে বারাশীয়া ও মধুমতী নদী সহযোগে সুন্দরবন অভিমুখে গিয়া সাগরে মিশিয়াছে। দুইটী নদীর সঙ্গম স্থানের নিকট অবস্থিত থাকা হেতু শৈলকুপা গ্রাম বাসের পক্ষে অতি সুন্দর স্থান এবং অত্রত্য স্বাস্থ্যও অতি প্রশংসনীয় ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বাসোপযোগী। এই স্থানে নাগরাজ শঙ্কর রামের বাসস্থান স্থির হইবার পক্ষে ইহা একটী প্রধান কারণ হইতে পারে।

এই শঙ্কর রামের বংশের অর্থাৎ নাগ বংশের গোত্র সৌপায়ন। তাহাদিগের পঞ্চ প্রবর যথাঃ—সৌপায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপসার ও নৈধ্রুব

এই শৈলকুপা এইক্ষণে বর্ত্তমান জেলা যশোহরের ও মহকুমা ঝিনাইদহের অন্তর্গত। ইহা একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থল। এই স্থানে থানা, ডাকঘর, সবরেজেষ্টারী অপিস ও ট্রেনিং স্কুল ও বড় বাজার আছে এবং বহু ভদ্রলোকের বাস।

নাগ বংশের প্রতিষ্ঠিত মঠ বর্ত্তমান থাকা দেখা যায় না কিন্তু শৈলকুপার পশ্চিম পার্শ্বে "মঠ বাড়ীর মাঠ" নামক স্থানটি অদ্যাপি সুপ্রসিদ্ধ ও কিংবদন্তিযুক্ত আছে। প্রবাদ যে ঐ মঠ ভূগর্ভস্থ অবস্থায় আছে এবং জনৈক ফকির মৃত্তিকা খনন দ্বারা উহা অবিশ্বাসের চেষ্টা করায় গলায় রক্ত উঠিয়া মারা পড়েন, তদবধি আর কেহই উহা বাহির করিবার যত্ন করেন নাই। আরও প্রবাদ এই যে, ঐ মঠস্থিত দেব মূর্ত্তি কতকগুলি অবিবেচক মুসলমানগণের অত্যাচারে অন্তর্ধান হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পূজক জনৈক সন্ন্যাসী ঠাকুরও এ অত্যাচারের ভয়ে নদীর অপর

পার্শ্বস্থ দেবতালয় নিবিড় অরণ্যে গোপনে বাস করিতেছিলেন। এই দেবমূর্ত্তি কি ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কিংবদন্তি এই যে সন্ন্যাসীঠাকুর প্রত্যহ প্রত্যুষে অপরের অলক্ষিত অবস্থায় কুমার ও কালী গঙ্গা নদীর সংযোগ স্থলে স্নান করিতেন; এক রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে এক দেবমূর্ত্তি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া আদেশ করিলেন যে কল্য প্রত্যুষে নদীতে স্নান করিবার সময় যে কাষ্ঠ খণ্ড ভাসিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরকে স্পর্শ করিবে তদ্বারা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা সংস্থাপন পূর্ব্বক রীতিমত পূজা করিতে হইবে। পর দিন সন্ন্যাসী ঠাকুর স্নান করিবার সময় দেখিলেন একটী বৃহৎ নিম্ব কাষ্ঠ নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিল; তখন তাহার সেই স্বপ্নের কথা মনে হইল এবং তিনি তখন অনেক চেষ্টা করিয়া ঐ কাষ্ঠ খণ্ড জল হইতে উত্তোলন করিলেন। ঐ কাষ্ঠখণ্ড লইয়া কেমন করিয়া কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় একজন সূত্রধর কুঠার স্কন্ধে তাহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর কি করিতে হইবে—"? সন্ন্যাসী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পার?" সূত্রধর উত্তর দিলেন "পারি, কি দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে বলুন"। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর বড়ই বিপদগ্রস্ত হইলেন; কারণ, কি দেবমূর্ত্তি গড়াইতে হইবে স্বপ্নে তৎসম্বন্ধে কোন উপদেশ পান নাই; সূত্রধর ঠাকুরকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া কহিলেন "চিন্তা নাই, আমি দুই প্রকার দেবমূর্ত্তি গড়িয়া আনিব, যেটী আপনার পছন্দ হয় রাখিবেন, অন্যটী আমার থাকিবে—।" এই কথা বলিয়া সূত্রধর কাষ্ঠ খণ্ড নিজালয়ে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরও অরণ্যস্থিত নিজ কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন। কয়েকদিন পর সূত্রধর দুইটী মূর্ত্তিসহ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন "আপনি কোন্‌টী লইবেন বলুন।" একটী রাম মূর্ত্তি, দ্বিতীয়টী গোপাল মূর্ত্তি।

দুইটীই অতি সুন্দর ও মনোহর দেখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর কোনটাই ত্যাগ করিলেন না; দুইটীই গ্রহণ ইচ্ছা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ সূত্রধর হঠাৎ দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। অনন্তর সন্ন্যাসী ঠাকুর অতি যত্নে "রামগোপাল" সেবা সংস্থাপন করিলেন এবং অতি কষ্টে গোপন ভাবে সেই মহারণ্যে সেবা চালাইতে লাগিলেন এবং পরে রামগোপালের অনুগ্রহে বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ সূত্রধর উক্ত মঠ বাড়ীর মঠস্থিত দেবমূর্ত্তি ভিন্ন আর কেহ নহেন এবং ঐ মূর্ত্তিদ্বয়ে তিনি এই প্রকারে নিজেকেই প্রকট করিয়াছেন।

কিছুদিন পর ঐ দেবতলার নিকটবর্ত্তী অরণ্য মধ্যস্থ জনপদ গুলিতে এক গণ্ডারের উপদ্রব হইল। এজন্য ইহার নাম হইল গাঁড়ারখোলা। ইহা শৈলকূপার অপর পার্শ্বে কুমার নদের তীরে বিদ্যমান আছে। ঐ গণ্ডার দ্বারা বহু মনুষ্য ও অন্যান্য জীব গতপ্রাণ হওয়ায় প্রজা সকল গ্রামান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল ও তৎকালীন দেশাধিপতি নলডাঙ্গার রাজসরকারের নিকট গণ্ডার বধের সাহায্য প্রার্থনা করিল। রাজা অনেক চেষ্টা ও ব্যয় করিয়াও গণ্ডারের আশঙ্কা নিবারণে অক্ষম হইলেন। এই সময়ের মধ্যে "রামগোপাল" মূর্ত্তি আর ততদূর গুপ্ত অবস্থায় ছিলেন না। দেবতার আদেশে সন্ন্যাসী ঠাকুর পাণিগ্রহণ করিয়া সন্তান সন্ততিসহ সেবার কার্য্য চালাইতেছিলেন এবং কুটুম্ব ও তাঁহাদিগের দাস দাসিগণের অনেক সময় তথায় যাতায়াত হেতু নিকটস্থ জনসাধারণ "রামগোপালের" অস্তিত্ব ও অসীম সামর্থ্য ক্রমে অবগত হইয়াছিলেন এবং অনেকেই রামগোপালের "মানসা" করিয়া সিদ্ধ মনস্কাম হওয়ায় জনতা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রজাগণ রামগোপালের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাদের "মানসা" করিবার জন্য রাজাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। যদি গণ্ডারের উৎপাত যায়, তবে রামগোপালের সেবার সু ব্যবস্থা করিবেন। রাজা একদিন এই "মানসা" করায় পরদিন

প্রাতে দেখা গেল যে,কতকগুলি শকুনি পক্ষী ঐ গণ্ডারের আবাসস্থানের আকাশমার্গে উড়িয়া বেড়াইতেছে ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া কখন পড়িতেছে,কখন উঠিতেছে। লোক সকল তদ্দৃষ্টে কৌতূহলযুক্ত হইয়া ক্রমে সভয়ে ঐ স্থানে যাইয়া দেখিতে পাইল গৃধ্র ও কুক্কুর শৃগালকুল বেষ্টিত গণ্ডারটী মৃত অবস্থায় পতিত আছে এবং তাহার পার্শ্বে এক গাছি ক্ষুদ্র স্বর্ণ বলয় ও একখানি ক্ষুদ্র উষ্ণীষ পড়িয়া আছে। তাহা কাহার তৎকালে কেহই নির্ণয় করিতে না পারায় ক্রমে অনুসন্ধানে জানা গেল ঐ বলয় রামমূর্ত্তির হস্তের ও ঐ উষ্ণীষ গোপাল মূর্ত্তির মস্তকের। ইহাই দেখিয়া রামগোপালের অসাধারণ শক্তি বলে এই গণ্ডার হত হওয়া বিষয়ে আর কাহারই সন্দেহ রহিল না। রাজা পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে বহুভূমি দেব সেবার জন্য দান করিলেন। অদ্যাপিও তদ্দ্বারা তাঁহার দেবসেবার কার্য্য চলিতেছে। অন্যান্য মহোদয় ভক্তি সহ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া নিজ শৈলকুপাতেই এই দুই বিগ্রহ মূর্ত্তি অরণ্য হইতে আনয়ন পূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরের বংশধরগণ শৈলকুপা থাকিয়া অদ্যাপিও তাঁহাদিগের সেবার কার্য্য সযত্নে করিতেছেন। ইহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে সুপরিচিত আছেন। ইঁহাদিগের সহিত সাক্ষাত হইলে শৈলকুপার ও উক্ত রামগোপাল বিগ্রহের এবং মঠের সঙ্গে সঙ্গে নাগ বংশের অনেক প্রাচীন তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। *

এই বংশের রাজা কর্কটের পর হইতে সপ্তম পুরুষ রাজবল্লভ মুন্সপ বা মনসবদার অর্থাৎ প্রধান সুবাদারের অধীনে শত সৈন্যের নেতা ছিলেন ও বাদসার নিকট হইতে জায়গীর ও রাজা উপাধি

---

*নাগ বংশের বংশাবলি বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় M. B. E র প্রকাশিত "ঢাকুর বা বারেন্দ্র কায়স্থ তত্ত্ব, নাগবংশ" নামক পুস্তকে লেখা আছে।

পাইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যদুনন্দন নিজ কৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যথা:—

"কালিদাস পুত্র রাজা রাজবল্লভ হইল।
মুনসফ জানিয়া পাতশা রাজ টীকা দিল।
রাজা রাজবল্লভ নাম মুনসফ কারণ।
সংক্ষেপে কহিনু আমি শ্রীযদুনন্দন।
হস্তী নাশী নরপতি বিদিত ভুবনে।
বারেন্দ্র মর্য্যাদাবন্ত জানে সর্ব্বজনে॥"

রাজ বল্লভের পৌত্র রাজা রঘুনাথ রায় মহাবীর ছিলেন। যদু নন্দনের মতে তাঁহার নবরত্ন তুল্য সভা ছিল ও তাঁহার বংশে কেহ মূর্খ ছিল না। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিতে রঘুনাথের বীরত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র কবিরঞ্জন B. A. M. R. A. S. মহোদয়ের প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাস ২য় খণ্ডের ২০৬, ২২৩, ২২৬, ২৩০ ও ৩৭৯ পৃষ্ঠা পাঠে জানা যায় যে, রঘুনাথ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জনৈক সেনাপতি ছিলেন। ঐ পুস্তকের ৪১৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যথা:—
'রঘুনাথ রায়—ঘটক কারিকায় যে "প্রাচাপতি রঘু" নামক প্রতাপাদিত্যের সেনাপতির কথা আছে—তাহার নিবাস ছিল যশোহর জেলার অন্তর্গত শৈলকূপায়। তিনি দ্বৈপায়ন গোত্রীয় নাগ বংশীয় বারেন্দ্র কায়স্থ; এই নাগবংশ খুব পুরাতন।"

"সেনানী সূর্য্যকান্তশ্চ রঘু প্রাচাপতি স্তথা"
—ঘটককারিকা, নিখিল বাবুর গ্রন্থ ৩১৪ পৃঃ।

উক্ত কবিরঞ্জন মহাশয়ের ঐ গ্রন্থে বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থের ও নাগ বংশের সংক্ষেপে বর্ণনা আছে।

উক্ত রঘুনাথ রায়ের অনেক বিবরণ বারেন্দ্র কায়স্থ কুল গৌরব

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় কায়স্থ পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের অর্থাৎ ১৩১০ সালের কার্ত্তিক মাসের ৭ম সংখ্যায় ১৭৩ হইতে ১৮: পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। নাগ বংশের বিবরণ জানিতে হইলে ইহা অবশ্য পাঠ্য। সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় কায়স্থ পত্রিকায় এই বংশ সম্বন্ধে অনেক লিখিয়াছেন তাহাও পাঠ্য।

উক্ত রঘুনাথ রায়ের প্রথম পুত্র রামনারায়ণ পিতৃত্যক্ত রাজ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া শৈলকুপায় বাস করিতেছিলেন এবং তাঁহার সহোদর সন্তোষ ও উদয় "নাগপাড়া" গ্রামে যাইয়া বাস করিতেছিলেন। এই সময় মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের ও রঘুনাথের পতনের ফল স্বরূপ বাদসার প্রধান মুসলমান কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ রাজা রামনারায়ণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার বিষয়, বিভব, মঠ ও দেবালয় সকল হস্তগত করিয়া লওয়ায় ও দেবালয় সকল মসজিদে পরিণত করায় তিনি অগত্যা শৈলকুপা পরিত্যাগ করিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় বর্ত্তমান জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত বাগছলী গ্রামে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে নাগ বংশের কেহই শৈলকুপায় আর রহিলেন না। তাঁহাদিগের বাসবাটীর ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ স্তূপ স্থানে স্থানে যে দেখা যায় মাত্র তাহাতেই তাঁহাদিগের পরিচয় হইতেছে। সমাজে "শৈলকুপার নাগ" মাত্র পরিচয় চলিতেছে।

উক্ত রামনারায়ণ সম্বন্ধে যদুনন্দন লিখিয়াছেন যথা :—"তার মধ্যে (রঘুনাথ রায়ের তিন পুত্র মধ্যে) জ্যেষ্ঠভাব রামনারায়ণ।

গাজনাতে বিবাহ কৈলা উত্তম কারণ॥
সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ তিন ঘরে করণ প্রকাশ।
জমিদারী গেলে কৈলা বাগছলী বাস॥"

রাম নারায়ণের শ্বশুরালয় বর্ত্তমান জেলা ফরিদপুর থানা বালিয়াকাঁদির অধীন গাজনা গ্রামে ছিল। শ্বশুরের নিকট থাকা সুবিধা মনে

করিয়া রাম নারায়ণ বাগছলী বাস করিলেন ও তথায় থাকাকালে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর উদয়ের পরলোক হইলে দুঃখিত হইয়া তিনি তাহার মধ্যম ভ্রাতা সন্তোষকে নাগপাড়া হইতে বাগছলী আনিলেন ও দুই ভাই মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। এখন আর রাজা নাই, এতদিন উপাধি রাজ্যগত ছিল, জ্ঞাতিগণ "নাগ" উপাধিতে পরিচিত হইতেন। এখন দুইই তুল্য এ জন্য "রায়" উপাধি বংশগত হইল। তদবধি রাম নারায়ণ ও সন্তোষের বংশধরগণ সকলেরই "রায়" উপাধি চলিতেছে। তবে বড় ভাইএর বংশ ও ছোট ভাই এর বংশ এই মাত্র প্রভেদ।

উক্ত রাজাচ্যুত রাম নারায়ণের প্রথম পুত্র হরিরাম ও ২য় পুত্র মধুরাম হরিরামের কালীচরণ, ভবানীচরণ ও চণ্ডীচরণ নামে তিন পুত্র ছিল; তন্মধ্যে কালীচরণ বাগছলী থাকিলেন ও ভবানী ও চণ্ডীচরণ পর পর যুড়কা ও বালীয়াপাড়া বিবাহ করিয়া উভয়েই শ্বশুর কুলের বহু সম্পত্তি পাইয়াছিলেন এবং সেই সেই স্থানই তাঁহাদিগের বাসভূমি হইয়াছিল। কালীচরণ ও তাঁহার খুল্লতাত মধুরামের বংশধরগণ প্রায় সকলেই অদ্যাবধি বাগছলী বাস করিতেছেন। কেবল কালীচরণের পুত্র মহাদেবের দ্বিতীয় পুত্র কালুরামের প্রপৌত্র ৺গৌর সুন্দর রায় মহাশয় রংপুর কাকিনার স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুরকে কন্যা দান করিয়া কাকিনাবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার ছয়টী পুত্র; পুত্রগণ সহ ঐ কাকিনার রাজাশ্রয়ে বাস করিতেছেন কালীচরণের পুত্র মহাদেবের প্রথম পুত্র গোপালের বৃদ্ধ প্রপৌত্র মনীন্দ্র ও যতীন্দ্র (প্রতাপ চন্দ্র রায়ের পুত্র) বাগছলি আছেন উপরোক্ত মধুরামের বংশধরগণ মধ্যে তাহার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের পুত্র রূপচন্দ্র রায়ের প্রথম পুত্র দেবেন্দ্র, তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণবন্ধু এবং মৃত দ্বিতীয় পুত্রের পুত্র পূর্ণচন্দ্র এবং এই দেবেন্দ্রের চারি পুত্র নগেন্দ্র,

উপেন্দ্র, ননি ও হরিপদ পৈত্রিক স্থান বাগছলিতেই আছেন।

উক্ত রাজ্যচ্যুত রামনারায়ণের পুত্র হরিরামের দ্বিতীয় পুত্র ভবানী চরণ বংশহীন। হরিরামের তৃতীয় পুত্র চণ্ডীচরণ বর্ত্তমান নদিয়া জেলার কুষ্ঠিয়া থানার অন্তর্গত বালিয়াপাড়া গ্রামে বাস করেন। তাঁহার ৪ পুত্র চন্দ্র, কৃষ্ণদেব, কুঞ্জ এবং রামকান্ত। চন্দ্রের মাত্র একটী বৃদ্ধ প্রপৌত্র প্রাণ গোপাল বালিয়াপাড়া বাস করিতেছেন। চণ্ডী-চরণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদেবের দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথের পুত্র গোলকচাঁদ বালিয়াপাড়া ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান পোড়াদহ ষ্টেশনের নিকটস্থ স্বরূপদহে বাস করেন। গোলকের দুই পুত্র গিরীশ ও ঈশ্বর। গিরীশের পৌত্র অশ্বিনী, যতীন্দ্র, অনীল ও জিতেন এবং ঈশ্বরের পুত্র রাধা বিনোদ ঐ স্বরূপদহে বাস করিতেছেন। চণ্ডীচরণের ৩য় পুত্র কুঞ্জদেবের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র মাতামহ স্থান পাবনা সহরে বাস করিতেছেন। চণ্ডীচরণের ৪র্থপুত্র রাম কান্তের তিন পুত্র নন্দ কুমার, ব্রজ কুমার ও রাম কুমার। এই নন্দ কুমারের প্রথম পুত্র অমর চাঁদের বাস জেলা মুর্শিদাবাদ থানা জলাঙ্গীর অধীন ফরিদপুর গ্রাম। তাঁহার দুই পুত্র ১ম রসিক, ২য় যাদব। রসিকের পৌত্র অনুকুল, পুত্রসহ জেলা নদীয়া থানা আলমডাঙ্গার অধীন কুমারী গ্রামে বাস করিতেছেন। যাদবের পুত্র ব্রজ দুই পুত্র অক্ষী ও ধীরেন্দ্র ভূষণকে লইয়া অদ্যাপি ঐ ফরিদপুরবাসী আছেন। উক্ত রাম কান্তের দ্বিতীয় পুত্র ব্রজ কুমার রায়ের তিন পুত্র বদন, রামধন ও কৃষ্ণধন। বদন বালিয়াপাড়া ছাড়িয়া জেলা মুর্শিদাবাদ থানা জলাঙ্গীর অধীন কুশবাড়ীয়া গ্রামে বাস করেন। বদনের পুত্র মথুরের দুই পুত্রঃ—কালী ও নীলমণি। কালী জেলা মুর্শিদাবাদ থানা নিমতিতার অধীন জগতাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় রাধা বল্লভ ও জগৎ বল্লভ এই জগতাই গ্রামে বাস করিতেছেন। কিন্তু কালীর ভ্রাতা নীলমণি

পুত্র মনীন্দ্র সহ উক্ত কুশবাড়ীয়া বাস করিতেছেন। উক্ত রাম কান্তের দ্বিতীয় পুত্র ব্রজ কুমারের দ্বিতীয় পুত্র রামধন রায় বালিয়াপাড়া ছাড়িয়া জেলা নদীয়া থানা কুমারখালীর অধীন কালী গঙ্গা নদী তীরস্থ রায়-বাগুলাট গ্রামে বাস করেন। তাঁহার তিন পুত্র নবীন চন্দ্র, বিশ্বম্ভর ও কেশব চন্দ্র। নবীন চন্দ্রের পুত্র নলিনী কান্ত এবং এই বিশ্বম্ভর ও কেশবচন্দ্র অদ্যাপি ঐ রায় বাগুলাট গ্রামে বাস করিতেছেন।

বিশ্বম্ভর রায় "রায় বাহাদুর" এবং এম, বি, ই সি, আই, ই, উপাধিযুক্ত। নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী ইঁহাকে ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি দিয়াছেন; ইনি বহু বৎসর কৃষ্ণনগর মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান থাকিয়া তথায় জলের কল স্থাপন পূর্ব্বক কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকিয়া অনেক হিতকর কার্য্যের সহিত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও কালা জ্বর নিবারণ এবং স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের সমিতি সংস্থাপন করিয়া যশঃলাভ করিয়াছেন। নদীয়া জেলাবোর্ড সৃষ্টির সময় হইতে অর্থাৎ প্রায় ৪২ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি ঐ বোর্ডের মেম্বর আছেন এবং প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া তিনি নদীয়া জেলার গভর্ণমেণ্ট উকীল এবং দেশের ও সাধারণের প্রকৃত হিতাভিলাষী। সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণনগর সহরে বাস করিতে-ছেন। রামশঙ্কর হইতে তাঁহার বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র কবিরঞ্জন মহাশয়ের যশোহর খুলনার ইতিহাসে ২য় খণ্ডে বিশ্বম্ভর রায়ের প্রথম তিন পুত্র কুলজা, সুরজা ও শৈলজা রঞ্জনের নাম ভুলক্রমে বাদ গিয়াছে। কবিরঞ্জন মহাশয় বিশ্বম্ভর রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ইনি স্বজাতির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং জরাগ্রস্ত হইলেও নড়াইল হাটবাড়িয়া কায়স্থ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।" বগুড়া সহরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সভাপতি ছিলেন—কাকিনার রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন

রায়। তিনি দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে অপারগ হওয়ায় ঐ দিনে বিশ্বম্ভর রায় সভাপতি হইয়াছিলেন।

উক্ত রাম কান্তের তৃতীয় পুত্র রাম কুমারের পৌত্র কৃষ্ণলাল রায় মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় বহুদিন পুলিশ ইন্সপেক্টর থাকিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র বিহারী লাল শ্বশুরের সম্পত্তি পাইয়া পুত্রদ্বয় সহ জেলা নদীয়া থানা আলমডাঙ্গার অধীন কুমারী গ্রামে বাস করিতেছেন এবং তৃতীয় পুত্র করিমপুরের অধীন সুন্দরপুরে বাস করিতেছেন।

রাজ্যচ্যুত রাম নারায়ণের বংশধরগণ এইরূপে সম্প্রতি নিম্নলিখিত স্থানে বাস করিতেছেন। যথাঃ—বাগডুলী, কাকিনা, বালিয়াপাড়া, স্বরূপদহ, পাবনা সহর, কুমারী, ফরিদপুর গ্রাম, কুশবাড়ী, জগতাই রায় বাগুলাট, কৃষ্ণনগর সহর, সুন্দরপুর।

রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় M, B, Eর বংশাবলী যথা ঃ—১। শঙ্কর রাম (শৈলকুপাবাসী) ২। প্রতাপ। ৩। চিন্তা। ৪। চম্প বা চাঁপা নাগ। ৫। শিবনাগ রায়। ৬। কর্কট। ৭। সতী। ৮। বসুধারা। ৯ বিভা অপরীন্দ্র। ১০। শুক্লাম্বর (তস্য কনিষ্ঠ সহোদর শুভঙ্কর নাগপাড়া বাসী)। ১১। গরুড়ধ্বজ। ১২। কালিদাস (তস্য জ্যেষ্ঠ সহোদর ঘনশিব নাগ পাড়াবাসী)। ১৩। রাজা রাজবল্লভ (মুনসফ)। ১৪। গোবিন্দ. ১৫। রঘুনাথ রায় মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি এবং তাঁহার সহিত মানসিংহ সহ যুদ্ধে গতপ্রাণ। ১৬। রামনারায়ণ রায় (রাজ্যচ্যুত ও বাগডুলী বাসী ও তস্য কনিষ্ঠ সহোদর সন্তোষ নাগ পাড়াবাসী। ১৭। হরিরাম (তস্য কনিষ্ঠ সহোদর মধুরাম)। ১৮। চণ্ডীচরণ (বালিয়া পাড়া বাসী ও তস্য জ্যেষ্ঠ সহোদর কালীচরণ বাগডুলী ও মধ্যম সহোদর ভবানী চরণ ঘুড়কা বাসী)। ১৯। রামকান্ত (তস্য প্রথম অগ্রজ চন্দ্রনারায়ণ. দ্বিতীয় অগ্রজ কৃষ্ণদেব) তৃতীয় অগ্রজ কুঞ্জ। ২০। ব্রজকুমার। তস্য অগ্রজ

নন্দকুমার ও অনুজ রামকুমার। ২১। রামধন তস্য অগ্রজ বদনচন্দ্র ও অনুজ কৃষ্ণধন। ২২। রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় M. B. E. (তস্য অগ্রজ নবীনচন্দ্র ও অনুজ কেশবচন্দ্র) ২৩। কুলজারঞ্জন, সুরজা, শৈলজা, অবলা, ক্ষিতিশ, খগেশ ও রমেশ রঞ্জন (খগেশ মৃত) ২৪। সুরজা রঞ্জনের, পুত্র মানসরঞ্জন এবং শ্রীশৈলজা রঞ্জন। শৈলজা রঞ্জনের পুত্র কমলারঞ্জন বিশ্বম্ভর রায়ের অগ্রজ নবীনচন্দ্র রায়ের বংশে আরও দুই পুরুষ বৃদ্ধি হইয়াছে। যথা ঃ—নবীনের পুত্র নলিনীকান্ত এবং তস্য পুত্র ২৫ অবনীকান্ত এবং তস্য পুত্র ২৬ শিশির কুমার। বিশ্বম্ভর রায়ের কৃত নাগবংশ পাঠে কেহ কেহ মনে করেন যে, শিবনাগ রায় শঙ্কর রামের পুত্র, কিন্তু তাহা বুঝিবার ভুল ; কারণ তিনি লিখিয়াছেন শঙ্কর রামের বংশে শিবনাগের জন্ম, শিবনাগ যে শঙ্কর রামের পুত্র একথা তিনি কোনস্থানে লেখেন নাই। মাত্র শিবনাগ হইতেই ধারাবাহিক বংশাবলি দিয়াছিলেন, শিবনাগের পূর্ব্বের ৩ পুরুষ তিনি উল্লেখ করেন নাই।

উক্ত রাজ্যচ্যুত রাম নারায়ণের অনুজ সন্তোষ রায়ের বংশ সম্প্রতি নিম্নলিখিত স্থানে বাস করিতেছেন যথাঃ—

	গ্রাম	থানা	জেলা
১	ধাম নগর	কুমারখালী	নদীয়া
২	ঘুড়কা	রায়গঞ্জ	পাবনা
৩	ফতেউল্লাপুর	গোবিন্দ গঞ্জ	রংপুর
৪	ভবানীপুর (সুজানগর)	পাবনা	পাবনা
৫	সুজানগর	পাবনা	পাবনা
৬	পোতাজিয়া	সাহাজাতপুর	পাবনা
৭	রংপুর সহর	রংপুর	রংপুর
৮	নলছিয়া	রায়গঞ্জ	পাবনা

সন্তোষ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন জানকীনাথ রায়। তাঁহার সম্বন্ধে যদুনন্দন লিখিয়াছেন যথা ঃ—

"জানকী নাথ পত্র নবীশ এই বংশ জাত।
নানাবিধ বিদ্যাবন্ত নানা শাস্ত্র জ্ঞাত।
ঘোষ নবীশ বড় তাহা বাদসা জানিয়া
রাখিলেন দিল্লীশ্বর মুনসী গিরি দিয়া॥
বাদসার মুলুক পরে যাহার কলম।
এ হেন চাকুরী যোগ্য হয় কোনজন।

রাজা রাজবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র কেশব নাগের বংশধরগণ জেলা যশোহরের অধীন উদ্দি দড়ী ওরফে উদাস গ্রামে বাস করেন। তাঁহারা "উদাসের নাগ" বলিয়া পরিচিত। রাজা রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠতাত ঘনশিব নাগের বংশীয় রাম গোবিন্দনাগ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র রামগোপাল নাগ জেলা পাবনা থানা সাহাজাদপুর অধীনে গাড়াদহ গ্রামে ও চতুর্থ পুত্র মনিরাম নাগ জেলা ও থানা পাবনার অধীন রাধানগর গ্রামে বাস করেন রামগোপাল নাগের বংশধরগণ এইক্ষণে ঐ গাড়াদহ ও রাজশাহী সহরে বাস করিতেছেন। ঐ বংশের নিত্যানন্দ নাগ অতি গুণবান্, ধনবান ধার্ম্মিক ও দয়ার সাগর বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণও সম্পত্তিশালী ও সুখ্যাতিযুক্ত আছেন। ইহাঁরা সকলেই "গাড়াদহের নাগ" নামে সুপ্রসিদ্ধ। উক্ত রামগোপাল নাগ মহাশয়ের সহোদর মনীরাম নাগ জেলা ও থানা পাবনার অধীন রাধানগর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি জেলা রাজশাহীর থানা পুটীয়ার অধীন আড়ানী গ্রামে বাস করেন ও তাঁহার বংশধরগণ "আড়ানীর নাগ" বলিয়া খ্যাত আছেন। এই বংশধরগণ এইক্ষণে নিম্নলিখিত স্থানে আছেন ঃ—

গ্রাম	থানা	জেলা
আড়ানী	পুটীয়া	রাজশাহী

বহরমপুর	খাগড়া	মুর্শীদাবাদ
মহেন্দ্রপুর পার	কুমারখালী	নদীয়া
দয়ারামপুর ও পার		
বাগুলাট		

উপরোক্ত নাগ বংশধরগণ সকলেই "শৈলকুপার নাগ" বলিয়া সমাজে পরিচিত।

এইক্ষণে রাজা জটাধরের বংশাবলি লিখিত হইতেছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্কট শৈলকুপা রহিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান পাবনা জেলার অধীন শরগ্রামে বাস করিলেন ও সোণা বাজু পরগণার অধীশ্বর হইলেন। তদানীন্তন শরগ্রাম সমাজ প্রধান স্থান ছিল। জটাধরের পর হইতে সাত আট পুরুষ কিম্বা ৮।৯ পুরুষ গতে এই বংশের রাজা রূপনারায়ণ রায় বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি "নাগেন্দ্র" নামে বিখ্যাত ছিলেন।

যত্নন্দন লিখিয়াছেন যথা :—

সেই (জটাধরের) বংশোদ্ভব মধ্যে ছিল রূপ রায়।
যাহার মহিমা যশঃ অদ্যাপি ঘোষয়॥
নাগ মধ্যে রূপ রায় আর সব ধোড়া।
শৈলকুপার নাগ যেন বিঘতিয়া বোড়া॥
বিঘতি বোড়ার বিষ নীচ মুখে ধায়।
তাহার তুলনা নহে বলি শরগায়॥
শরগ্রামী নাগ মধ্যে নাগেন্দ্র ছাড়া।
আর যত নাগ তার ভাব কিন্তু বোড়া॥
একথা কহিলা মাত্র নিয়োগি গোপী রায়।
রূপ রায়ের ভগ্নীপতি সাক্ষী কৈল তায়॥

"বিঘত" অর্থ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ অর্থাৎ অর্দ্ধ হস্ত। "বিঘতিয়া

বোড়া” এক প্রকার সর্প, ইহা দীর্ঘে অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণের বেশী হয় না, কিন্তু ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। ইহারা কামড়াইবার সময় মুখ ও লেজ ঘুরাইয়া একত্র করে ও তৎপরে ছুটিয়া একেবারে মস্তকে পড়িয়া আঘাত করে। ইহাদের বিষ নীচ মুখে ধায় অর্থাৎ মস্তক হইতে নিম্নে শরীরের অন্যত্র প্রবেশ করে। ইহার ওঝা বা বিষ বৈদ্য নাই। অন্য সর্প শরীরের অন্যত্র কামড়ায় এবং ঐ বিষ ক্রমে উপরে ধরিবার কালে ওঝা তাহা নীচে নামাইয়া রোগীকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়। এজন্য বিঘতিয়া বোড়া নিশ্চয় প্রাণঘাতক বিষধর।

শৈলকুপার নাগকে তদ্রূপ বলিয়া তাঁহাদের সহিত নিয়োগী গোপীরায় শরগ্রামের নাগের তুলনা করেন নাই। তিনি শরগ্রামী নাগের নাগেন্দ্র রূপ রায়কে শরগ্রামী অন্যান্য নাগের সহিত তুলনা করিয়া তাহাদিগকে ধোড়া বা বোড়া ভাবযুক্ত অর্থাৎ বিষ দন্তহীন সর্প বলিয়াছেন।

রূপনারায়ণের রাজধানী “গয়েসের বাড়ী” নামক স্থানে ছিল। পূর্ব্বে ইহাকে “গয়াসুরের বাড়ী” বলিত। বর্ত্তমান নাম “গশোবাড়ী”। ইহা জেলা পাবনা থানা চুলাই অধীন আতাইকুলার নিকটবর্ত্তী। এই স্থানে রূপ রায় ভবানীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; তাঁহার বংশধর-গণ অদ্যাপি এখানে বাস করিতেছেন। কেহ কেহ রাজসাহীর অন্তর্গত মেদোবাড়ী গ্রামবাসী ও কেহ কেহ পূর্ব্বে পাবনা, মালঞ্চি ও অধুনা জেলা রংপুরের অধীন বদ্ধনকুটী গ্রামে বাস করিতেছেন। রাজা রূপনারায়ণ শৈলকুপার রাজা রঘুনাথ রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। জটাধরের বংশেও এই নিয়ম ছিল যে, জ্যেষ্ঠ রাজা হইয়া রাজ্যভোগকারী ও “রায়” উপাধিযুক্ত থাকিবেন এবং জ্ঞাতিগণ “নাগ” উপাধিতে অন্যত্র বাস করিবেন। রূপনারায়ণের পুত্রগণ রাজা মানসিংহের বিচারে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে “রায়” উপাধি বংশগত হইয়াছে। এই বংশের অধিকাংশই সুশিক্ষিত

ও উন্নত অবস্থায় আছেন। বংশাবলি রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় এম, বি, ই, মহাশয়ের কৃত "নাগ বংশে" প্রকাশ আছে।

জেলা রাজসাহী থানা সিংড়ার অধীন ডাঙ্গাপাড়ার নাগ মহাশয়গণ ও শরগ্রামের নাগ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ জয়হরি চৌধুরী মহাশয় ডাঙ্গাপাড়ায় প্রথম বাস করেন. কিন্তু জটাধরের বংশের সহিত তাঁহার সংযোগ পাওয়া যায় না। এই বংশধরগণ চৌধুরী উপাধিধারী. সম্পত্তিশালী, জ্ঞানবান্ ও গুণবান্। বহুকাল হইতে বংশ পরম্পরায় করণ গৌরব আছে এবং নির্ম্মল প্রধান কুলে তাঁহাদিগের দান গ্রহণ চলিয়া আসিতেছে। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ মধ্যে ইহাদিগের যথেষ্ট সমাদর আছে। এই বংশের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই এবং তাঁহারা যে "শরগ্রাম" নাগ বলে, তাহাও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। এই বংশের বংশাবলি উক্ত রায় বাহাদুরের প্রণীত "নাগবংশে" বিস্তৃতভাবে লেখা আছে। বংশধরগণ মধ্যে অধিকাংশ ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে এবং অনেকে জেলা রাজসাহী থানা সিংড়ার অধীন মাঝগ্রাম নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় জেলা রাজসাহীর নাটোর সহরে এবং তদনুজ প্রসিদ্ধ ডাক্তার চন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ও অযোধ্যা রামের পুত্র বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী কালীমোহন চৌধুরী মহাশয় রাজসাহী সহরে এবং মোহিনীমোহন চৌধুরীর পুত্র যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী মর্শিদাবাদ জেলার অধীন নিমতিতা গ্রামে, গৌরীশঙ্কর চৌধুরীর পুত্র যামিনীমোহন চৌধুরী জেলা রংপুরের অধীন রহমতপুর গ্রামে, গোপাল চন্দ্র চৌধুরীর পুত্র প্রসিদ্ধ মোক্তার জানকী শঙ্কর চৌধুরী রংপুর সহরে, স্বরূপচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র জমিদার নবদ্বীপচন্দ্র চৌধুরী জেলা নদীয়া থানা ভেড়ামারার অধীন ধরমপুর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধর অনেকেই পিত্রালয়ে আছেন।

জেলা ফরিদপুরের অধীন পাংশা গ্রামের নাগ মহাশয়গণ শরগ্রামের নাগ বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের "নাগ" উপাধি ও অনেক দলিল দস্তাবেজে রায় উপাধি দেখা যায়। জেলা নদীয়া থানা কমারখালীর অধীন জাবল রায়ে যে নাগ মহাশয়গণ আছেন, তাঁহারা ঐ পাংশার নাগের জ্ঞাতি বলেন, কিন্তু পাংশার নাগ তাহা জানেন না।

জেলা নদীয়া থানা কুমারখালীর অধীন খোকসা গ্রামস্থ নাগ মহাশয়গণ "সিমলিয়ার নিয়োগী" বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের উপাধি নাগ। এই তিন গ্রামের নাগ মহাশয়গণ "শর গ্রামের নাগ" বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু সংযোগ দেখাইতে পারেন না। ইহাদের বংশধরগণ বংশতরু রক্ষা করেন নাই। সুতরাং সংযোগ দেখান এখন অসম্ভব। তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগকে "শরগ্রামের নাগ" মনে করাই উচিত। বংশাবলি রায় বাহাদুরের প্রণীত "নাগ বংশে" আছে পাবনা সহরের নাগ মহাশয়গণের 'রায়" উপাধি আছে। ইঁহারাও "শরগ্রামের নাগ" বলিয়া পরিচিত আছেন, কিন্তু গশোবাড়ীর নাগ বংশের সহিত সংযোগ দেখাইতে পারেন না। বংশ তরু রক্ষিত না হওয়াই ইহার কারণ। বংশধরগণকে বিশ্বাস করাই উচিত। সমাজে এই সকল বংশের সমাদর দেখিতে পাই; এজন্য বংশধরগণের কথাই সত্য মনে করি। নরনীয়ার নাগ মহাশয়গণের ও ঐ কথা। বংশাবলি যতদূর পাওয়া গিয়াছে, রায় বাহাদুরের 'নাগ বংশে" লিপিবদ্ধ আছে।

হাবেলী বাসাবাটীর নাগ বংশ।

ইতিহাসে যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায় বাগের হাটের অন্তর্গত বাসাবাটীর নাগ বংশের আদি পুরুষ রাজা মিনকেতন রাঢ় দেশের অন্তর্গত দেবানন্দ গ্রামে বাস করিতেন। রাজা মিনকেতনের পুত্র রাজা জ্যোতিঃপ্রকাশ, তাঁহার পুত্র রাজা গুণেশচন্দ্র। রাজা গুণেশের পর তাঁহার বংশধরেরা রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ইঁহারা কোন্ দেশের রাজা ছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁহারা যে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা ছিলেন ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা গুণেশের পুত্র সদানন্দ, তৎপুত্র ভবানন্দ; ভবানন্দের পুত্রের নাম জগদানন্দ, জগদানন্দের পুত্রের নাম ভৈরব; ভৈরবের পুত্র রামচন্দ্র খাঁ বুদ্ধিমান ও প্রতিপত্তি শালী ব্যক্তি ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি সম্রাট আকবরের অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় স্বীয় পারদর্শিতার ফলে রাজ সরকার হইতে "খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন। বাংলা ৯৭৩ সালে রামচন্দ্র পুরুষোত্তম দর্শন করিতে গিয়া নাভিগয়ায় তীর্থ করিবার জন্য কিছুদিন অবস্থিতি করেন। রামচন্দ্রের পুত্র শিবানন্দ। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম গণেশচন্দ্র নাগ। গণেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নীলকণ্ঠ নাগ। এই নীলকণ্ঠ নাগই হুগলী জেলায় ত্রিবেণী চন্দনপুর হইতে বাংলা আন্দাজ ১১৪৮ সালে প্রথমতঃ হাবেলীর ভদ্র পাড়া নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় নানা কারণে বাসের অসুবিধা হওয়ায় যশোহর জেলায় রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত

বসন্তরায়ের কন্যা ভবানীর বংশধর কাড়াপাড়া নিবাসী মণিরাম রায়ের নিকট হইতে ১১৬০ সালে আন্দাজ ২০✓ বিঘা ভূমি বসতি করিবার জন্য বার্ষিক ১২২৷৵০ টাকা খাজনা দিবার সর্ত্তে একটী তালুকের বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই তালুকের ভূমি হাবেলী পরগণায় যে ৩৮ খানি গ্রাম আছে তাহার অধিকাংশ স্থানে বিশেষতঃ বাসাবাটীর প্রায় সমস্ত স্থানেই অবস্থিত। এই তালুক ৺নীলকণ্ঠ নাগ ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ রামানন্দ নাগের নামে অর্জ্জিত হয়। রামানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺ কামদেব নাগ মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কোনও সম্মানীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাতে তাহার প্রচুর অর্থাগম হইত এবং সম্মানও যথেষ্ট ছিল। ৺ কামদেব নাগ নথপুর নিবাসী কেশব ও কৃষ্ণরাম রায়ের নিকট হইতে খোস কোবলা দ্বারা খুলনা জেলার ১৬৭ নং ২২৭ নং তৌজীভুক্ত হুড়না ও তাহার পশ্চিমস্থ দিগরাজ তালুক খরিদ করেন। এই খরিদ বাংলা ১১৭৩ সালে হইয়াছিল। যে সময়ের কথা বলা হইল তখন নবাবের আমল কেবল অবসান হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকাল আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং দেশে চোর ডাকাত দস্যু ভয় খুবই ছিল। ৺ রামানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র নিধিরাম নাগ তীর চালনায় অসাধারণ ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন; কথিত আছে একবার নাগ মহাশয়দিগের ঐশ্বর্য্যের কথা অবগত হইয়া দস্যুরা রামানন্দ নাগের বাড়ী রাত্রিযোগে আক্রমণ করে। একা নিধিরামই তীর চালনা দ্বারা সমস্ত রাত্রি দস্যুগণের গতিরোধ করেন, কিন্তু একাকী কতক্ষণ লড়িবেন, দস্যুরা শেষরাত্রে তাঁহাকে অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করে। এই সকল দস্যুদিগের উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য ৺কামদেব নাগ মহাশয় নবাবের নিকট প্রার্থনা করেন। নবাব দয়াপরায়ণ হইয়া তাঁহাদিগকে কতকগুলি সশস্ত্র সৈন্য হাবেলী বাসাবাটীতে পাঠাইয়া দেন। এই সকল সৈন্যেরা

অনেক দস্যু ধৃত করিয়া শমন সদনে প্রেরণ করিবার পর এদেশে কিছুদিনের জন্য শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

নীলকণ্ঠের মধ্যমপুত্র গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র গদাধর নাগ কাড়াপাড়ার জমিদার বাড়ীতে কিছুকাল দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নীলকণ্ঠের ৪র্থ পুত্র দ্বিপচন্দ্র নাগের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোরাচাঁদ নাগ কিছুদিন ঐ কার্য্য করেন। এই গোরাচাঁদ নাগ ও ৺রামানন্দ নাগের পৌত্র স্বরূপ চন্দ্র নাগ এই বংশের বিশেষ খ্যাতিপন্ন ছিলেন। উভয়েই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সমদর্শী ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা এই নাগ বংশের অনেক বিষয় সম্পত্তির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। স্বরূপচন্দ্র নাগ ১২৫৭সালে সুন্দর বনের কমিশনারের নিকট হইতে টাটিপুলিয়া চক ৯৯ বৎসর মেয়াদে বন্দোবস্ত লইয়া তাঁহার বংশধরগণের ভোগদখলী সম্পত্তি ও প্রচুর আর্থিক উন্নতি সাধিত করিয়া গিয়াছেন। এই স্বরূপচন্দ্র ১২৬০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রকুমার নাগের হস্তে যাবতীয় বৈষয়িক কার্য্যের ভার পড়ে। তিনি স্বীয় চেষ্টায় চক টাটীপুলিয়ার উন্নতি সাধন করেন। এই সম্পত্তি হইতে প্রচুর অর্থলাভ করেন ও তদ্দ্বারা আরও কয়েকটী সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া মোট বৈষয়িক আয় বার্ষিক ৮০০৲ হইতে প্রায় ৪০,০০০৲ টাকা করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে ১০ বৎসর যাবৎ ৺কাশীধামে থাকিয়া ১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে তথায় লোকান্তর গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৯ বৎসর হইয়াছিল। চন্দ্রকুমার নাগের ৭ পুত্র ও এক কন্যা। তন্মধ্যে—জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলাল ও কন্যা সারদাসুন্দরী পিতামাতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ৺মথুরলাল নাগ ১২৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১২৮০ সালে ওকালতী পাশ করিয়া তিনি যশোহরের জেলা

কোর্টে ১২৯০ সাল পর্য্যন্ত ওকালতী করেন। পরে ১৮৮২ সালের নভেম্বর মাসে খুলনা স্বতন্ত্র জেলা হইলে ১৮৮৩ সাল হইতে খুলনার সবজজ আদালতে ওকালতী করেন। ১৮৮৭ সালে তাঁহার সহযোগী ও সুহৃদ সেনহাটী নিবাসী বাবু অম্বিকাচরণ সেনের সাহায্যে প্রধানতঃ সাধারণের উপকারের জন খুলনায় একটী লোন অফিস প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজীবন ঐ কোম্পানীর ডিরেক্টার ও শেষ কয়েক বৎসর উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলেন। মথুর বাবু অতিশয় অমায়িক লোক ছিলেন। অর্থ সামর্থ্য দিয়া পরের উপকার প্রবৃত্তি তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরুক ছিল। সামাজিকতা গুণে তিনি খুলনার সকলের অগ্রণী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কায়স্থ জাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। দেশে জলকষ্ট নিবারণ জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টিত ছিলেন; এমন কি মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে বলিতেন যেন তাঁহার শ্রাদ্ধে অল্প কিছু ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট টাকা (আন্দাজ ২০০০৲ টাকা) দ্বারা বাসাবাটী গ্রামে যেন একটী বড় রকমের জলাশয় খনন করা হয়।

তাঁহার পিতা ৺চন্দ্রকুমার নাগের শ্রাদ্ধে বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিলেও মথুর বাবু অন্যান্য ভ্রাতাদিগের মত লইয়া বাগেরহাট স্কুলের জন্য একটী বিস্তৃত হল করিবার ব্যয় বহন করেন। ৭১ বৎসর বয়সে ১৩১২ সালের মাঘমাসে একটী মোকদ্দমার সালাসী বিচার শেষ করিয়া বেলা ১টার সময়ে আহার করিতে করিতে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, আর তাঁহার চৈতন্য হইল না। বেলা ৪ টার সময় তিনি পরলোক গমন করেন।

মথুর বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ৺ব্রজলাল নাগের পুত্র শুকলাল নাগ এই বংশের গৌরব রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত। বর্ত্তমানে তিনি বাগেরহাটে লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাগের হাট কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর ও হাইস্কুল কমিটির মেম্বর এবং খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট

বোর্ডের একজন গণ্যমান্য সভ্য। এই জেলার জলকষ্ট নিবারণ, চিকিৎসালয় স্থাপন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যাবতীয় সৎকার্য্যে শুকলালের চেষ্টা প্রশংসনীয়। একবার তিনি হাবেলী পরগণা সমিতির সভাপতি হইয়া অনেক দেশহিতকর বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমিতিতে সামাজিক দলাদলি প্রবেশ করায় এই প্রস্তাবিত বিষয়ের অনেকগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। শুকলালের একমাত্র কন্যা "লাবণ্যপ্রভা" বিবাহের অল্পকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় এবং অন্য কোনও সন্তান সন্ততি না থাকায় নিজের সমস্ত মনপ্রাণ দেশের ও দশের উন্নতির জন্য সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ এই যে নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোনও বাধা বিঘ্ন তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না। বাগেরহাট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ২ বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি বৈষয়িক ও দেশের কার্য্যে মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছেন। শুকলাল নড়াইলের জমিদার ৺যোগেন্দ্রনাথ রায়ের দৌহিত্রীকে বিবাহ করেন। মথুর বাবুর অন্য ভ্রাতা ৺ভুবনবিহারী নাগের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রকুমার নাগ ওকালতি পাশ করিয়া ১৯০৮ সাল হইতে খুলনা জেলা কোর্টে ব্যবসা করিতেছেন।

সুরেন্দ্র পর পর কয়েকবার খুলনা মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন এবং ৩ বৎসর ভাইস্ চেয়ারম্যানের পদে থাকিয়া জেলার উন্নতি ও সৌষ্ঠব সাধন করিতেছেন। তিনি বাঘুটিয়া সাকিনের ৺হরিচরণ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন: কিন্তু কয়েক বৎসর হইল তিনি বিপত্নীক হইয়াছেন। পিতামাতা বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ সত্ত্বেও পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন নাই। এদেশে এরূপ বয়সে

বিপত্নীক হইলে প্রায় পুনরায় বিবাহ করিতে দেখা যায়, কিন্তু স্বরেন্দ্র কুমার তাহা না করিয়া পড়া শুনা খেলা ধূলা ও সময়ে সময়ে সুন্দরবনে শিকার লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। চন্দ্রকুমার নাগের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপলাল নাগ অনেকদিন যাবৎ খুলনায় বাড়ীঘর করিয়া বাস করিতেছেন তিনি মথুর বাবুর মৃত্যুর পর লোনকোম্পানীর ডিরেক্টার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। রূপলাল বাবুর দ্বিতীয় পুত্র সতীশচন্দ্র নাগ বি, এ পাশ করিয়া ব্যবসা করিতে-ছেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রমোহন ক্যাম্বেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া গয়া জেলার ডিষ্ট্রীক্ট বোডের অধীনে চাকুরী করিতেছেন। জনার্দ্দন নাগ ৺ চন্দ্রকুমার নাগের কনিষ্ঠ পুত্র। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্র নাগ (জুনিয়ার) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সম্মানের সহিত বি, এ, পাশ করিয় এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বি, এল, পাশ করিবার পর প্রথমতঃ বাগেরহাট পরে পিরোজপুরে কিছুদিন ওকালতি করিবার পর বর্ত্তমানে খুলনার জজ আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। ৺চন্দ্রকুমার নাগের মধ্যম ভ্রাতা ৺ কৈলাসকুমার নাগের পুত্র অশ্বিনী কুমার নাগ শ্রীধরপুর নিবাসী ৺ বিপিনবিহারী বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা জ্ঞানদাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। তাহার বর্ত্তমানে ৬টী পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্র কুমার নাগ কিছু দিন বাগেরহাটে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, বর্ত্তমানে বাগের হাট হাইস্কুলের সেক্রেটারী ও কলেজ কমিটীর মেম্বর। তৃতীয় পুত্র সমরেন্দ্র কুমার নাগ বি, এ পাশ করিয়া কণ্ট্রাক্টরী করিতেছেন ৺নীলকণ্ঠ নাগের ২য় ও ৫ম পুত্র অর্থাৎ গঙ্গাপ্রসাদ ও কামদেব নাগের বংশধর না থাকায় বর্ত্তমানে তাঁহার অপর ৩ পুত্রের বংশধরেরা বাসা-বাটী গ্রামে এবং খুলনায় বাস করিতেছেন। বিষয় বৈভবে নীলকণ্ঠ নাগের প্রথম পুত্র রামানন্দ নাগের বংশধরেরা প্রতিপত্তিশালী হইলেও তাঁহার ৪র্থ পুত্র দ্বিপচন্দ্র নাগের বংশধরেরা চিরদিনই বিদ্যাবুদ্ধিবলে

সমাজে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। দ্বিপচন্দ্র নাগ অনুমান ১১৬০ সালে নাভিগয়ায় তীর্থ করিবার পর গঙ্গাতীরে ১২০৫ সালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺ গোরাচাঁদ নাগ পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদার অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। দেশে কেহ কোনও আপদ বিপদে পতিত হইলে তিনি অর্থ সামর্থ্য দিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। তাঁহার পিতৃ বিয়োগকালে কনিষ্ঠ দুইটী ভ্রাতা, যুগল কিশোর ও বংশীবদন নাবালক ছিলেন, তিনি তাহাদিগের প্রতি জ্যেষ্ঠের ন্যায় সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন এবং নিজের একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র নাগের অকালে মৃত্যু হওয়ায় অর্থ সঞ্চয়ের দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া দেশে দুঃস্থ দরিদ্রদিগের সাহায্য করিতেন। বাগুটিয়া নিবাসী প্রধান মধ্যকুলীন ৺ যুগলকিশোর ঘোষের কন্যাকে (নড়াইলের বাবু রামরঞ্জন রায়ের মাতৃস্বসা) বিবাহ করেন। কিন্তু তদ্‌গর্ভজাত একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের অকালমৃত্যু হইলেও বহুদিন তিনি বিপত্নীক অবস্থায় ছিলেন। পরে ১২২৫ সালে প্রায় ৪৫ বৎসর বয়সে পারমধুদিয়া নিবাসী ৺ নিমচাঁদ ঘোষ চৌধুরীর কন্যা আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ৪ পুত্র ও ১ কন্যা জন্মে। পুত্রগণের মধ্যে অভয়াচরণ ১২৩০ সালের চৈত্রমাসে ভূমিষ্ঠ হন। ইনি পিতার নিকট কিছু পার্শী ও জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করেন। গোরাচাঁদ নাগ ১২৫৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পরলোক গমন করেন। তখন দ্বিতীয় পুত্র অম্বিকাচরণ ও কনিষ্ঠ পুত্র রাসবিহারী যথাক্রমে ১০ বৎসর ও ৫ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। গোরাচাঁদ নাগ পুত্রগণের জন্য বিশেষ কিছু সঞ্চিত ধন না রাখিয়া যাওয়ায় অভয়াচরণ, অম্বিকাচরণ ও রাসবিহারীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। কিন্তু জ্যেষ্ঠ অভয়াচরণ অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন। সামান্য পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হইতে যাহা কিছু আয় হইত তদ্দ্বারা কোনও

প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মাতা আনন্দময়ীও সংসারে প্রকৃত লক্ষ্মীস্বরূপিনী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও মিতব্যয়িতা গুণে সামান্য আয়ের দ্বারা বার মাসের তের পার্ব্বণ নির্ব্বাহ করিয়াও সমাজে প্রতিপত্তি ছিল। সরীকগণেরা তাঁহার নাবালক পুত্রদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য কত চেষ্টাই করিয়াছে, কিন্তু আনন্দময়ীর দেবদ্বিজের প্রতি ভক্তি ও বুদ্ধিমত্তা গুণে যতপ্রকার আপদ বিপদ সকলই প্রভাতকালীন মেঘের ন্যায় কাটিয়া গিয়াছিল। তাঁহাদিগের ৩টী ভাই বিশেষতঃ মধ্যম ও কনিষ্ঠ দেখিতে অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ২য় ও ৩য় পুত্রের অত্যন্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বহুদূর ও বহু ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। তবে তাঁহাদিগের শিক্ষার প্রতি এতই আগ্রহ ছিল যে, গৃহে থাকিয়াও শিক্ষকের বিনা সাহায্যেও তাঁহারা উভয় ভ্রাতা বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অনুমান ১২৭৩ সালে উত্তরাধিকারী সূত্রে হুড়্কা ও দিগ্বাজ্ তালুকের কিছু অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইতে লাগিল, কিন্তু হইলে কি হইবে? এই সম্পত্তির অংশ লইয়া শরীকগণের সহিত ১২৭৫ সাল হইতে ১৩০৫ সাল পর্য্যন্ত অনেক মামলা মোকদ্দমা বাধিয়া যাওয়ায় প্রত্যেক বৎসরই তাঁহাদিগের অনেক টাকা ব্যয় করিতে হইত। এতদঞ্চলে তখন কোনও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় না থাকায় বহু ব্যয়সাধ্য খুলনা বা যশোহর থাকিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করা তাহাদিগের অবস্থায় কুলাইল না। একারণ মামলা মোকদ্দমা রক্ষার নিমিত্ত গোরাচাঁদ নাগের মধ্যম পুত্র অম্বিকাচরণ নাগ যশোহর, খুলনা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া ঐ সকল মোকদ্দমার তদ্বির করিতেন। এদিকে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাসবিহারী নাগ ঘরে বসিয়া বহু বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং অনেক বিখ্যাত কবির রচনা অনর্গল মুখে মুখে

আবৃত্তি করিতে পারিতেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার সঙ্গীত বিদ্যায়ও অধিকার হইয়াছিল। সুযোগ ও অর্থাভাবে রাসবিহারী ও অম্বিকাচরণ ইংরাজী ভাষায় লিখিতে বা পড়িতে না পারিলেও তাঁহাদিগগের বংশীয়েরা পাশ্চাত্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবে এ আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মনে সদাসর্ব্বদা জাগরুক ছিল। "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়" এই মহাবাক্য তাহাদের জীবন অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। ইংরাজী ১৮৬৩ সালে বাগেরহাট ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটী মাইনর স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রায় ৮বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭১ সালে বাগেরহাট মুন্সেফ কোর্ট স্থাপিত হইলে হুগলী জেলান্তর্গত দাসপুর গ্রামনিবাসী ৺রামচরণ বসু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া বাগেরহাট আসেন। তখন খুলনা হইতে উকিল মোক্তার বাগেরহাটে স্থায়ী বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ব্যবসা করিতে থাকেন। এই বাবু রামচরণ বসুই চেষ্টা করিয়া ১৮৭৭ সালে বাগেরহাটের মধ্য ইংরাজী স্কুলটী এণ্ট্রান্স স্কুলে উন্নীত করেন। সেই সময় হইতে এতদঞ্চলের লোকদিগের ইংরাজী শিক্ষার সুবিধা হইয়া গেল। এই স্কুল প্রথমতঃ স্থানীয় লোকের প্রদত্ত চাঁদা ও এককালীন দানের উপরই নির্ভর করিত। ৺চন্দ্রকুমার ও ৺অম্বিকাচরণ নাগ ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই এককালীন দান ব্যতীত মাসে মাসে চাঁদা দিয়া স্কুলটী রক্ষা করিতেন। স্কুলের স্থানটী কাড়াপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার ৺মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী দান করেন। ইহাতে দশানি, বাসাবাটী, প্রভৃতি স্কুলের বালকগণের ইংরাজী শিক্ষার পথ সুগম হইয়া গেল। রাসবিহারী নাগ ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যশোহর সদর মহকুমার নিকটবর্ত্তী প্রধান কুলীনের স্থান জঙ্গলবাধাল সাকিনের ৺উগ্রকণ্ঠ বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা সুধাময়ীকে

বিবাহ করেন। তখন পর্য্যন্ত ৺রাসবিহারীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হয় নাই। হুড়কাদিগরাজের যে সামান্য কিছু আয় ছিল, তদ্দ্বারা শরীকগণের সহিত মামলা মোকদ্দমা ও পারিবারিক নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিতেই খরচ হইয়া যাইত। রাসবিহারী বাঙ্গালা ভাষার আজীবন সেবক ছিলেন। ইহা ব্যতীত অবসর সময়ে সঙ্গীত বিদ্যারও আলোচনা করিতেন। ১২৮৩ সালে বাগেরহাটের উকিল মোক্তারগণ একত্রে একটা সখের থিয়েটার পার্টি করিয়া "হরিশচন্দ্র" "সীতার বনবাস" ইত্যাদি নাটক অভিনয় করিতেন। রাসবিহারী নাগ তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

তাহার প্রথম পুত্র চারুচন্দ্র নাগ, এম্, এ, বি, এল, বাঙ্গালা ১২৭৮ সালের চৈত্রমাসের ২৭শে রবিবার রাত্রি ১২টার সময়ে বাসাবাটী গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। ৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করেন; কিন্তু ছেলেবেলায় বড়ই রুগ্ন থাকায় অনেক সময়েই পাঠশালায় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। সে সময়ে বাটী থাকিয়াই পিতার নিকট তাহার নির্দ্দেশমত লেখাপড়া করিতেন। ৬ বৎসর বয়সের সময় যখন চারুচন্দ্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণ পরিচয়" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়িতেন তখন পিতা রাসবিহারী গ্রন্থকার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও মহানুভবতার বিষয়ে অনেক সময় পুত্রের নিকট বর্ণনা করিতেন। তাহা শুনিয়া বালক চারুচন্দ্রের বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয় এবং বড় হইয়া কলিকাতায় যাইতে পারিলে তাঁহার দর্শন লাভ ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করিতেন। ৫ বৎসর হইতে ৯ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া ১৮৮১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি বাগেরহাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। রাসবিহারী

ছেলেকে স্কুলে পাঠাইয়া নিশ্চিত থাকিতেন না; শিক্ষকগণের নিকট সময়ে সময়ে গোপনে অনুসন্ধান করিতেন—ছেলে পড়াশুনায় রীতিমত মনোযোগ দেয় কিনা। ফলে এই হইয়াছিল যে,চারুচন্দ্র প্রত্যেক বৎসরই বাৎসরিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া প্রথম পুরস্কার পাইতে লাগিল। এইভাবে Entrance পরীক্ষার পাঠ্য শেষ করিয়া ১৮৯০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য বরিশালে যান। বাগেরহাট স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ৺বিহারীলাল রায় B. A. চারুচন্দ্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি বুঝিলেন বাগেরহাট স্কুলে চারুচন্দ্রের সমকক্ষ ছাত্র না থাকায় তাহার নিজের শিক্ষা বিষয়ে দোষগুলি বুঝিবার শক্তি হয় নাই। একারণ পরীক্ষার ১মাস পূর্ব্বে চারুচন্দ্রের পিতাকে বলিয়া বিহারী বাব একখানি চিঠি দ্বারা অশ্বিনী বাবুর নিকট পরিচিত হইবার জন্য তাহার প্রিয় ছাত্র চারুচন্দ্রকে বরিশালে প্রেরণ করেন। তথায় গিয়া ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্রগণের সহিত পঠন বিষয়ের আলোচনায় নিজের অকৃতীত্ব বুঝিয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে থাকেন। বিহারী বাবুর চিঠি দ্বারায় বরিশালের নেতা স্বনামখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্ত, এম, এ, বি, এল, এর সহিত চারুচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় হয়। অশ্বিনী বাবু অনেক সময়ে চারুচন্দ্রের শরীর ও পড়া শুনার খোজ খবর লইতেন। যাহা হউক চারুচন্দ্র যথাসময়ে Entrance পরীক্ষা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন—তখন তিনি পরীক্ষার সংবাদ বাহির হওয়া পর্য্যন্ত তাহার আবাল্য সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস, বি, এল, এর সহিত একত্রে F. A. পরীক্ষায় অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করেন এবং যথাসময়ে অর্থাৎ যে মাসে পরীক্ষার সংবাদ বাহির হইলে পিতা রাসবিহারী পুত্রকে কলেজে ভর্ত্তি করিবার জন্য ১২৯৭ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতায় লইয়া যান। তথায় প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুদিন

অধ্যয়ন করিতে থাকেন। চারুচন্দ্র প্রেসিডেন্সি বিভাগে গণিত শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইলেন এবং তৎকালীন বাগেরহাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ৺শ্রীনাথ গুপ্ত প্রদত্ত রৌপ্য পদক ও দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল, বি, এ, প্রদত্ত কতকগুলি পুস্তক পারিতোষিক পাইবার যোগ্য হইলেন। বৃত্তি সংবাদ বাহির হইলে বাবু (পরে স্যার) স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চারুচন্দ্রকে রিপণ কলেজে রাখিয়া পড়াইবার জন্য চারুচন্দ্রের মাতুল রিপণ কলেজের শিক্ষক শুকলাল বসুকে ধরিলেন। কাজেই বাধ্য হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিয়া চারুচন্দ্রকে রিপণ কলেজেই F. A. পড়িতে হইল।

তখন রিপণ কলেজে সিনিয়ার ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৺জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, ৺শ্যামাপ্রসন্ন মজুমদার, স্যার সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন। অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন, ৺বীরেশ্বর মিত্র, বিজ্ঞান পড়াইতেন ৺গোবিন্দচন্দ্র দাশ, ইতিহাস পড়াইতেন ৺গিরিশ চন্দ্র মিত্র, সংস্কৃত পড়াইতেন বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও মৃত উমাচরণ তর্করত্ন। F. A. classএ তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ২০০ শতেরও উপর ছাত্র ছিল। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষায় ফল দেখিয়া জানকী বাবু চারুচন্দ্রকে ও তাহার সহাধ্যায়ী বাবু হেমচন্দ্র সরকারকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, ইংরাজী সাহিত্যে কাহারও কাগজ দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হয়েন নাই। তবে ইহা বলিলাম এই ২টী ছাত্রকে চেষ্টা করিলে মানুষ করা যাইতে পারে। ইংরাজী ভাষায় চারুচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ থাকায় Senior professor আশুবাবু তাঁহাকে "My scholar friend" সম্বোধনে তাঁহার আসনের কাছে চারুকে বসাইতেন। বাবু বীরেশ্বর মিত্র গণিত শাস্ত্রে ১৮৬৩ সালে এম, এ পাশ করিয়া বহুকাল কৃষ্ণনগর কলেজ অধ্যাপকতা করেন। শেষ বয়সে পেন্সন

লইয়া রিপণ কলেজে গণিতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। এক দিবস বীজ গণিতের একটী কঠিন অঙ্ক কষিতে যাইয়া বীরেশ্বর বাবু board এর নিকট কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাড়াইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া চারুচন্দ্র তাঁহার সহাধ্যায়ী বর্ত্তমান কলিকাতার অন্যতম প্রধান ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসুকে বলেন তাঁহার (চারুর) লজ্জা করে, নতুবা তিনি বোর্ডে গিয়া অঙ্কটা কষিয়া দিতেন। বীরেশ্বর বাবুকে যেমন এই কথা জানান হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ চারুকে বোর্ডের কাছে ডাকিয়া অঙ্কটী কষিতে বলিলেন। চারুচন্দ্র স্বাভাবিক নম্রভাব ও নম্র প্রকৃতির লোক, একারণ কম্পিত হস্তে ৫ মিনিটের মধ্যে তিনি অঙ্কটা কষিয়া দিলেন। ক্লাশের ২০০ ছাত্র অবাক্ হইয়া দেখিল। তদবধি যখনই বীরেশ্বর বাবুর কোন অঙ্ক কষিতে ভাবিতে হইত অথবা সহজে পারিয়া উঠিতেন না তখনই তিনি চারুচন্দ্রকে ডাকিয়া অঙ্ক কষাইয়া লইতেন। ইহাতে সহাধ্যায়ী ছাত্রগণ একদিন চারুকে গণিত শাস্ত্রের Senior professor বলিয়া বিদ্রূপ করায় বীরেশ্বর বাবু ক্লাসে দাড়াইয়া গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, কালীপদকে (K P. Bose) পড়াইয়া আমি যে আনন্দ পাইয়াছি, এরূপ ছাত্রকে পড়াইয়া বহুদিন পরে সেই আনন্দ পাইতেছি। এই প্রশংসাবাদ চারুচন্দ্রের অন্য বিষয়ে অধ্যয়নের বিশেষ অন্তরায় হইল। অন্যান্য ছাত্রগণের মধ্যে চারুচন্দ্রের নাম প্রচার হওয়ায় বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সিটি, মেট্রোপলিটন, বঙ্গবাসী এমন কি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতেও ছাত্রেরা কঠিন কঠিন অঙ্ক তাঁহার দ্বারা কষাইয়া লইতেন। ইংরাজী, সংস্কৃত ও ইতিহাসের Lecture এর সময়েও চারুচন্দ্রকে অঙ্ক কষিয়া কাটাইতে হইত। যখন এফ, এ পরীক্ষার ফী জমা দেওয়া হয় তখন সমস্ত কলেজের ছাত্রেরা মনে করিয়াছিলেন, অঙ্ক শাস্ত্রের Duff scholarship সে বারে অন্য কোনও ছাত্র পাইবে না; উহা চারুচন্দ্রেরই প্রাপ্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র দেখিয়া

চারুচন্দ্রের মনে মনে আশা হইল ৩ ঘণ্টা স্থলে তিনি ২ ঘণ্টা মধ্যেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিয়া Paper ফেরত দিবেন। ফলে তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া অনেক অঙ্ক উত্তরে ভুল হইয়া গেল, সুতরাং চারুচন্দ্র আশানুরূপ যোগ্যতা দেখাইতে পারিলেন না, ইংরাজী অনেক পুস্তক অপঠিত রহিয়া গেল। সুতরাং F. A. পরীক্ষায় ফল সন্তোষজনক না হওয়ায় তিনি কোনও বৃত্তি পাইলেন না কেবল বিজ্ঞান শাস্ত্রে মোট সংখ্যা ৮০ মধ্যে ৭১ পাইলেন। যখন B. A পড়িতে লাগিলেন তখন ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরামর্শে ও ৺জানকিনাথ ভট্টাচার্য্য ও বর্ত্তমান ভাইস্ চান্সেলার বাবু যদুনাথ সরকারের আগ্রহে চারুচন্দ্র ইংরাজী ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে অনার্স লইয়া B. A. পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ২টী কঠিন বিষয়ে অনার্স লইয়া পড়িতে থাকায় বিশেষতঃ পিতার কঠিন পীড়া হেতু ১৮৯৪ সালে পরীক্ষার ২৪ দিন পূর্ব্বে পিতার মৃত্যু হওয়ায় নিজের গুরুতর মানসিক পরিশ্রম বশতঃ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। অকালে চারুচন্দ্র ও কয়েকটি নাবালক পুত্র রাখিয়া পিতার মৃত্যু হওয়ায় আকাশ ভাঙ্গিয়া তাঁহার মস্তকে পড়িল। পিতা রাসবিহারী নাগের ১৩০০ সালের ২৫শে মাঘ ৫২ বৎসর বয়সে গঙ্গাপ্রাপ্তি হওয়ায় পিতার মৃত্যু শয্যায় উপদেশক্রমে ১৩০১ সালের ১২ই বৈশাখ কৃষ্ণনগরের শ্রেষ্ঠ উকীল রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার বসুর খুল্লতাত ভ্রাতা বিভুদা শঙ্কর বসু মহাশয়ের একমাত্র কন্যা প্রিয়বালাকে বিবাহ করেন। এই পরিবারের সহিত হাইকোর্টের জজ ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। এই সূত্রে তিনিও চারুচন্দ্রকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন এবং আশুবাবুর মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই স্নেহ অক্ষুণ্ণ ছিল। অনেক সময়ে একত্রে একপাত্রে বসিয়া তাঁহারা খাবারাদি খাইতেন। তাঁহার সহিত যখনই চারুচন্দ্রের আলাপ হইত, তিনি হাইকোর্টে না আসায়

বিশেষ ভুল করিয়াছেন একথা সর্ব্বদাই বলিতেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু কষ্ট হইবে চারুচন্দ্র আশুবাবুকে এই উত্তর দিয়া নিরস্ত করিতেন। সিটি কলেজের বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক ৺রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চারুচন্দ্রের শ্বশুর ও বঙ্কুবিহারীর বসুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্বনামধন্য, উদার ও বন্ধপ্রাণ ৺উমেশচন্দ্র দত্ত সাগরদাড়ীর দত্তদিগের দূর জ্ঞাতি হইলেও নানা কারণে এই পরিবারের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। এ কারণ উমেশবাবুও চারুচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সিটীকলেজ হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনার্স পাইয়া তিনি B. A পাশ করেন এবং স্যার আলেকজণ্ডার মারের প্রদত্ত মেডেল প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত ত্রৈলক্যনাথ বন্দোপাধ্যায় ও মিঃ গ্রিফিথসের সহিত সিটী কলেজের কর্তৃপক্ষের বিশেষ কারণে মনোমালিন্য চলিতে থাকে। এ কারণ চারুচন্দ্র Woodrow Scholarship পাইবার অধিকারী হইলেও তাঁহাকে তাহা না দিয়া নিতান্ত অন্যায়ভাবে General Assemblyর অন্য একটী ছাত্রকে উহা প্রদত্ত হইল। আশুবাবু এজন্য চারুচন্দ্রকে আইন আদালতে নালিশ করিবার জন্য পরামর্শ দেন। পাঠ্যাবস্থায় মামলা মোকদ্দমা করিতে হইলে পড়াশুনার ক্ষতি হইবে বিবেচনায় তাহা করা হইল না। চারুচন্দ্র বিজ্ঞানশাস্ত্রে M. A. পড়িবার জন্য Presidency Collegeএ ১৮৯৫ সালের july মাসে ভর্ত্তি হইলেন; ভর্ত্তি হইতে প্রায় ১০।১২ দিন বিলম্ব হওয়ায় অধ্যাপক মিঃ Githiland Deiferetntial calculus পুস্তকখানি প্রায় শেষ করিয়াছিলেন. এমন সময়ে নূতন একটী ছাত্র অসময়ে ভর্ত্তি হওয়ায় সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং চারুচন্দ্রকে Chemistry classএ যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। চারুচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া সে দিবস ক্লাস ত্যাগ করিয়া আসিয়া দোকান হইতে ঐ পুস্তক খরিদ করিয়া তাঁহার বাসায় আসেন। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প

করেন অধ্যাপককে পর দিবস বুঝাইবেন যে তিনিও অন্যান্য ছাত্রাপেক্ষা কোনও অংশে অনুপযুক্ত নহেন। পরদিন বেলা ১১টার সময়ে চারু-চন্দ্রকে খাতা পেন্সিল লইয়া যেমন ক্লাসে বসিতে দেখিলেন অধ্যাপক অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বাহির করিবার জন্য কিছু বলিলেন. তাহার পূর্ব্বেই চারুচন্দ্র বলিলেন তিনি calculus শিখিয়াছেন। তখন সাহেব তাঁহাকে বোর্ডের নিকট ডাকিয়া লইয়া ৩।৪টা অঙ্ক কসিতে দিলেন। চারুচন্দ্র সমস্তগুলি কষিয়া দেওয়ায় অধ্যাপক তদবধি তাঁহাকে বিশেষভাবে ভালবাসিতেন। এই সময়ে তাঁহার সতীর্থ ছিলেন ডাঃ শরৎ-চন্দ্র বশাক, বাবু অপূর্ব্ব কৃষ্ণমিত্র (মজঃফরপুরের উকিল) সব জজ রসিকমোহন ভট্টাচার্য্য, বাবু নিবারণচন্দ্র রায় (Scottish church college এর অধ্যাপক) ইঁহারা সকলেই চারুচন্দ্রকে ভালবাসিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে খুবই সদ্ভাব ছিল। Practical subject-পড়াইতেন ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু। কিন্তু চারুচন্দ্রের এই বিষয়ে তত মনো-যোগ ছিল না; তিনি Theoretical portion পড়িতেই অধিকতর মনো-যোগী ছিলেন; বিশেষতঃ ১৮৯৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে তাঁহার স্ত্রীর অন্তঃসত্বাবস্থায় খুবই পীড়া হওয়ায় ইচ্ছাসত্ত্বেও পরীক্ষার পূর্ব্বে ৩মাস যাবৎ তিনি পাঠ্য পুস্তকের সহিত মধ্যে মধ্যে দেখাশুনা করিতেন মাত্র। পড়াশুনা সুবিধামত হইত না, Practical classএ আদৌ যাইতেন না, Mr. Githilandএর আশা ছিল চারুচন্দ্র বিজ্ঞানে First class পাইবেন, কিন্তু তাহা হইল না। Practical paper এর পরীক্ষক Mr. Macdonald তাঁহাকে এক পেপারে আদৌ নম্বর না দেওয়া সত্ত্বেও চারুচন্দ্র অপর পরীক্ষক Mr. John Ellot সাহেবের নিকট এত অধিক সংখ্যক নম্বর Theoretical Subjectএ পাইলেন যে তাহার জোরেই তিনি পাশ করিলেন। বাগেরহাট সবডিভিজনের এলাকার মধ্যে চারুচন্দ্রই প্রথম M A উপাধি প্রাপ্ত হন। M A পাশ করিবার পর

কিছুদিনের জন্য সিটি কলেজের রাজেন্দ্র বসু অবসর গ্রহণ করায় তৎপদে অস্থায়ীভাবে চারুচন্দ্র নিযুক্ত হন। চারুচন্দ্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইলেও সময়ে সময়ে তাহাকে তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের শ্রেণীতে গণিতের lecture দিতে হইত। পরে কিছুদিন Bethune college এ গণিতের অধ্যাপক পদে জাষ্টিস্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে কার্য্য করিতে বলেন। ১৮৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে M. A পাশ করিবার পর ১৮৯৭ সালে মাত্র ৩ মাস পড়িয়া ডাঃ যদুনাথ কাঞ্জিলাল, মিঃ প্রবোধচন্দ্র বসু ও জাষ্টিস মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত একই বৎসর বি, এল্ পাশ করেন। বি, এল্ পাশ করিবার পর চারুচন্দ্র ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের Articled clerk হইবার জন্য তাহাকে বিশেষভাবে ধরিয়া বসেন। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ তাহার সেরেস্তায় কাহাকেও Articled clerk রাখিবার নিয়ম রহিত করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান জজ স্যার-সি, সি ঘোষকেও তাঁহার পিতা দেবেন্দ্র বাবুর অনুরোধ সত্ত্বেও রাখেন নাই ইত্যাদি বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন এবং পরামর্শ দিলেন মফঃস্বল কোর্টে ৪বৎসর Practice করিবার পর High court এ আসিলে বিশেষ সুবিধা হইবে। তখন অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে চারুচন্দ্র যশোহর কোর্টে কয়েকমাস থাকিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। তখন ঐ স্থানের প্রধান উকিল বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ (ছোট) মহাশয়ের সেরেস্তায় কার্য্য শিক্ষা করিতে থাকেন। ছোট উমেশ বাবু চারুচন্দ্রকে খুলনা যাইতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে ১৮৯৮ সালের আগষ্টমাসে খুলনার কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। মাঝে ৯ মাস বাটীতে পীড়িত অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় ১৯০০সাল হইতে ১৯২৭সাল পর্য্যন্ত তথায় ব্যবসা করিতেছেন। ওকালতি দ্বারা আর্থিক উন্নতি আশানুরূপ না হইলেও তাঁহার অপর কনিষ্ঠ ৩টী সহোদরকে উপযুক্ত রূপে শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। চারুচন্দ্রের স্নেহময়ী মাতা সর্ব্বদা

তাহাকে বলিতেন "তোমার পিতৃহীন ভ্রাতাগুলিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া তোমার প্রধান কর্ত্তব্য, এটী যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।" ভগবানের কৃপায় তাঁহার সহোদর চারুচন্দ্রের ঐকান্তিক যত্নে মধ্যম ভ্রাতা কিরণচন্দ্র বসু (জন্ম ১২৮৫) ইংরাজী ১৯০৫ সালে ওকালতি পাশ করিয়া বাগের হাট কোর্টের শ্রেষ্ঠ উকীল হইয়াছেন। ইনি বাগেরহাট কলেজের Trustee, বাগেরহাট স্কুল কমিটির একজন মেম্বর ও স্থানীয় Bar Libraryর Secretary হইয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য চালাইতেছেন। তৃতীয় ভ্রাতা সতীশচন্দ্র (জন্ম ১২৯৫) ইংরাজী ১৯২০ সালে B. L. পাশ করিয়া বাগেরহাটে ওকালতি করিতেছেন। কনিষ্ঠ সহোদর অপূর্ব্বচন্দ্র (জন্ম ১২৯৮) ইংরাজী ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সুখ্যাতির সহিত M. Sc পাশ করিয়া দৌলতপুর কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়াছেন। চারুচন্দ্র ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত খুলনা লোন কোম্পানীর ডিরেক্টার ও ১৫বৎসর যাবৎ উহার Assistant Secretary ও ছিলেন। ১৯১৭ সালে খুলনায় যে কায়স্থ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরোক্ষভাবে কায়স্থ সমাজের দুঃস্থ ও উপায়হীন ব্যক্তিগণের আর্থিক সাহায্য হইতেছে, উহারও একজন Director Originator। চারুচন্দ্র খুলনায় তৃতীয়বার বাগেরহাটে যে জেলাসমিতি হইয়াছিল তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে সহরের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

চারুচন্দ্র হাবেলী পরগণা সমিতির একজন সভ্য এবং কলেদাইড গ্রামে যে বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি হইয়া বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করেন। উহাও সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বাগেরহাট কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি অন্যান্য কর্ম্মীর সহিত ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ চেষ্টা করেন। দৌলৎপুর কলেজের প্রধান

উদ্‌যোক্তা বাবু ব্রজলাল শাস্ত্রী M. A., B.L. চারুচন্দ্রের সহপাঠী এবং একজন বাল্যবন্ধু। তাঁহারা প্রথমতঃ দৌলৎপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা কালে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে একযোগে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনে চারুচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ আছে। এণ্ট্রান্স স্কুলে তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে তাঁহার সহপাঠী খুলনার উকীল বাবু শরৎচন্দ্র দাস, বি, এল,-এর সহিত অনেক সময়ে রাজনীতির আলোচনা হইত। তিনি Provincial Conference উপলক্ষে রংপুর, বহরমপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে delegate হইয়া গিয়াছেন। ওকালতি কার্য্যে চারুচন্দ্রের মন কোনও দিনই বসে নাই। প্রথম প্রথম তাহার ব্যবসায়ে খুবই যত্ন ছিল, কিন্তু দেখিলেন ব্যবসায়ে মফঃস্বলে উন্নতিলাভ করিতে হইলে আইনে গভীর জ্ঞান যতটা থাকুক বা না থাকুক বাহিরের চটক বেশী থাকা আবশ্যক, অনেক ব্যক্তি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াও এ ব্যবসায়ে শুধু বাহির চটকের জন্য উন্নতি-লাভ করে। চারুচন্দ্রের ছেলেবেলা হইতে সাজসজ্জা, বেশী বাজে কথা বলা, বাহিরের চাকচিক্যের প্রীতি কিংবা হাকিম আমলার খোষামোদ করা প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল, এজন্য আইনে তাঁহার গভীর জ্ঞান থাকা সত্বেও ওকালতি ব্যবসায়ে প্রসার আশানুরূপ হয় নাই। বঙ্গ-বিচ্ছেদ হইলে তিনি "খুলনাবাসী" পত্রিকার সম্পাদক স্বরূপ যে সকল সারগর্ভ প্রতিবাদ ১৯০৫।১৯০৬ সালে লিখিতেন, তাহাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আহম্মদ সাহেব জোরপূর্ব্বক ঐ পত্রের সম্পাদকের কার্য্য হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া আনেন। চারুচন্দ্র ঐ পদ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই সহঃ সম্পাদক বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন। সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লেখার প্রবৃত্তি চারু-চন্দ্রের বরাবরই আছে। ১৯২৫ সালের জুন মাস হইতে ইনি "খুলনা" পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছেন। খুলনা B. K. Union school লইয়া

মেম্বারগণের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় খুলনা কাগজে সময়ে সময়ে ইহার তীব্র আলোচনা বাহির হইত। ১৩৩৩ সালের ২রা আষাঢ় সংখ্যার কাগজে স্কুলের Assistant secretary স্কুলের ইমারতের মালমশলা রসিদ দিয়া হেড মাষ্টারের নিকট হইতে লইয়া তাহা তাঁহার নিজের দালানে ব্যবহার করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া এই বিষয়ের তীব্র আলোচনা পত্রিকাস্থ করায় স্কুলের Assistant secretary চারুচন্দ্রের বিরুদ্ধে ও স্বত্বাধিকারী বাবু অঘোরনাথ রায়ের বিরুদ্ধে খুলনা কোর্টে মানহানির মোকদ্দমা করেন। এই মোকদ্দমা কিছুদিন চালাইবার পর আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যায়; কিন্তু এই মোকদ্দমার সময়ে চারুচন্দ্রের মনে আদৌ ভীতি উপস্থিত হয় নাই। তিনি অচল অটলভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে থাকেন। পিতা রাসবিহারী নাগ মহাশয়ও এ বিষয়ে পুত্রকে বিবেচনা পূর্ব্বক উপদেশ দিতেন। একবার পিতা বাসাবাটীর কোনও প্রজাকে দমন করিবার জন্য একটী বক্র পন্থা অবলম্বন করেন। পুত্র চারুচন্দ্র জানিতে পারিয়া পিতাকে নিষেধ করেন। এই সূত্রে পিতাপুত্রে একটু মনোমালিন্য হয়। পুত্র পিতার তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হইয়া ৩ দিবস অনবরত অন্তরালে কাঁদিয়াছিলেন। পরিশেষে মাতা সুধামুখী মধ্যস্থ থাকিয়া এ বিবাদ মিটাইয়া দেন। চারুচন্দ্রের শ্বশ্রূঠাকরাণী ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" রচয়িত্রী মানকুমারী বসু স্বীয় জননীর মৃত্যুতে ১৩২৫ সালে বিপন্ন হইয়া পড়িলে গভর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার একটী পেন্সনের ব্যবস্থার জন্য আবেদন করেন এবং এই উপলক্ষে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণকে বিশেষভাবে ধরিয়া পড়েন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে Literary pension এর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার "শুভ সাধনা" বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য

তালিকাভুক্ত করিবার জন্য চারুচন্দ্র, ৺রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, ৺রামেন্দ্রসুন্দর, ত্রিবেদী, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুরের নিকট অনেকবার গিয়াছেন। পরিশেষে প্রধানতঃ স্যার আশুতোষের চেষ্টাতেই উহা প্রথমতঃ I. A. পরে Matric পরীক্ষার পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে। চারুচন্দ্র খুলনা বালিকা-বিদ্যালয়ের একজন উদ্যোগী; বহুদিন স্কুলের Managing committeeর মেম্বর ও ৪ বৎসর যাবৎ উহার সম্পাদক ছিলেন।

চারুচন্দ্রের ৭১ বৎসর বয়স্কা জননী এখনও জীবিতা থাকিয়া প্রৌঢ়ের ন্যায় বৃহৎ সংসারের কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল। গ্রামে কোনও দুঃস্থ লোক উপস্থিত হইলে হাতে যাহা কিছু থাকে, এমন কি অনেক সময়ে পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলেন। তিনি পুত্রগণের প্রতি এই আজ্ঞা দিয়া রাখিয়াছেন যেন কোন অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তি তাঁহাদিগের দুয়ার হইতে অন্ন না পাইয়া ফিরিয়া না যায়। চারুচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণচন্দ্র M. B পাশ করিয়া সুখ্যাতির সহিত বাগেরহাটে ডাক্তারী করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র তরুণচন্দ্র B. A. পড়িতেছেন। তৃতীয় পুত্র বিমলচন্দ্র B. S C. পাশ করিয়া B. L. পড়িতেছেন। চতুর্থ পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র B. A পড়িতেছেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র সুবোধচন্দ্র I. A. পড়িতেছেন।

নাগ মহাশয়দিগের প্রজারা বড়ই সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। তাহারা বলে যেন রাম রাজত্বে বাস করিতেছে। ছেলে মেয়ের বিবাহে বা কোনও শ্রাদ্ধ কলাপে কোনও প্রকার খরচ বা অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয় না। প্রজাগণের নিকট হইতে বৃদ্ধি করে আদায়ের কোনও চেষ্টা করেন না। এই পরিবারের অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তির আদর যত্ন চিরকালই প্রসিদ্ধ। "লক্ষ্মীনারায়ণ" নামক যে বিগ্রহ আছেন তাঁহার

নিত্য সেবার উত্তমরূপ ব্যবস্থা আছে। দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দোল, ষষ্ঠীপূজা, মনসা পূজাদিতে বিশেষ যত্ন আছে। নাগ পরিবারের মধ্যে বহুদিন অর্থাৎ ১২৭৫ সাল হইতে যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, তাহা ৺মথুরলাল নাগ ও ঢাকচন্দ্রের চেষ্টায় মিটিয়া গিয়াছে। এখন সকল বাটীর ছেলে মেয়েদের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছে। যশোহর খুলনায় এমন বান্ধব গ্রাম বা কায়স্থ কুলীন মৌলিক বংশ নাই যাহাদিগের সহিত বাসাবাটীর নাগ বাবুদিগের কুটুম্বিতা বা আত্মীয়তা নাই। তন্মধ্যে এই কয়েকটি স্থান প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। যথা জঙ্গলবাধাল, বাগুটিয়া, দেয়াপাড়া বেবাগদীয়া, আলকা, দামোদর, বিশ্বানন্দকাটি, মহেশ্বর পাশা, [illegible] কাঠিপাড়া, সেনহাটী রাউলি [illegible], [illegible], [illegible] পিলজঙ্গ, বনগ্রাম, রায়ের কাটী প্রভৃতি। নবাবী আমল হইতে নাগ বাবুরা "মজুমদার" উপাধিতে ভূষিত। এই উপাধি তাঁহাদিগের বংশগত।

এই বংশের একটা তালিকা রাজা মিনকেতন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ১৮ পুরুষ চলিতেছে। তাহাদিগের নাম প্রবন্ধের শেষে প্রদত্ত হইল। বর্ত্তমানে এই বৃহৎ পরিবারে ৯টি graduates ও ২৯টা under-graduates আছেন। পরের অধীনে চাকুরী বড় একটা করিতে হয় না তবে ৬জন ওকালতি করিতেছেন। পুরুষানুক্রমে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করাই এই বংশের বৈশিষ্ট্য। ইঁহাদের বাসভবনের নিকট যে চক্রবর্ত্তীরা আছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নাগ মহাশয়দিগের হুড়কা দিগরাজ তালুকের নায়েব ছিলেন। দুর্গাপ্রসাদের পুত্র তারকনাথ, হরনাথ, যদুনাথ বিষয় বিভব অর্জ্জন করিয়া কিছুদিনের জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে কখনও কখনও নাগ মহাশয়দিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইয়া

আসিতেছে। তাঁহাদিগের বিষয় সম্পত্তি নাগ বাবুরা কতক কতক খরিদ করিয়া লইয়াছেন।

গোলাচাঁদ নাগের সময় হইতে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বরাবরই জনহিতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। চরিত্র, মহত্ত্ব, দয়া দাক্ষিণ্য, পরোপকার গুণে নাগবংশীয়েরা সর্ব্বত্রই খ্যাত। এই বংশের শুকলাল নাগ মহাশয় সর্ব্ববিধ সাধারণ কার্য্যে জড়িত, দেশের রাস্তা ঘাট, পুষ্করিণী, স্কুল, কলেজ সমস্ত কার্য্যেই তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী দেখা যায়। পারিবারিক সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি স্থির রাখিবার জন্য তিনি প্রত্যেক বৎসরই অর্থ ব্যয় করেন। তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা জনিয়াব চারুচন্দ্র ও বি, এল, পাশ করিয়া খুলনায় ওকালতি করিতেছেন। তাঁহারও ব্যবসায়ে উন্নতি করিবার খুবই প্রয়াস দেখা যাইতেছে। চারুচন্দ্রের ২টী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যতীত একটী ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ নাগ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে B. L. পাশ করিয়া বাগেরহাটে ওকালতি করিতেছেন তিনিও রাজনীতিক ভাবে দেশকে উন্নত করিবার জন্য খুবই চেষ্টা করেন। তাঁহার পিতামহ ৺শশীভূষণ কবিরাজী চিকিৎসা উত্তমরূপ জানিতেন, নাড়ীজ্ঞানে তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। সঙ্গীতে তিনি একজন সমজদার শ্রোতা ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ৺প্রিয়নাথ নাগ ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি কয়েকবৎসর বাগেরহাটের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। শিক্ষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আগ্রহ ছিল। জ্ঞাতি বা জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে মেধাবী ছেলে দেখিলে তিনি তাহাকে ভালবাসিতেন ও উৎসাহ দিতেন।

হাবেলী বাসাবাটীর নাগ বংশ।

হাবেলী বাসাবাটীর নাগ বংশের কুলজিনামা

১। রাজা মীনকেতন
|
২। রাজা জ্যোতিঃপ্রকাশ
|
৩। রাজা গুণেশচন্দ্র
|
৪। সদানন্দ
|
৫। ভবানন্দ
|
৬। জগদানন্দ
|
৭। ভৈরব
|
৮। রামচন্দ্র খাঁ
|
৯। শিবানন্দ
|
১০। গনেশচন্দ্র
|
১১। নীলকণ্ঠ (ইনি প্রথমে বাসাবাটী গ্রামে বাসস্থাপন করেন ১১৬০ সালে)
|

১২ কৃষ্ণকিশোর ১২ গজেন্দ্র ১২ রামানন্দ ১২ গঙ্গাপ্রসাদ স্ত্রী রুক্মিণী

১৩ নধিরাম ১৩ বাণেশ্বর ১৩ গদাধর মৃঃ ১২৩১ স্ত্রী অম্বিকাসুন্দরী মৃঃ ১২৭৩

১৪ শিবচন্দ্র মৃঃ ১২৫৭ ১৪ স্বরূপচন্দ্র মৃঃ ১২৬০
|
১৫ জগবন্ধু মৃঃ ১২৫৮

স্বরূপচন্দ্র
১৫ চন্দ্রকুমার মৃঃ ১৩১৮
১৫ কৈলাশকুমার
১৫ গোবিন্দ মৃঃ১২৭৮
১৬ অশ্বিনীকুমার
১৭ রাজেন্দ্র অমরেন্দ্র সমরেন্দ্র বীরেন্দ্র রবীন্দ্র
১৮ সন্তোষ পরিতোষ মনতোষ
১৬ রামলাল মথুরলাল ব্রজলাল ভুবনবিহারী বিপিন রূপলাল জনার্দ্দন
মৃঃ ১২৯০ মৃঃ১৩২২ মৃঃ১৩২৬ মৃঃ ১৩৩১ মৃঃ ১৩২৫
১৭ বংশধর গোপাল সুখলাল
রতিকান্ত প্রিয় গণপতি দিলীপ
অনিল সুশীল বিশ্বনাথ বিমল
১৮ পরিমল নির্ম্মল
যতীন্দ্র নবীন ক্ষিতীশ খগেন্দ্র ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ
দেবকুমার
সুরেন্দ্র প্রহ্লাদ ঈশান নরেন্দ্র হরি
শ্যামল অমল
মাণিক
শক্তি শান্তি
প্রবোধ সুবোধ
প্রতাপ নারায়ণ

চাবেলি বাগানবাটির নাগ

সঙ্গীতকেশরী স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতগুরু অনন্তলাল ১২৩৯ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় গঙ্গানারায়ণ বন্দোপাধ্যায় ও মাতার নাম নারায়ণী দেবী। শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার পিতামহ ছিলেন। সাক্ষাৎ দেবীতুল্যা কৃপাময়ী দেবী ইঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। অনন্তলালের পিতা শাস্ত্র বিষয়ক পণ্ডিত ছিলেন এবং সঙ্গীতেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। গঙ্গানারায়ণের একমাত্র পুত্র অনন্তলালকে শাস্ত্র বিষয়ক পণ্ডিত করিবার বাসনা ছিল; কিন্তু অনন্তলাল সেজন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি পিতৃ আদেশে শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তৎসহিত বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সঙ্গীতবিদ্যাও শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কেহই ইঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। স্বাভাবিক ধীশক্তি প্রভাবে অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি সঙ্গীতে অন্য সকলকে অতিক্রম করেন এবং এই বিদ্যায় অপার জ্ঞান লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহার উপর রীতিমত সাধনা দ্বারা ইনি সঙ্গীত বিদ্যাকে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, বিষ্ণুপুর রাজদরবারের তদানীন্তন সঙ্গীতাচার্য্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের পরলোকগমনের পর, সেই পদে বরিত হইবার উপযুক্ত লোক অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। ইনি মহারাজ গোপালসিংহের রাজসভায় সঙ্গীতাচার্য্য নিযুক্ত হইয়া প্রধানতঃ রাজপুত্রদ্বয়কে পরিশেষে আগন্তুক সঙ্গীতার্থী মাত্রকেই অকাতরে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। সঙ্গীতাচার্য্যের সমস্ত সদ্‌গুণরাশির দ্বারা তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি নির্লোভী,

নিরহঙ্কারী, উদারচেতা ও সত্যবাদী পুরুষ ছিলেন, এইজন্য মহারাজ ইঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন এবং বিষ্ণুপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ইঁহার বাধ্য ছিল। তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার জ্ঞানের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা ও ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে ইঁহারাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—৬ উদয়চন্দ্র গোস্বামী, ৬ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, ৬ বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত হারাধন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সরকার। অনন্তলালের ন্যায় সঙ্গীতে সিদ্ধপুরুষ না জন্মিলে বিষ্ণুপুর সম্ভবতঃ এতদিন তাহার পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে অপারগ হইত। তাঁহারই শিক্ষার গুণে আজ তাঁহার ছাত্রগণ নিজ প্রতিভাবলে ভারতের সঙ্গীত কলাকে পুনর্জীবিত করিতেছেন। তথাকার গায়ক, বাদকগণ চিরদিনই অনন্তলালের নিকট ঋণী থাকিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি সকল ব্যক্তিদিগকে অকাতরে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, তজ্জন্য অর্থ গ্রহণ করিতেন না। যে বা কার কণ্ঠস্বর উত্তম তাঁহাকে ডাকিয়া গান শিক্ষা দিতেন। এই প্রসঙ্গে সঙ্গীত বিশারদ স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী একবার বলিয়াছিলেন যে "ছেলেবেলায় আমরা খেলিয়া বেড়াইতাম, ওস্তাদজী যদি দৈবাৎ দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়া পুরাতন গানগুলি গাহিতে বলিতেন।" ছাত্রদিগের উপর এইরূপ স্নেহ গুরুগণের মধ্যে অতি বিরল। কিন্তু আমাদের দেশের কতিপয় লোক এরূপ হীন প্রবৃত্তি যে তাহারা প্রকৃত তথ্য না জানিয়া প্রবাসীতে ৬ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়কে অন্য এক মহাত্মার ছাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন ইহা অতি নিকৃষ্টতার পরিচায়ক। এই বিষয় প্রতিবাদে উঠে, সৌভাগ্যক্রমে প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় বিষ্ণুপুরে লিখিয়া প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবুর চিঠি তাঁহার

সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়া সকল প্রকার বিবাদের সমাধান করেন। স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মেদিনীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ মল্লিক মহাশয় ও গড়্‌বেতার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গণেশ দত্ত মহাশয়দিগকে মধ্যে মধ্যে যাইয়া গান শিক্ষা দিতেন। ইনি একদা গড়্‌বেতাতে বাহার রাগিণী আলাপ করিয়া সকলকে শুনাইয়াছিলেন তাঁহার সেই আলাপ শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এরূপ আলাপ গাইবার লোক অধুনা বিরল। তিনি এরূপ সুন্দর সহজভাবে মীড়াদিয়া আলাপ গাহিতেন যে, উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাহার সঙ্গীত প্রভাবে মোহিত হইয়া পড়িত। ইনি গড়বেতায় থাকিয়া বহুলোককে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। ইহার রচিত ধ্রুপদ, খেয়াল গানগুলি অবিকল হিন্দুস্থানীদের ন্যায়। গড়বেতা হইতে বিষ্ণুপুর অদ্ধক্রোশ আসিতে হইত এবং সেই রাস্তা নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ছিল, সে সময় রেল হয় নাই, গো-গাড়িতে আসিতে হইত, একদা বিষ্ণুপুর হইতে আসিবার সময় তাহার মধ্যম পুত্র গোপেশ্বর সঙ্গে ছিল। দুইজনে যাইতে যাইতে বালক গোপেশ্বর ফল ফুল শোভিত বনরাজির শোভা দেখিয়া পিতাকে বলিল যে প্রকৃতির এই শোভার ভাব লইয়া একটী গান রচনা করিয়া তাহাকে শিখাইতে হইবে। অনন্তলাল পুত্রের জন্য " কিবা সুন্দর উপবন শোভা সৌরভে মুনি মন-লোভা" এই বিখ্যাত গানটী রচনা করিলেন এবং ভাব ও সুরের মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য তখনি ইহা খাম্বাজ রাগীণীতে সুর দিয়া গোপেশ্বরকে শিক্ষা দিলেন। তাঁহার গানের অধিকাংশ বিবিধ বিদ্যাবিশারদ স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত, " কেন হরি যোগীর বেশে" " তারা তারা তারা বলে " " দীন তারিণী বলে মা " প্রভৃতি গানগুলি রচনা ও সুর হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট। তাঁহার গানের কয়েকটী ৺লালচাঁদ বড়াল, ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক গ্রামোফোন-রেকর্ডে প্রদত্ত হয়। ইনি সঙ্গীতের যে কিরূপ উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাহা লিখিয়া বর্ণন করা যায় না। ইনি বহু পরিশ্রম দ্বারা যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ছাত্র করিয়া গিয়াছেন, তদ্দারা আজও সঙ্গীত চতুর্দ্দিকে সমভাবে বিস্তৃত হইতেছে। ধ্রুপদ গান অনেকে বড় বেশী জোরে গাইয়া এবং মুখভঙ্গী দ্বারা এমন বিকৃত করেন যে, অনেকে ধ্রুপদ গান শুনিতে ইচ্ছা করেন না। যাহারা এইরূপ গাহিতেন, তাহাদের উপর অনন্তলাল অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তিনি এমন সুমিষ্ট করিয়া ধ্রুপদ গাহিতেন যে, সকলেই তাহা শুনিয়া মোহিত হইত। তাঁহার ছাত্রগণ ও পুত্রগণ অবিকল সেই ঢংয়ে গাইয়া থাকেন। স্বর্গীয় উদয়চাঁদ গোস্বামী ও স্বর্গীয় রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী সে ধ্রুপদ গাহিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন তাহা কেবল অনন্তলালের শিক্ষা ও তাঁহাদের নিজেদের সাধনার ফল। "সগুণ শোহাবন", "মধুঋতু আই", "অচল বিরাজ", "একত যৌবন", "তু বল জাউঁ", "রঙ্গঝরি লাগিরি" প্রভৃতি গানগুলি অনন্তলালের বিশেষ প্রিয় ছিল। স্বর্গীয় গোস্বামী মহাশয়ও ঐ গানগুলি সম্পূর্ণ অনন্তলালের ঢংয়ে প্রত্যেক মজলিসে প্রায়ই গাহিতেন। এক্ষণে তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেইরূপ সুমিষ্ট করিয়া ধ্রুপদ গাহিয়া কি হিন্দুস্থানে, কি বঙ্গদেশে, সকল স্থানে ধ্রুপদে বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহার ন্যায় গায়ক বিরল। অনন্তলাল একবার বর্দ্ধমানে গিয়াছিলেন। সে বহু দিনের কথা। সেই সময় মৌলাবক্স ঘিসে খাঁ ও গয়ার সঙ্গীতবিশারদ হনুমান দাসজী বর্দ্ধমানে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। একটা বড় রকম গানের বৈঠক হয়। অনন্তলালের ধ্রুপদ শুনিয়া উক্ত মহাত্মাদ্বয় তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, এরূপ বিশুদ্ধ, মুদ্রা-দোষবিহীন, সুমিষ্ট ধ্রুপদ তাঁহারা খুব কমই শুনিয়াছেন। নিজের

নাম জাহির করা কিম্বা সাধারণের নিকট প্রশংসাভাজন হওয়া, এই সকল বিষয়ে তাঁহার উদার প্রকৃতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি, তাঁহার একটিও প্রতিকৃতি নাই। জীবনের সমস্ত অংশই প্রায় তিনি বিষ্ণুপুরে কাটাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় উদারপ্রকৃতি লোকের এ সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্যই ছিল না। নিজের জীবনের সফলতার প্রতি দৃকপাত না করিয়া বঙ্গদেশে সঙ্গীত যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, কেবল এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। ইনি ১৩০৭ সালে পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন। যদিও তাঁহার নশ্বর দেহের কোন প্রতিকৃতি নাই, তথাপি তাঁহার সঙ্গীতময়ী প্রকৃতির প্রতিকৃতি বাঙ্গালার ও ভারতের সঙ্গীতানুশীলনকারিগণের হৃদয়ে যে চিরবিরাজ করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস ও সান্ত্বনা।

সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্তলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১২৭৮ সালে আষাঢ় মাসের ২৯শে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। রাম প্রসন্ন বাবু পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই পিতার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করিয়া অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্পদিনের মধ্যেই গান, সেতার ও আনুসঙ্গিক বিষয়সকলে পারদর্শিতা লাভ করেন। কিছুদিন পরে রামপ্রসন্ন বাবু তাঁহার পিতার সহিত বিষ্ণুপুর হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী অযোধ্যা গ্রামে গিয়া তথাকার জমিদারের সহিত কলিকাতায় আসিয়া গীত ও সেতার বাদ্য শুনাইয়া দেশবিখ্যাত "সুধাসিন্ধু"-আবিষ্কারক ডাক্তার প্রিয়নাথবাবু-প্রমুখ অনেকগুলি ভদ্র ও বড়লোককে মুগ্ধ করেন। বালক রামপ্রসন্নের বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র। প্রিয়নাথ বাবু সঙ্গীতশিক্ষার মানসে তাঁহাকে বহু যত্নে কলিকাতায় রাখেন। সেই সময়ে কলিকাতায় বড় বড় রাজা জমিদারের বাড়ীতে রামপ্রসন্ন

বাবুর সঙ্গীত হয়। এত অল্প বয়সে এরূপ সঙ্গীতনিপুণতার জন্য তাঁহার সুযশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ে তিনি তাহার পিতার মাতুলপুত্র মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতাচার্য্য নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট সুরবাহার ও উক্ত মহারাজার প্রধান গায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর (নুলো গোপাল নামে খ্যাত) নিকট টপ্পা শিক্ষা করেন। এইরূপে কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তিনি বিষ্ণুপুরে ফিরিয়া যান এবং বিষ্ণুপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুচিয়াকোল রাজবাটীতে গমন করিয়া রাজবংশধরগণ কর্ত্তৃক সঙ্গীতাচার্য্য-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কুচিয়াকোল ও বিষ্ণুপুরাধিপতি রায় যোগেন্দ্রনাথ সিংহ দেব বাহাদুর ও তাহার ভ্রাতা স্বর্গীয় রজনীনাথ সিংহ দেব বাহাদুরকে ৭ বৎসর যাবৎ সঙ্গীত শিক্ষা দেন। শিক্ষা-দানের কৃতিত্ব দেখিয়া তাহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা ১৭ বিঘা নিষ্কর ভূমি তাঁহাকে দান করেন।

তৎকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, তিনি কুচিয়াকোল পরিত্যাগ করিয়া তিনজন ছাত্র সমভিব্যাহারে বাদ্যযন্ত্রাদি লইয়া মহিষাদল রাজবাটী যাইবার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি পথিমধ্যে যে ষ্টীমারে যাইতেছিলেন, সেই ষ্টীমারে মেদিনীপুর ও নাড়াজোলাধিপতি স্বর্গীয় রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন মহোদয় কলিকাতায় আসিতেছিলেন, সঙ্গে তাঁহার পিতামহের ভ্রাতা ছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এমন কি কোন উৎকৃষ্ট যন্ত্র দেখিলে তিনি অবিকল সেইরূপ যন্ত্র নিজে তৈয়ারী করিতে পারিতেন। তিনি রামপ্রসন্ন বাবুর যন্ত্রাদি দেখিয়া পুনঃ পুনঃ সেইদিকে যাতায়াত আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি অবশেষে থাকিতে না পারিয়া রামপ্রসন্ন বাবুর নিকট যান এবং তাহার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ রাজা মহোদয়ের নিকট যাইয়া তাহাকে রামপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গীতাদি শুনিতে বলেন।

রাজা নরেন্দ্রলালও ইহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি দান করেন। তখন রামপ্রসন্ন বাবু একজন ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া সুরবাহার ও সেতার সমভিব্যহারে রাজার কেবিনে যান। সেখানে তাঁহার সুরবাহার আলাপের ও সেতার-বাদ্যের আশ্চর্য্যরূপ কৃতিত্বে বিমোহিত হইয়া রাজা ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন এবং তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া রাজদরবারে সঙ্গীতাচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বর্গীয় রাজা নরেন্দ্র-লাল খান নিজেও তাঁহার নিকট গান ও সেতার শিখিতে আরম্ভ করেন এবং অল্পদিন পরে তিনিও সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। রাজবাটীতে কোন উৎসবাদি হইলে রাজা মহোদয় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদকগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তৎপরে রামপ্রসন্নবাবু রাজা মহোদয়ের আনুকূল্যে "সঙ্গীত-মঞ্জরী" নামক একখানি সুবৃহৎ সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে অনেক উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরী প্রভৃতি সন্নিবেশিত আছে। এই পুস্তক আর পাওয়া যায় না এবং পুনর্মুদ্রিতও হয় নাই। ইনি বিষ্ণুপুরে অবস্থানকালীন কেবলমাত্র বাঙ্গালা ভাষাই শিক্ষা করিয়াছিলেন, পরে কুচিয়াকোল রাজবাটীতে ৺বরদানাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন, তৎপরে মেদিনীপুরে থাকিবার সময় ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করেন। "সঙ্গীত-মঞ্জরী" ১৩১৪ সালের বৈশাখে প্রকাশিত হয়। রামপ্রসন্নবাবু ধ্রুপদে অদ্বিতীয় এবং তাঁহার প্রতিভা যন্ত্র-সঙ্গীতের মধ্যেও অতিসুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়। নাড়াজোলে অবস্থানকালে তিনি সুরবাহার সেতার ব্যতিরেকে বীণ, এসরার্, কানন, পাখোয়াজ প্রভৃতি ভারতীয় পুরাতন যন্ত্রসমূহ উৎকৃষ্টরূপ আয়ত্ত করেন। তাঁহার সুরবাহার আলাপে এবং বাদ্যে মেদিনীপুরবাসিগণ মোহিত হইতেন এবং এমন কি ৺রাজা মহোদয়ের পোষা হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি বন্যজন্তুগণও তাঁহার

বীণার ঝঙ্কার শুনিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান থাকিত।

তিনি ১৩২৫ সালে মৃদঙ্গ-দর্পণ ও তবলা-দর্পণ নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি বিখ্যাত পুরাতন মৃদঙ্গ বিশারদগণের বোল প্রভৃতি সংগ্রহীত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তিনি ইহা এরূপ সরল করেন যে, সাধারণে অতি সহজে সেই সমস্ত বোল শিখিতে পারেন। সঙ্গীত-সমাজে "এসারার্"-শিক্ষার তেমন কোন উৎকৃষ্ট পুস্তক না থাকায় তিনি সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া "এস্‌রার্-তরঙ্গ" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন ইহাতে অতি উৎকৃষ্ট গৎ এবং শেষাংশে কতিপয় ঠুংরী বাঙ্গালা গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত "এস্‌রার্-তরঙ্গ" ও তাঁহার ছাত্র স্বনামধন্য স্বর্গীয় রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহোদয়ের রচিত "পরিবাদিনী শিক্ষা" নামক সেতারের পুস্তক—এই দুই পুস্তকের দ্বারা সঙ্গীত-জগতের অভাব দূরীভূত হইয়াছে, এবং শিক্ষাবিস্তারের উপায় অতি সহজগম্য হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, "সঙ্গীত-মঞ্জরী"র ন্যায় পুস্তকের অদ্যাপি ২য় সংস্করণ হইল না। স্বর্গীয় রাজামহাশয় "পরিবাদিনী-শিক্ষা" ১ম ও ২য় ভাগ প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং ৩য় ও ৪র্থ ভাগ লিখিয়া প্রকাশ করিবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। সেই বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, সঙ্গীতজ্ঞ রাজার মৃত্যুতে সঙ্গীত-সমাজ একজন পরমবন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হারাইলেন! আজকাল রাজা, মহারাজাগণের মধ্যে অধিকাংশই দেশীয় কোন বিদ্যার উন্নতি ও চর্চ্চার প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। আশা করি, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁন মহাশয় তাঁহার পিতার অনুকরণ করিবেন। বিশেষতঃ তিনি তাঁহার পিতার

অপ্রকাশিত পুস্তক ও "সঙ্গীত-মঞ্জরী" পুনঃ প্রকাশিত করেন, ইহা সঙ্গীতানুরাগীগণের একান্ত ইচ্ছা। তাঁহার অনুগ্রহ হইলে ইহা অচিরেই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা, এবং তাঁহার নামও সঙ্গীতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। রামপ্রসন্নবাবু তাঁহার প্রিয় ছাত্র ও পৃষ্ঠপোষক রাজাবাহাদুরের মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন এবং বর্ত্তমান কুমার বাহাদুরকে ৩।৪ বৎসর শিক্ষা দান করিয়া ৩০ বৎসর যাবৎ সঙ্গীতাচার্য্যের কার্য্য পূর্ণ করিয়া মাসিক পূর্ণ বৃত্তি গ্রহণ করেন। বিদেশে থাকিয়া তাঁহার শরীর খারাপ হওয়ায় তিনি বিষ্ণুপুরেই থাকিবার মানস করেন। বিষ্ণুপুরে অনেকদিন হইতেই একটী সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেন, সেই সময়ে স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এবং দেশ বিদেশ হইতে অনেক শিক্ষার্থী সেখানে সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে অনেক দিন পর্য্যন্ত অনুপযুক্ত শিক্ষকের হাতে পড়িয়া, বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের পূর্ব্বগৌরব লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল এবং ইহার কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত না হওয়াতে সরকারী সাহায্যও বন্ধ হইয়াছিল। বিদ্যালয়টি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এমন সময় রামপ্রসন্ন বাবু বিষ্ণুপুরে আসিতেই সেখানকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও অন্যান্য সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিগণ মিলিয়া রামপ্রসন্নবাবুর সাহায্যে বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতের উন্নতির চেষ্টা করেন। অচিরেই তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয়। রামপ্রসন্নবাবু নিজে বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন, এবং বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য একটী কমিটি গঠন করেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি অনেক ছাত্র তৈয়ার করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে গান এবং সকল প্রকার যন্ত্রাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। সঙ্গীতাচার্য্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। আশা করি, তিনি কৃতকার্য্য হইবেন এবং তাঁহার পিতার

ন্যায় সকলকে শিক্ষা দিয়া, বিষ্ণুপুরের ও বাঙ্গালার সঙ্গীত-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। রামপ্রসন্নবাবুর বয়স এখন ৫৫ বৎসর।

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্তলালের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১২৮৫ সালের ২৫শে পৌষ বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই পিতার নিকট সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন। বিষ্ণুপুরের মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহকে সঙ্গীত শিখাইবার জন্য ইঁহার পিতা যখন রাজবাটীতে যাইতেন, বালক গোপেশ্বরও তখন সেই সঙ্গে প্রায়ই যাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে মহারাজকে গান শুনাইয়া মুগ্ধ করিতেন। সঙ্গীতবিদ্যায় ইঁহার যেমন স্বাভাবিক শক্তি ছিল, চিত্রবিদ্যাতেও তদ্রূপ দেখা যাইত। এই দেখিয়া বিষ্ণুপুরের মহারাজ ইঁহাকে চিত্রবিদ্যা শিখাইবার জন্য কলিকাতা পাঠাইতে অভিলাষী হন এবং পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা আবশ্যক বোধে বিষ্ণুপুর ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। গোপেশ্বর যথারীতি স্কুলে যাইতে লাগিলেন এবং পিতার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যিনি প্রণবধ্বনি দ্বারা অসামান্য যশোলাভ করিবেন, তাঁহাকে ভাষা-শিক্ষায় কি আকৃষ্ট রাখিতে পারে? এই সময় বিষ্ণুপুরাধিপতি স্বয়ং অপুত্রক হেতু গোপেশ্বরকে পোষ্য লওয়ার প্রস্তাব করেন, কিন্তু ইঁহার নির্লোভ, তেজস্বী পিতা অনন্তলাল অস্বীকার করেন এবং কেবল 'ভিক্ষা ছেলে' দিতে সম্মত ছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি-সূত্রে উপনয়নের সময় গোপেশ্বর মহারাণীর ভিক্ষা-পুত্র হন। তদবধি মহারাজ ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মহারাজের পরলোকগমনের পর দশ বৎসর বয়সে গোপেশ্বর প্রথম কলিকাতায় আসেন। এই সময় তাঁহার গান শুনিয়া একজন সাহেব এত মুগ্ধ হন যে, মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ী ভাড়া লইয়া শুধু

গোপেশ্বরের গান হইবে—এই মর্ম্মে তিনি বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে থাকেন দশবৎসরের বালক সঙ্গীতবিদ্যায় অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাইবে এই সংবাদে বহুলোকসমাগমও হইয়াছিল। তন্মধ্যে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা একজন। তিনি গান শুনিয়া বালককে ক্রোড়ে লইয়া অনেক প্রশংসা করেন। মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইঁহার গানের সমালোচনায় বলিয়াছিলেন, "চক্ষু মুদিত করিয়া শুনিলে মনে হয় খুব বড় গায়কের গান হইতেছে"। কলিকাতার জনসাধারণকে তুষ্ট করিয়া ইনি বিষ্ণুপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় পিতার নিকট একাদিক্রমে ১৩ বৎসর কাল গান শিক্ষা করেন। কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসেন এবং তৎকালিক প্রসিদ্ধ খেয়ালী গুরুপ্রসাদ মিশ্র মহাশয়ের নিকট কতক খেয়াল গান সংগ্রহ করেন। ইনি ধ্রুপদ খেয়াল, টপ্পা সমেত প্রায় পাঁচ হাজার গান বিশেষরূপে আয়ত্ত করেন ইঁহার গলার স্বর অতি সুমিষ্ট; ইনি হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় বহু গান রচনা করিয়াছেন। ইনি প্রতিদিন নিয়মমত সাধনা করিয়া থাকেন ছায়ানট ও ভৈরবরাগ ইঁহার মত কেহই গাহিতে পারেন না। বর্দ্ধমান মহারাজের রাজসভায় ইনি প্রায় ২৯ বৎসর যাবৎ সঙ্গীতাচার্য্যের পদ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। "সঙ্গীত-সঙ্ঘ"র প্রতিষ্ঠাত্রী, সঙ্গীত রাজ্ঞী, বিবিধগুণালঙ্কৃতা স্বর্গীয়া প্রতিভা দেবী মহোদয়া ইঁহার গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলেন এবং ইঁহাকে "সঙ্গীত-সঙ্ঘে" গান শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। তদবধি তিনি "সঙ্গীত-সঙ্ঘে" উচ্চ শ্রেণীতে হিন্দী গান শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন এবং তিনি 'সঙ্ঘে'র বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। ইনি সকলকে অকপটে গান শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইনি প্রকৃত সঙ্গীতের উন্নতির জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, এরূপ চেষ্টা অন্য কেহ করেন না। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের আনুকূল্যে ইনি ১৩১৬ সালে "সঙ্গীতচন্দ্রিকা" (১ম ভাগ) নামক একখানি

পুস্তক বাহির করেন। বাঙ্গালা দেশে তাহার এই প্রথম পুস্তক সকলে সমাদরে গ্রহণ করেন এবং উহা শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযোগী হয়। তৎপরে ১৩২১ সালে "সঙ্গীতচন্দ্রিকা" (২য় ভাগ) প্রকাশিত হয়। সঙ্গীতের এই দুই বৃহৎ পুস্তক প্রণয়নে সঙ্গীতাচার্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গীতশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়, এবং তাহার পুস্তকদ্বয় বাঙ্গালা দেশে এবং পশ্চিমেও পরম সমাদর লাভ করে।

সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি "সঙ্গীত-নায়ক" উপাধি প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহাকে বিশ্বভারতী হইতে "স্বর-স্বরস্বতী" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইনি "আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা", "সঙ্গীতপ্রকাশিকা", "ভারতবর্ষ", "ভারতী" প্রভৃতি পত্রিকাতে বহু গানের স্বরলিপি ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অধুনা "প্রবাসী"তে তাঁহার "রূপ ও আলাপ" নামক একটী পুস্তক ক্রমশঃ বাহির হইতেছে। "সঙ্গীত-চন্দ্রিকা" ১ম ভাগ একবারে নিঃশেষ হওয়ায় গোপেশ্বর বাবু গত বৎসর (১৩৩২ সালে) "সঙ্গীত-চন্দ্রিকা"র ২য় সংস্করণ বাহির করিয়াছেন এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া অমর তানসেনের ছবি সংগ্রহ করিয়া ইহাতে ছাপাইয়াছেন। অধুনা-প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ ম্যরিস কলেজ নামক সঙ্গীতের কলেজে তাহার পুস্তকদ্বয় সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে গৃহীত হইয়াছে। গোপেশ্বর বাবু ১৩৩০ সালে "গীতমালা" নামক দেবদেবীবিষয়ক একখানি বাঙ্গালা গানের পুস্তক বাহির করেন। তৎপরে ১৩৩২ সালে "তানমালা" নামক একখানি খেয়ালের পুস্তক প্রকাশ করেন। তান, বাট সহ স্বরলিপির এরূপ সুন্দর পুস্তক ভারতবর্ষে আর নাই। এই সমস্ত পুস্তকে তিনি সঙ্গীতের অনেক লুপ্ত জিনিষ উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি "সঙ্গীত-লহরী" নামক খেয়ালের একটী সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। ইঁহার বহুসংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রী আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অতি উৎকৃষ্টরূপে

গাহিতে পারেন। ইঁহার রচিত বাঙ্গালা গান কে মল্লিক প্রভৃতি অনেকে রেকর্ডে দিয়াছেন। বেনারস অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে গোপেশ্বরবাবু ও আলাবন্দে খাঁ ধ্রুপদে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইনি অন্যান্য বহু বড় বড় স্থানে স্বর্ণপদক, উপাধি ও প্রশংসাপত্রাদি পাইয়াছেন। লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সে সঙ্গীতের কলেজ স্থাপন ও অন্যান্য সাধারণ উন্নতির জন্য যে একটী কমিটী গঠিত হয় তাহাতে গোপেশ্বরবাবু বাঙ্গালার প্রতিনিধিস্বরূপ সদস্য নির্ব্বাচিত হন। হিন্দুস্থানের অনেক পুস্তকে গোপেশ্বরবাবুর "সঙ্গীত-চন্দ্রিকা"র গান গৃহীত হইয়াছে এবং হিন্দুস্থানের "সঙ্গীত সুধা" নামক সঙ্গীতের হিন্দী মাসিক পত্রিকায় ইনি অনেক গান দিয়াছেন। ইনি এখন ভারতীয় সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি করিতেছেন। ইঁহার বয়স এক্ষণে ৪৭ বৎসর।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্তলালের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮০৮ শকের ২রা অগ্রহায়ণ বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। ৮বৎসর বয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় নাড়াজোলে অগ্রজ রামপ্রসন্নবাবুর নিকট যন্ত্রাদি শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রাজা মহোদয়ের সহিত রামপ্রসন্নবাবুকে নানা স্থানে যাইতে হইত বলিয়া সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা মধ্যম ভ্রাতা গোপেশ্বরের উপর ন্যস্ত হইল। তাহার নিকট সুরেন্দ্রনাথ গান, সেতার, সুরবাহার শিক্ষা করেন এবং তৎপরে কিছুদিন বর্দ্ধমান-রাজের গায়ক পদে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু তথাকার জলবায়ু তাহার অসহ্য হওয়ায় ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণের অকালমৃত্যুহেতু মাতৃদেবীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বিষ্ণুপুরে গিয়া বাড়ীতেই থাকিতে বাধ্য হন। সেই সময় নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিষ্ণুপুরে গিয়া

সুরেন্দ্রের গীতবাদ্যশ্রবণে প্রীত হইয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে তাহা শুনাইবার অভিপ্রায়ে সুরেন্দ্রনাথকে কলিকাতায় আনেন। মহারাজ তৎশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে গায়ক-পদে নিযুক্ত করেন। মহারাজ পরলোক গমন করিলে ইনি আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্যের পদ প্রাপ্ত হন। সেই অবধি ইনি এই পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। অল্পকাল পরেই ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয়ে গান-বাজনার শ্রেণী খোলা হয় এবং সুরেন্দ্রনাথকেই উপযুক্ত ভাবিয়া তাঁহাকে অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সময় বিবিধগুণালঙ্কৃতা প্রমদা চৌধুরী মহোদয়া "সঙ্গীত-সম্মিলনী" নামক একটী সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুরেন্দ্রনাথকে সেখানে সঙ্গীতাচার্য্যের পদে নিযুক্ত করেন। প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী কোন পুস্তক না থাকায় ইনি "গীতপরিচয়" নামক একটী ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। এখন ইহার ২য় সংস্করণ বাহির হইয়াছে এবং "গীত-পরিচয়" ২য় ভাগও বাহির হইয়াছে। ইনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি লিখিয়া "গীতলিপি" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। "সঙ্গীত-প্রকাশিকা", "ভারতী, "তত্ত্ববোধিনী" প্রভৃতি পত্রিকায়, ইনি ধারাবাহিকরূপে বিস্তর স্বরলিপি বাহির করিয়াছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ে ইঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে। ইঁহার বয়স এখন ৫০ বৎসর।

এই তিন ভ্রাতা এক্ষণে আমাদের দেশের সঙ্গীতাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কত্রয়।

স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ তালিকা।
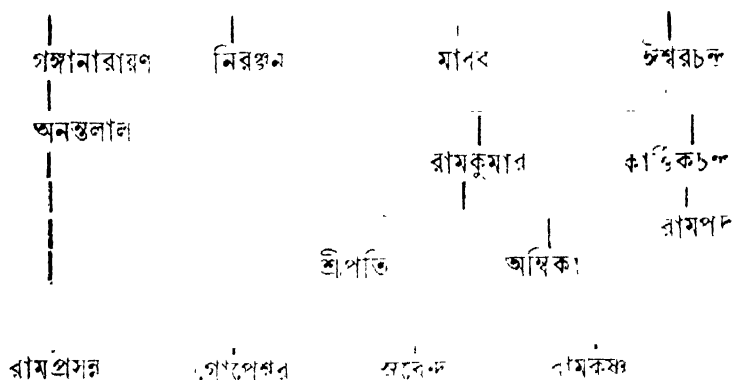
রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বানার্জ্জি বাহাদুর

রায় গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর।

সূচনা

নদীয়া জেলার কাঁচকুলী গ্রাম বাঙ্গালার কয়জনের নিকট পরিচিত তাহা জানি না, কিন্তু এই কাচকুলীর বন্দোপাধ্যায়-বংশের গোপালচন্দ্র আজ ছোট বড় অনেকের কাছেই সুপরিচিত। স্বধর্ম্মে আস্থা, ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বীয় প্রতিভাবলে মানুষ কিরূপে নিম্নস্তর হইতে উন্নতি লাভ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে গোপালচন্দ্র স্বীয় জীবনে তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিয়া যাইতেছেন। বন্দোপাধ্যায-বংশ অতি সুপ্রাচীন নিঃসন্দেহ। এই মহাতরুর দিগন্তব্যাপী শাখায় হেমচন্দ্রের ন্যায় কবি, সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় বক্তা, স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের ন্যায় বিচারক, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ন্যায় ব্যারিষ্টার প্রভৃতি কত প্রথিতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া এই বৃক্ষের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছেন, কিন্তু স্বধর্ম্মে থাকিয়া রাজসেবা, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আচার, নিষ্ঠা ও সংযমের কঠিন বন্ধনের মধ্যেও উচ্চরাজপদের দায়িত্ব-গ্রহণ ও পূর্ণমাত্রায় তাহার প্রতি-পালন বিশেষ প্রশংসনীয়। তাহার এই দৃষ্টান্ত বাঙ্গালী "জনবুলগণের" (John Bull) শিক্ষা করা উচিত। সাহেবের চাকরী স্বীকার করিতে হইলেই সাহেব হইতে হয় না, রাজা যে দেশীয় বা যে জাতীয় হউক না কেন, রাজসেবা করিতে হইলেই যে আহারে, বিহারে, পরিচ্ছদে তাহাদের দেশীয়তা বা জাতীয়তা অনুকরণ করিতে হইবে, তাহা নহে স্বাদেশিকতা ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষাই স্বধর্ম্ম ও সমাজপ্রিয়তার পরিচায়ক।

জন্ম।—ইংরাজী ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী গোপালচন্দ্র কাঁচকুলী গ্রামের সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে ভূমিষ্ঠ হন। ইহার পিতার

নাম পণ্ডিত হরিনাথ ন্যায়রত্ন। পণ্ডিত হরিনাথ কাব্য, অলঙ্কার ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের পারদর্শিতা হেতু সরকার বাহাদুর তাঁহাকে "ন্যায়রত্ন" উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

হরিনাথের নিকট আমাদের বঙ্গভাষা বড় ঋণী; কারণ তৎ-রচিত "রচনাবলী," "রামের অরণ্য যাত্রা" 'মুদ্রারাক্ষস' 'বিরাট পর্ব্ব প্রভৃতি পুস্তকাবলীর গুরুগম্ভীর প্রাঞ্জল ভাষা তৎকালের বঙ্গসাহিত্যের আদর্শস্বরূপ ছিল। 'মুদ্রারাক্ষস' তৎকালীন প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যপুস্তক ছিল। এতদ্ব্যতীত পুস্তকসকল হিন্দু হেয়ার ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের কোন না কোন শ্রেণীতে পঠিত হইত।

প হরিনাথ শিবপুরের উন্নতিকল্পে নিজের প্রাণ, মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি বহু কাল ব্যাপিয়া অনারারী মেজিষ্ট্রেট (Hony. Magte) ও মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার (Municipal Commissioner) ছিলেন। হরিনাথই শিবপুরে প্রথম তাঁহার মাতৃভাষায় 'হাবড়া হিতকরী' নামক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, তৎকালে ইহা সকল সম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল। অধিকন্তু হরিনাথ 'Howrah People's Association" নামে এক সমিতি প্রথম গঠন করিয়াছিলেন। Howrah Literary Club, Debating Club, Theatrical Club এবং স্কুল প্রথমে তিনিই স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার এই সদনুষ্ঠান ও কার্য্যকলাপদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে একটি 'Certificate of Honour" দিয়াছিলেন।

হরিনাথ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক ছিলেন ও বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় পণ্ডিত হরিনাথের ও পণ্ডিত তারাশঙ্করের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে

এই বিষয়ে সাহায্য করায় সমাজ তাঁহাকে যথেষ্ট দণ্ড দিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি আজীবন নির্ভীকচেতা ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন।

পণ্ডিত হরিনাথের বংশ।—হরিনাথের সাত পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপালচন্দ্র; দ্বিতীয় পুত্র, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল দার্জ্জিলিঙ্গে সরকার বাহাদুরের পক্ষে উকীল ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অর্জ্জিত ধনের কিয়দংশ স্বীয় পুত্রসকলের বিদেশে শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন ও কিয়দংশ স্থানীয় উন্নতির জন্য দান করেন। হিন্দু পাব্লিক হল (Hindu Public Hall) এবং কাশীশ্বরী লাইব্রেরীর (Kasishawari Library) প্রতিষ্ঠাতা এই মহেন্দ্রনাথই। দার্জ্জিলিঙ্গের হাসপাতালে যাহাতে রোগিগণ গরম জল পায় তজ্জন্য তিনি গরম জলের কল স্থাপিত করেন।

মহেন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তি অনারেবল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (হাইকোর্টের সরকার পক্ষের উকীল Govt. Pleader) কন্যা শ্রীমতী কাশীশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। ভারতবর্ষের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড Edward VII যখন যুবরাজস্বরূপ ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন জগদানন্দের ভবানীপুরস্থ গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথের পাঁচটি পুত্র যেন পাঁচটি রত্ন। জ্যেষ্ঠ ৺বলেন্দ্রনাথ উকীল ছিলেন; মধ্যম পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতার পুলিস বিভাগের Deputy Commissioner, তৃতীয় পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ B. A. Bar-at-Law কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টাররূপে বিপুল ধনার্জ্জন ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন; চতুর্থ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ America-প্রত্যাগত ও তৎ-দেশীয় M. D. L. M. ইত্যাদি উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায়

ডাক্তারী করিতেছেন ; সর্ব্ব কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথও কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন।

হরিনাথের তৃতীয় পুত্র ৺ যোগীন্দ্রনাথ পুলিসে কার্য্য করিতেন। ইহার কোন পুত্র নাই। একটি মাত্র কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

হরিনাথের চতুর্থ পুত্র চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্ মহাশয় দার্জ্জিলিঙ্গে ওকালতি করিতেছেন। ইহার পুত্রেরা সকলেই ব্যবসায়ী।

হরিনাথের পঞ্চম পুত্র ৺সনৎকুমার ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ও সরকার হইতে মোটা বেতন পাইতেন। তাঁহার দুইটি পুত্র ; উভয়েই এখন ছাত্র।

ষষ্ঠ পুত্র ৺উপেন্দ্রনাথ ব্যবসায় করিতেন। শিবপুরেই ইহার নিবাস ছিল। ইহার একটিমাত্র পুত্র অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এখন একটিমাত্র পৌত্রই উপেন্দ্রনাথের বংশধর।

সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের উকীল কিন্তু হাবড়া কোর্টেই পূর্ব্ব হইতে ওকালতী করিতেছেন। ইনিই এখন ইহার পিতার নাম রাখিয়াছেন। পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ইনিও শিবপুরের মধ্যে সকলের নিকট আদৃত হইয়াছেন। ইহার একটিমাত্র পুত্র Bengal Bankএ কার্য্য করিতেছেন।

গোপালের পাঠ্যাবস্থা।—গোপালচন্দ্র অতি শৈশবে স্বীয় পিতার স্থাপিত বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র এগার বৎসর তখন তৎপিতা হরিনাথ তাহাকে তাঁহার তদানীন্তন শিবপুর মোকামে আনয়ন করাইয়া হাবড়া জিলা স্কুলে ইংরাজী শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। শিক্ষকেরা গোপালচন্দ্র পণ্ডিত হরিনাথের পুত্র শুধু এই জ্ঞানেই তাহাকে প্রবেশিকার চতুর্থ শ্রেণীতে গ্রহণ করেন, কিন্তু গোপালচন্দ্র সেই বয়সে প্রকৃত পক্ষে চতুর্থ শ্রেণীর

উপযোগী হইয়া উঠেন নাই। বহু চেষ্টা করিয়াও গোপালচন্দ্র সহাধ্যায়ী ও সহপাঠীদিগের সমকক্ষ হইতে বা সেই শ্রেণীর পাঠ আয়ত্ত করিতে পারিতেন না। বার্ষিক পরীক্ষায় গোপালচন্দ্রকে উদ্ধতন শ্রেণীতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু গোপালচন্দ্র স্বীয় অক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া চতুর্থ শ্রেণীতেই থাকিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রতিভার ও বুদ্ধির বিকাশ আরম্ভ হইল। পর বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে বৎসর বৎসর ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও সরকার হইতে মাসিক দশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

অতঃপর কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহার কলেজ-জীবন আরম্ভ হইল। এই কলেজ হইতেই তিনি এফ-এ, বি-এ ও আইন পরীক্ষার পাঠ সমাপন করেন।

সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এফ-এ পড়িবার সময়ই তাঁহার বিবাহ-জীবন আরম্ভ হয়। তিনি বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুরস্থ সুপ্রসিদ্ধ "নন্দ" বংশের পরানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবীর শুভ পাণিগ্রহণ করেন।

বিবাহ-জীবন।

এই বিবাহে গোপালচন্দ্রের সত্য সত্যই লক্ষ্মীলাভ হইয়াছিল। এই লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী অর্দ্ধ শতাব্দীরও উপর অতীত হইয়া গিয়াছে আজিও স্বীয় স্বামীর পার্শ্বে অবস্থান করিয়া হিন্দু গৃহস্থের গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠ বস্তু যে সহধর্ম্মিণীধর্ম্ম তাহার অটুট পালনে উভয়ের জীবনকে এক অতুলনীয় সম্পদ দান করিয়া আসিতেছেন। মন্দাকিনী দেবী আদর্শ নারী। পত্নীসম্পদে গোপালচন্দ্রের সৌভাগ্য অনেকের ঈর্ষাস্থল। পত্নী মন্দাকিনী তাঁহাকে অনেকগুলি সুসন্তান উপহার দিয়াছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও ইঁহাদের সুকৃতির পুণ্যফলে

সন্তানগুলি সুচরিত্রবান্ ও কর্ম্মক্ষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে নিজের পুত্রগুলিকে উপার্জ্জনক্ষম ও স্বধর্ম্মপরায়ণ দেখাই গোপালচন্দ্রের ও মন্দাকিনী দেবীর বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ ও আনন্দজনক হইয়াছে।

কর্ম্মজীবন।

শিক্ষকতা পদ।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে গোপালচন্দ্র আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় বংশের গতানুগতিক শিক্ষকতাপদ গ্রহণ করেন। এই অল্প বয়সেই তাঁহার বিদ্যালয়-স্থাপনে অনুরাগ লক্ষিত হয়। তিনি তাঁহার অনুজ ভ্রাতা ৺মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে শিবপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অধুনাতন কালে ঐ বিদ্যালয়ই "দীনবন্ধু বিদ্যালয়" নামে পরিচিত। কিন্তু প্রতিভা যাহার জীবনে যশোরাশি উপহার দিবার জন্য উৎসুক ও ব্যগ্র নয়নে পথ চাহিয়া আছেন, আত্মশক্তিতে যে মানবের বিশ্বাস ও আস্থা আছে তিনি কখনও শিক্ষকতাপদে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। নিয়তি তাঁহাকে যশোভাণ্ডারের দ্বিতীয় কক্ষ মুক্তদ্বার করিয়া সাদরে সম্বোধন করিয়াছিলেন। গোপালচন্দ্র শিক্ষকতাপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্দ্ধমানে গমন করিয়া উকীল হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মলাভ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণের স্বভাবজ সংস্কার উপলব্ধি করায় তিনি ওকালতীতে কোনদিনই শান্তিলাভ ও মনের তৃপ্তি পান নাই। ওকালতীতে কত স্থলেই রহস্যময়ী মিথ্যার সৃষ্টি করিতে হয় ইহা তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ধাতুতে ঠিক খাপ খায় নাই। তাঁহাকে এই রত্নপ্রস্থ ব্যবহারোপজীবের জীবনটা লইয়া নিন্দা ও আক্ষেপ করিতেই আমরা দেখিয়াছি। তিনি স্বীয় মেধা ও বুদ্ধিশক্তিবলে এই ব্যবসায়ে প্রভূত ধনার্জ্জন ও প্রতিপত্তি লাভ করিলে কি হইবে? মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রাণের বীণায় এই ব্যবসায়ের মূলপ্রবৃত্তির সুর আলাপ করিলে যে

বিদ্যালয় স্থাপন।

ওকালতী।

মনোবিকার উপস্থিত হইত তাহার ফলেই তাঁহাকে কর্ম্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করে। এই বিষয়ের সমর্থনযোগ্য তাঁহার জীবনের একটি সত্য ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমরা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন—তাঁহার রাজসেবার আলোচনা করিব।

ওকালতী ত্যাগ।

কোন সময়ে একটি দাঙ্গা-হাঙ্গামা-ঘটিত মকদ্দমায় তিনি এক পক্ষের উকীল নিযুক্ত হন। ঘটনার বর্ণনায় তিনি স্বীয় পক্ষেরই দোষ নির্দ্ধারিত করেন, কিন্তু বুদ্ধি ও কূট তর্কবলে তিনি দোষীদিগকে সমর্থন করিয়া শাস্তির হস্ত হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করেন। ইহাতে বিপক্ষের নির্দ্দোষিতা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের কারাগারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হন। এই অনুতাপই তাঁহার মত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় স্বাধীনচেতা ব্যক্তির প্রাণেও দাসত্বশৃঙ্খল পরাইতে সক্ষম হইয়াছিল—এই অনুতাপই স্বাধীনজীবিকা-সম্ভূত প্রভূত অর্থ সম্মান ও যশোরাশিকে তুচ্ছজ্ঞানে হেয় ও নিকৃষ্ট চিন্তা করাইতে তাঁহার চিত্তের মধ্যে কিছুমাত্র দ্বিধার সৃষ্টি করে নাই।

রাজসেবায় নিযুক্ত।—ওকালতী পরিত্যাগ করিয়া তিনি মুনসেফ হইলেন বটে, কিন্তু তৎকালে এই বিশিষ্ট হাকিমদের মাসিক বেতন সার্দ্ধশতমাত্র ছিল। এই অত্যল্প আয়ের জন্য গোপালচন্দ্রের পারিবারিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল হইল না। এজন্য তাঁহাকে অনেক দিবসই চিন্তামগ্ন থাকিতে দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তিনি সহিষ্ণুতা বলে ও স্বীয় সহধর্ম্মিণীর মিতব্যয়িতা-গুণে এই অভিযোগ দূর করিয়া বেশ আনন্দেই ছিলেন। তাঁহার ও তদীয় পত্নীর তদবধি ধর্ম্মই একমাত্র শান্তির লক্ষ্য হইয়াছিল। ভগবচ্চিন্তা ও পরমেশ্বরে নির্ভর-জ্ঞান উভয়ের জীবনের অর্থক্লিষ্টতা হেতু দুঃখমোচন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জগদীশ্বরকে যিনি বুকঢালা ভক্তি অঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়াছেন, কর্ত্তব্যেই যাঁহার প্রতিভার বিকাশ, তিনি যেস্থানেই যেরূপ অবস্থায় কালের বক্র

পতিতে নিক্ষিপ্ত হউন না কেন, সংসারের কোন অভাব-অভিযোগ তাঁহার থাকে না। কথায় বলে, "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"।

ভগবান গোপালচন্দ্রের স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ও গুণরাশির সুযোগ্য পুরস্কার দিয়াছিলেন। গোপালচন্দ্র প্রতিভাগুণে অতি সুযোগ্য বিচারক বলিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ও তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী যখন সুপ্রসন্না হইলেন তখন তিনি "ডিষ্ট্রীক্ট এণ্ড সেসন্স জজ"-পদে অধিরূঢ় হইলেন। এই উচ্চপদের সম্মান তিনি কৃতিত্বসহকারে রক্ষা করিয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনে চিরকাল সুবিচার বিতরণ করার জন্য তাঁহারই সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক হাইকোর্টের জজপদে নিযুক্ত হইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তখন কঠিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন ও বহুমত্ররোগে ভুগিতে থাকেন। সকলেই তাঁহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি লইবার উপদেশ দেয়। তিনি অবসর লইলেন আর তাঁহারই স্থানে সরকার বাহাদুর Small Causes Courtএর জজ ৺হরিনাথ রায়কে হাইকোর্টের জজ পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার আরও দুই বৎসর চাকুরী করিবার বাকী ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই অবসর লইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

উন্নতি—District and Session Judge পদে নিযুক্ত।

হাইকোর্টের জজ হইবার কথাবার্ত্তা।

অবসর লইবার পরেই Lord Minto তাঁহার কর্ম্মপটুতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১৯১০ সালে "Rai Bahadur" উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই উপাধি তাঁহার কার্য্যাবলীর যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদানমাত্র।

Rai Bahadur উপাধি

গোপালচন্দ্র সরকার বাহাদুরের বিবিধ হিতসাধন করিয়াছেন।

সরকারের হিতসাধন।

তাঁহার লিখিত Police and its reforms নামক সন্দর্ভ অতি সুযোগ্য ও কার্য্যকারী বলিয়া সরকারের নিকট বিবেচিত এবং সমাদৃত হইয়াছিল। তাঁহার "Anarchy and Education" নামক প্রবন্ধও সুখপাঠ্য ও প্রকৃত উপদেশমূলক।

কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি আজীবন তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও একাগ্র ধর্ম্মবিশ্বাস-জনিত আচার পালন করিয়া আসিয়াছেন। নিত্যসন্ধ্যা ও পূজাবিধি তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন নাই ও সময়ের অকুলন বলিয়া পরিত্যাগ করেন নাই। "তিলক" ও "শিখা" দ্বারা শোভিত হইয়াই তিনি বিচারালয়ের সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিতে কখনও হাস্যাস্পদ হইবেন বলিয়া ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। এই বিষয়ে তিনি আদর্শ হিন্দুর জীবন চিরকাল বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদে বৈদেশিকতা কখনও লক্ষিত হয় নাই। জীবনে কখনও "টাই" পরেন নাই; এমন কি কেহ কখনও তাঁহাকে একখোলা কোট ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন কি না তাহা সন্দেহ। "Plain living and high thinking"—ইহাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

কর্ম্মজীবনে আদর্শ হিন্দুর জীবনযাপন।

কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে বহুস্থানে বহুলোকের ও নানাবিধ সমাজের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই তিনি বিবিধ স্থানীয় উন্নতি কল্পে স্বীয় শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। নীলফামারী, জাজপুর, পিংনা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার কৃত চেষ্টায় তত্রত্য জনসাধারণের জন্য পথ-ঘাট নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়াদি স্থাপন হওয়ায় সেই সকল স্থান

কর্ম্মক্ষেত্রে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান

তাঁহার নামকে অদ্যাবধি তাহাদের স্মৃতিপটে দেদীপ্যমান করিয়া রাখিয়াছে—তিনি তত্তৎ স্থানে অমর হইয়াছেন।

বিচারকের কার্য্যে কঠোর ও ন্যায্যবিচার-প্রাপ্তির যে দাবী প্রজাবৃন্দের আছে তাহা তিনি নিষ্কলঙ্কে দান করিয়া নিজেকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়াছেন।

গোপালচন্দ্র স্বীয় কর্ম্মস্থলে জনসাধারণের নিকট কত প্রিয় ছিলেন তাহা তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে এক স্থানে বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বসাধারণের প্রিয়

"২২ বৎসর পূর্ব্বে যখন রাজকার্য্য করিতাম তখন এই স্থানের বহরমপুরে) লোক আমাকে বিশেষ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতেন। [স্থা]নীয় সংবাদপত্রসমূহ আমার স্থানান্তর হইবার সময় আমাকে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা বেশ মনে আছে। বিদায়কালে জনসাধারণ কত ভালবাসা, আদর ও সমারোহের সহিত আমাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন তাহা জীবনে ভুলিবার নহে। আমার নামে বিদায়ী গান ও সংস্কৃত স্তোত্র যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা কানে এখনও বাজিতেছে। সেই অভিনন্দনের একটি বিশেষত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে "বিদায়" দেওয়া হইয়াছিল।

একটি বিশেষত্ব

চিরকাল গোপালচন্দ্রের ইহাই লক্ষ্য ছিল যে, নিরপেক্ষ বিচার করিব। এজন্য তিনি বহুপরিশ্রমসাপেক্ষ যত্নসহকারে, যথোচিত গবেষণা পূর্ব্বক তীক্ষ্ণদৃষ্টির সহিত বিচারকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। অনেক সময় তিনি উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দূষণীয় রীতির শাসন জন্য আপনার অধীন কর্ম্মচারী-

নিরপেক্ষ বিচার

বৃন্দের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন। ইহার ফলে এক সময়ে তাঁহার কতকগুলি শত্রু সৃষ্টি হইয়াছিল।

তিনি যখন কালীগঞ্জের মুনসেফ ছিলেন তখন তাঁহার গৃহে তাঁহার শত্রুবৃন্দ অগ্নিসংযোগ করে। এই গৃহদাহৎ-ব্যাপারে গোপাল-

বদ্ধজীবনে একটি দুর্ঘটনা

চন্দ্রের জীবন-নাশের আশঙ্কা হইয়াছিল কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন; তবে গোপালচন্দ্রের এই বিপৎকালে বহু অর্থ নষ্ট হয়।

বলা বাহুল্য যে, গোপালচন্দ্র ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত বা শোক-প্রাপ্ত হন নাই। "পূর্ব্বজন্মের পাপের সামান্য দণ্ড" ইহাই মনে করিয়া হাস্যবদনে এই বিপদ্ সহ্য করিয়াছিলেন।

গোপালচন্দ্র বহরমপুরের চতুর্থবার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির

ধর্ম্মজীবন

আসন হইতে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার এক স্থানে বলিতেছেন :—

"ধর্ম্মশিক্ষা না পাইলে কি বিষময় ফল হয় তাহা আমার নিজের জীবনেই বুঝিয়াছিলাম। জন্মার্জ্জিত সুকৃতি ছিল বলিয়াই ৩২ বৎসর বয়সে মনে হইল আমার স্বধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে। হঠাৎ অবসাদযোগ আসিল, মন অবসন্ন হইল এবং ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন "কুলগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর"। সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি নাই, শাস্ত্রে কি আছে কিছুই জানি না। একদিন একজন অতি বৃদ্ধ সাত্ত্বিকভাবাপন্ন দেবমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ আমার গৃহে অতিথিস্বরূপে আগমন করিলেন এবং ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই নাই বলিয়া আমার বিষাদের কথা শুনিয়া আমাকে গ্রহযাগ করিতে পরামর্শ দিলেন এবং নানা উপদেশ দিলেন। আহা সে প্রসন্নমূর্ত্তি ভুলিবার নয়! তাহার পরেই হাজীপুরে বৈতরিণী ক্ষেত্রে রাজকার্য্যে যাইতে হইল, তথায় আমার এক

সুহৃদের পরামর্শে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির "ধর্ম্মব্যাখ্যা" ও "ভবেবাধ" পড়িলাম। প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। একজন অধ্যাপকের নিকট গীতা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। গীতা পাঠের পর তাঁহারই চরণপ্রান্তে শ্রীমদ্ভাগবত এবং দর্শনশাস্ত্রের একটু আধটু পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে দেখিতে পাইলাম হায়! হায়, অমূল্য সময় হেলায় হারাইয়াছি।

উন্মাদের ন্যায়

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জনং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥"

ভগবদ্বাক্যানুসারে শারীর তপ আরম্ভ করিলাম। তপস্যা এক প্রকার কঠোরই হইতে লাগিল—হবিষ্যাশী হইলাম। গেরুয়া বসন লইলাম। কেবল কাছারীতে পোষাক পরিধান করিয়া যাইতাম। যখন শাস্ত্র জানিতাম না তখন আহার-বিহারের যথাবিধি নিয়ম ছিল না কিন্তু গীতা পাঠ করিয়া আহারযজ্ঞ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য যখন বুঝিলাম—

"আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকাপ্রিয়াঃ॥

প্রভৃতি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের কথা শুনিলাম তখন আমার চক্ষু ফুটিল। তখন রাজসিক ও তামসিক আহার পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার আরম্ভ করিলাম। যে শরীর এক সময়ে ব্যাধির মন্দির বলিয়া মনে হইত তাহা সাত্ত্বিক আহারের ফলে ক্রমে সুখের মন্দির হইয়া উঠিল। যাহা খাই তাহাই এখন অমৃত বলিয়া মনে হয়। রসনা এটা, ওটা, সেটার জন্য আর ব্যস্ত নাই ক্ষুধানিবৃত্তিজন্য যৎসামান্য আহারেই এখন পরিতৃপ্ত।

লোকে কথা তুলিল, 'আমি পাগল হইতেছি।" আমার এক

প্রিয়তম ইংরাজবন্ধু Davidson সাহেব আমাকে বুঝাইবার জন্য এক ইংরাজী Missionary পাদ্রীকে আনাইলেন। তিনি সকল শুনিয়া শেষে তর্কে না পারিয়া বলিলেন "আমি আপনার জন্য বড়ই দুঃখিত হইলাম। দেখিতেছি আপনি শীঘ্রই "ভাগবতিয়া" হইয়া স্ত্রীপুত্রকে ছাড়িয়া পাপের সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবেন।" আমি বলিলাম "আমার সে অদৃষ্ট নাই। সন্ন্যাসী হওয়া বড়ই কঠিন। উহা জ্ঞানযোগ ভিন্ন হয় না।" বন্ধুবান্ধবের কথা না শুনিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম বলিয়া যাহা বিশ্বাস—তাহা করা বন্ধ করিলাম না। গুরূপদেশ না লইয়াই প্রাণায়াম করত শেষে হৃদরোগে আক্রান্ত হইলাম। চিকিৎসা হইতে লাগিল। প্রাণায়াম কমাইয়া দিলাম।

প্রায় দুই বৎসর ভুগিয়া সারিলাম। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং পূজাপাঠ নিয়মিত চলিতে থাকায় দেখিতে দেখিতে আশাতীত ফল হইল। শরীর সুস্থ হইতে লাগিল। নানারূপ পারিবারিক কল্যাণ হইতে লাগিল। আমার হিন্দু আচার-ব্যবহার দেখিয়া বঙ্গেশ্বর লাট সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া জেলার জজ পর্য্যন্ত সকলেই শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। যেখানে যাই সেইখানেই সম্মান পাই। শৌচ ও আচার ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কোন কোন লোকে উপহাস করিতে লাগিল "লোকটার লেখাপড়া শিখিয়া কি শোচনীয় অবস্থা হইল! কি আশ্চর্য্য, তুলসীতলায় গড়াগড়ি দেয়। কি অধঃপতন!" আমি মনে মনে হাসিতাম। আমার ব্রত নিয়মিত চলিল। মনে কতই আনন্দ ভোগ করি। পত্নীও আমার প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরিবার মধ্যে সকলেই আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া ধর্ম্মপিপাসু হইতে লাগিল।" এই সময় গোপালচন্দ্র "সৎসঙ্গ" নামক মাসিক পত্রিকায় ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু সারগর্ভ সন্দর্ভাবলী লিখিতেন। "যজ্ঞোপবীত" "তিলক" ইত্যাদিপ্রবন্ধমালা হিন্দুসমাজের দিক্‌স্তম্ভস্বরূপ।

"সৎসঙ্গ" নামক মাসিক পত্রিকা

অবসর-জীবন

তাঁহার অবসর-প্রাপ্ত জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর হিসাব দিতে যাইলে ইহাই প্রধান বক্তব্য হইবে যে, তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত Theosophistএর মত পোষণ করেন। গীতার সেই মহাবাক্য "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র। প্রাত্যহিক আচার-

দৈনন্দিন কার্য্যাবলী

অনুষ্ঠানের মধ্যে শাস্ত্রপাঠেই তিনি এখন অধিক আনন্দ লাভ করেন। ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক গীতা পাঠ আরম্ভ করেন। পরে ৬ ঘটিকার সময় শৌচকৃত্যাদি সমাপনান্তে সন্ধ্যাহ্নিক, তর্পণ, দেবার্চ্চনা, এবং নিত্যহোম ইত্যাদিতে দ্বিপ্রহর বাজিয়া যায়। ভোজনান্তে এক ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করতঃ পুনরায় কখন কখন অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃতশাস্ত্রপুস্তক পাঠ বা কখনও নিজে ধর্ম্মগ্রন্থ ইত্যাদি পাঠ করিতে করিতেই গোধূলি কাল সমাগত হয়। তখন সন্ধ্যাদিতে পুনরায় নিবিষ্ট হন। বৃদ্ধ বয়সে আত্মচিন্তা ও ভগবদুপাসনা মনের সাধে করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতাস্থ স্বীয় ভবনে না থাকিয়া নিজের পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া কোলাহলশূন্য সুদূর দেশ চক্রধরপুরে এক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণসভার সভাপতি-পদে নিযুক্ত

তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস ও ন্যায়পরায়ণতা দর্শনে এবং তাঁহাকে এতাদৃশ ব্রাহ্মণের কঠোর ব্রত পালন করিতে দেখিয়াই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহাসভা ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর সভাপতির মাল্য তাঁহারই কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন। তার-যোগে তিনি যখন তাঁহার চক্রধরপুরের আশ্রমে এই সংবাদ পাইলেন তখন যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলেন। দুঃখিত হইবার কারণ তিনি অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, "গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষার জন্য যে মহাসভা ভূদেবগণ কর্ত্তৃক আহূত হইবে তাহাতে আমার মত শম-দম-

তপ-বিহীন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিকে সভাপতি করিবার প্রয়োজন হওয়ায় মনে হইল যে, বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ সমাজের দুর্গতি চরম সীমায় উপনীতপ্রায়। আশ্চর্যান্বিত হইবার কারণ আমার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা।' তারসংবাদ পাইবার সময় গোপালচন্দ্র অসুস্থ ছিলেন; সুতরাং ব্রাহ্মণ-সভার প্রস্তাবিত সম্মান-গ্রহণে অক্ষম হইলেন বলিয়া তার-যোগে উত্তর দিলেন। কিন্তু সভা তাঁহাকে ছাড়িলেন না।

"উৎসব" পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত পণ্ডিত রামদয়াল মজুমদার এম-এ মহাশয়ের পত্র লইয়া ব্রাহ্মণসভা গোপালচন্দ্রের চক্রধরপুরের আশ্রমে পণ্ডিত শরৎচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়কে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তখন "ব্রাহ্মণস্থ ব্রাহ্মণো গতিঃ" এবং "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" ভাবিয়া অক্ষমতা সত্ত্বেও স্বীকার করিলেন। বহরমপুরের চতুর্থবার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির আসন হইতে যে অভিভাষণ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন ইহা অনেক বিচক্ষণতার ফল। ইহাতে গোপালচন্দ্র বহু

তাঁহার অভিমত

যুক্তসহকারে কতকগুলি মন্তব্য আমাদের হিন্দুসমাজের কল্যাণার্থ প্রকাশ করিয়াছেন—এইসকল মন্তব্য তাঁহার ব্যক্তিগত নয়, শাস্ত্রানুমোদিত।

সংসারের ভোগেচ্ছা ও মায়ামমতা গোপালচন্দ্রের নাই বলিলেই হয়। ১৯১৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার তৃতীয় পুত্র বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চত্রিংশৎ বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। বীরেন্দ্র

সংসারের ভোগেচ্ছা-শূন্যতা ও ঔদাস্য।

গোপালচন্দ্রের অন্যান্য পুত্রগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠাবান, সদাচার-পরায়ণ ছিলেন। বীরেন্দ্র Shibpore Engineering Collegeএ Engineering Departmentএ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। পরে ৮০০০০ (আশী-হাজার) অশীতি সহস্র মুদ্রা লইয়া ইটের ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ"

বীরেন্দ্রের ও শিবমতী দেবীর মৃত্যু।

তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই বীরেন্দ্রনাথই কেবল গোপালচন্দ্রের পুত্র বলিয়া পরিচয়দানে যথার্থ উপযুক্ত। "যথা পিতা তথা পুত্রঃ"—উভয়েই ধার্ম্মিক, পরদুঃখকাতর, ঈশ্বরপরায়ণ। বীরেন্দ্রের গুণে তিনি মুগ্ধ ছিলেন। তজ্জন্যই বীরেন্দ্র তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। বীরেন্দ্রের জীবনের মূল মন্ত্র ছিল "পরের লাগিয়া আপন ভুলিয়া ধন্য কর নিজ জন্ম।" মৃতের সৎকার-করণ, আতুর ও দরিদ্রদিগকে বস্ত্র ও তণ্ডুল দান, রোগীর সেবাশুশ্রূষা এই সকল কার্য্যে তিনি অধিক আনন্দ পাইতেন। এই সকল কর্ম্মের জন্য তাঁহার প্রাণ অনুক্ষণ কাঁদিত। এতাদৃশ গুণরাশি সম্পন্ন উপযুক্ত সন্তানের মৃত্যুর পর গোপালচন্দ্র শোকে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই।

পদব্রজে যখন গোপালচন্দ্র পুত্রের শব সমভিব্যাহারে শ্মশানে যাইতেছিলেন, তখন কেহ তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুপাত হইতে দেখে নাই। পরন্তু গোপালচন্দ্র যখন মৃতপুত্রের চিতায় শুভ মুখাগ্নি করিতে যাইলেন তখন উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের গুণগান করিতে লাগিলেন নির্ব্বিকারভাবে মৃতের সৎকারার্থে সকল শুভকার্য্য হাস্যবদনে সম্পন্ন করিলেন। শ্মশানের দর্শকবৃন্দ গোপালের এই আচরণ নিস্তব্ধ হইয়া নিস্পন্দভাবে দেখিতে লাগিলেন।

গোপালচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা শিবসতী দেবীর ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহলীলা সাঙ্গ হয়। শিবসতী গোপালচন্দ্রের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা বলিয়া অত্যন্ত প্রিয়া ছিলেন। এমন কি শিবসতী বিবাহের পরেও অধিক সময়েই স্বীয়া পিতামাতার নিকট থাকিতেন। কিন্তু শিবসতীর মৃত্যুর পরেও তাঁহাকে আমরা একভাবেই দেখিয়াছি—ধীর, শান্ত, উদাস।

গোপালচন্দ্রের তামসিক স্পৃহা আর নাই। তিনি যে পথের

মানসিক স্পৃহাশূন্যতা

পথিক হইয়াছেন সেই পথ হইতে তাঁহাকে ফিরাইতে জগতের কোন প্রলোভনই আর সমর্থ হইবে না। গোপালচন্দ্র কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে Hill Tipperahর মহারাজা সার্দ্ধ সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতন দিয়া তাঁহাকে তাঁহার Manager নিযুক্ত করিতে

কতকগুলি প্রলোভন

স্বীকৃত হইলেও তিনি ঐ কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম হইলেন; সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে Swinhoe সাহেব তাঁহাকে Presidency Magistrate-পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু গোপালচন্দ্র Swinhoe সাহেবকে বলেন, "৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে নিজেকে রাজসেবায় নিমগ্ন রাখিয়াছিলাম এখন আমার সময় ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে, আমাকে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া নিষ্কৃতি দিন। জীবনের অবশিষ্ট যে কয়টা দিবস পড়িয়া আছে সে কয়টা দিন নিজেকে প্রাণমন দিয়া ঈশ্বরের চিন্তায় ডুবাইতে চাই। আশা করি, আমার এই প্রার্থনা আপনারা রক্ষা করিবেন।" এই একই কারণে গোপালচন্দ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ-গ্রহণে অপারগ হইয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলেই তিনি সদস্যস্বরূপ তৎকালীন লাট সাহেব স্বর্গীয় Sir Edward Baker কর্ত্তৃক মনোনীত হইতে পারিতেন। গোপালচন্দ্র আর যশ, অর্থ, সম্মানের কাঙাল নহেন। তিনি ঈশ্বরপ্রসাদ-লাভের ভিখারীমাত্র। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে কেবল তাঁহার ঐ একমাত্র চিন্তা। গোপালচন্দ্র যখন বারাণসীধামে বাস করিবেন এই মনস্থ করিলেন

বানপ্রস্থাবলম্বী হইবার ইচ্ছা

তখন তাঁহার এই শুভকামনার কণ্টকস্বরূপ তাঁহার পুত্রগণ দাড়াইল। শুভকোষ্ঠী গণনার ফলে ইহাই গণিত হইয়াছে যে, তীর্থভ্রমণকালে তীর্থধামেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। তজ্জন্য তাঁহার পুত্রগণ গোপালচন্দ্রের এই উপযুক্ত বৃদ্ধ বয়সে একাকী

সুদূর বারাণসীধামে আত্মীয়স্বজনপরিত্যক্ত হইয়া যাইতে দিতে বিরোধী হন। কিন্তু প্রাণ যাহার ছুটিয়াছে তাহাকে বাধা দেয় কে? অন্যান্য সময়েও এইরূপ প্রতিরোধ হওয়া সত্ত্বেও গোপালচন্দ্র স্বীয় পত্নী সমভিব্যাহারে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, এবারেও তিনি এই সকল বাধা-বিঘ্ন ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বারাণসীধামে শেষ জীবন কাটাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আজ তিনি পবিত্র বারাণসী-বাসী ব্রাহ্মণ পবিত্র বারাণসীধামে স্বীয় সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে ভগবৎ চিন্তায় নিজের জীবনের অবশিষ্ট অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছেন ও পরকালের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। যে সময়টুকু ভগবদুপাসনা অথবা সৎ শাস্ত্রপাঠে ব্যয় না হয় তাহাই সময়ের অপব্যয় হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হয়। দ্বাত্রিংশৎ বৎসর হইতে অদ্য চতুঃসপ্ততি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি অব্যবহিত ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন। সাধুসেবা করিয়া গোপালচন্দ্র জীবনে কত আনন্দ পাইতেন তাঁহার সভাপতির অভিভাষণের উপসংহারে একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—

গোপালের সাধুসেবা

"কলিকাতা বেদবিদ্যালয় দেখিয়া বড় ইচ্ছা হইল তাহার অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাই। অধ্যাপকগণের আদেশমত বিশেষ বিশেষ খাদ্যের আয়োজন যত্নসহকারে করিলাম। খাইতে বসিবার পূর্ব্বে তাঁহারা পাদপ্রক্ষালন করিতে যাইলেন। একজন প্রবীণ ছাত্র বলিলেন, যদি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল চাহেন, তাহা হইলে আপনি স্বয়ং পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দিন। আপনার স্ত্রী জল ঢালিয়া দিন ও আপনি পা ধুইয়া দিন। তখন গ্রীষ্মকাল ও প্রখর রৌদ্র। আমি সেই রৌদ্রে বসিলাম। অধ্যাপকগণ এক ভৃত্যকে আমার মস্তকে ছত্র ধরিতে বলিলেন। আমার স্ত্রী জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন এবং আমি ব্রাহ্মণগণের অর্থাৎ ক্ষুদ্র বালকটির পর্য্যন্ত ভক্তি-

সহকারে পা ধুইয়া গামছা দিয়া মুছিয়া দিলাম। এ কার্য্যে অনেকক্ষণ সময় লাগিল। আর কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক মনে বড়ই আনন্দ হইল। শেষে তাহাদের প্রত্যেকের ললাটদেশ চন্দন দিয়া শোভিত করিয়া অর্ঘ্য প্রণাম করিলাম। শেষে তাঁহারা যখন আহার করিতে লাগিলেন আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী আহার পরিবেশন করিতে লাগিলাম আহার শেষ হইবার পর তাঁহাদের দক্ষিণা দিয়া প্রণাম করিলাম।

অধ্যাপকগণ ও প্রবীণ ছাত্রটি খুব আশীর্ব্বাদ করিলেন। পা ধুইয়া দিবার সময় তাঁহারা কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন তাহা জানি না তবে সেই মন্ত্রে আমার শরীর কণ্টকিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বদিবসে আমার পেটের অসুখ হইয়াছিল। তজ্জন্য উপবাসী ছিলাম। সেইদিন অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলাম কিন্তু কোন কষ্ট বোধ হইল না। রাত্রিতে রক্ত আমাশয় দেখা দিল আত্মীয়বর্গ উপহাস করিয়া বলিলেন "ব্রাহ্মণভোজনের কেমন ফল পাইতেছেন?" আমি বলিলাম "ভাগ্যে উহা করিয়াছিলাম—তাই আমি এ আমাশয়ে প্রাণ হারাইব না। আমার মনে হইতেছে ঐ যজ্ঞের ফলে ও সৎ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আমি সারিয়া যাইব।' তাহাই ঘটিল, পীড়াটি একটু কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু সহজেই সারিয়া উঠিলাম। এই ঘটনার পর হইতে আমি যখনই ব্রাহ্মণভোজন করাইয়াছি তখনই ব্রাহ্মণগণের পা স্বয়ং ধুইয়া দিয়া থাকি। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা আমার অনুগ্রহপ্রার্থী তাঁহারা আমার কার্য্যে বড়ই সঙ্কুচিত হন, কিন্তু আমি ছাড়ি নাই এবং তাহার ফলে আমি যে কত আনন্দ পাই তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।" আজ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে একবার এইভাবেই তিনি সাধুসেবা করিয়া থাকেন—তাহা তাঁহার বাৎসরিক জন্মতিথি উপলক্ষে।

গোপালচন্দ্র দুঃখের দুঃখী—তিনি আতুর ও দীন-দুঃখীর পরিবারে

আতুর ও দরিদ্রের প্রতি দয়া।

চিকিৎসার অভাব হয় বুঝিলেন—এই অভাব মোচনার্থে তিনি নিজেই তৎপর হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গরীব-দুঃখীদের ঔষধ বিতরণ করিতেন ও আশ্চর্য্য এই যে,যেখানে তিনি গিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার চিকিৎসায় হাতযশ হইত।

গোপালচন্দ্রের বাৎসরিক জন্মতিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসর ব্রাহ্মণ বিদায় ও ভিখারী বিদায় হইয়া থাকে। এই ব্যাপারে বহু অর্থব্যয় হয়—অন্ধ, খঞ্জ, জীর্ণ, রুগ্ন ব্যক্তি ও ভিখারীদের মধ্যে বস্ত্র ও তাম্রমুদ্রা, বিতরণ করা হয়।

দান।

গোপালচন্দ্রের দান অপরিমিত তাঁহার দ্বার হইতে কখন কোনও ব্যক্তি অর্থ সম্বন্ধে প্রত্যাভিলাষী হইয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যান নাই। গরীব ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিংবা বিদ্বান্ পণ্ডিত যে কত তাঁহার মাসিক বা বার্ষিক বৃত্তিভোগী, তাহা বলা যায় না। তিনি বহু সদনুষ্ঠানে বহু অর্থ দান করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য শিবপুর স্কুলে ৫০০ শত মুদ্রা দান।

সঙ্গীত রচনা

গোপাল যখন দুঃখে ও শোকে কষ্ট পাইয়াছেন তখনই তিনি অভিমানসূচক গানসমূহ স্বয়ং রচনা করিয়া গাহিয়াছেন। তাঁহার স্নেহ-উদ্বেলিত ভাব-মধুর গানগুলি যখন তিনি গাহিতেন তখন তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইত। বড়ই সুখের বিষয় যে, গোপালচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল শীঘ্রই তাঁহার পিতার গানসমূহ একত্র সঙ্কলিত করিয়া মুদ্রিত করিবেন।

শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতাবলী

তিনি শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করিয়া এক সময় তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মন মাতাইয়াছিলেন — তাহার সঙ্গীতে কালীদেবী স্নেহময়ী মাতার ন্যায় চিত্রিতা হইয়াছেন।

গোপালের পুত্রগণ

উপসংহারে গোপালচন্দ্রের পুত্রদিগের বিষয় সামান্য কিঞ্চিৎ লিখিয়া আমরা তাঁহার জীবনী শেষ করিব।

গোপালচন্দ্রের সাতটি পুত্র ও তিনটি কন্যা; কন্যাত্রয়কে তিনি সৎ-পাত্রস্থ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ কন্যার একমাত্র পুত্র শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এস-সি, বি-এল কলিকাতা St. Xavier's College এর অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। পুত্রসকলের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ। ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এল্-এম্-এস্ পাশ করিয়া শিবপুরের স্বনামধন্য ডাক্তার দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের নিকট হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা লাভ করেন। পরে হাবড়ায় প্রথমে ডাক্তারী আরম্ভ করেন ও তথায় অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা যখন কলিকাতায় নূতন বাড়ী ক্রয় করিলেন তখন যতীন্দ্রনাথ হাবড়া পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চিকিৎসা আরম্ভ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। আজ যতীন্দ্রনাথের ২৫ বৎসরের অধিক বিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎ-সকদিগের মধ্যে ও কলিকাতার জনসাধারণের নিকট তাঁহার নাম ও যশ কাহারও নিকট অপরিচিত নাই। যতীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরের ৺জ্যোতি-প্রসাদ রায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। এই বিবাহে গোপালচন্দ্র কৃষ্ণনগরের বর্ত্তমান মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর মহাশয়ের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ।

মধ্যম পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ Presidency College হইতে M. A. পাশ করিয়া ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট-পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার এখন বিংশ বৎসরের অধিক কর্ম্ম হইল। কর্ম্মক্ষেত্রে তিনিও সরকার বাহাদুরের নিকট একজন প্রবীণ ও কর্ম্মক্ষম কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বিলাতের Wembly Exhibitionএ কর্ম্ম উপলক্ষে যাইতে হয়। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি ইউরোপের সকল দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

তৃতীয় পুত্র বীরেন্দ্রনাথ Shibpur Engineering Collegeএ শিক্ষার্থে প্রবেশ করেন। তিন বৎসর Engineering বিভাগে শিক্ষা-লাভ করিয়া পরে ইটের ব্যবসা করিবার জন্য বহু অর্থ লইয়া প্রথম কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কঠিন পরিশ্রম করায় তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় উপার্জ্জিত অর্থে উত্তরপাড়ায় এক বৃহৎ বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শিবপুর ও চক্রধরপুরে কিছু জমিজমাও ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ৩৫ বৎসর বয়সে তাঁহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর হইতেই মন্দাকিনী দেবীর স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বীরেন্দ্রনাথ ৺মহারাজা রামনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর মহাশয়ের দৌহিত্রী এবং রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী ব্রজরাণী দেবীর শুভ পাণিগ্রহণ করেন।

চতুর্থ পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ Presidency Collegeএ পাঠ করিতেন পাঠ্যাবস্থা সমাপনান্তে তাঁহার অগ্রজ বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ব্যবসা করিতে বলেন; নৃপেন্দ্রনাথের ব্যবসায়ে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি ব্যবসায় লোকসান দেন ও পরে ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া পুলিশ বিভাগে কর্ম্মানুসন্ধান করেন। পরে তিনি C. I. D. বিভাগে Inspector of Police-স্বরূপ Bengal Policeএ নিযুক্ত। নৃপেন্দ্র Asst. Surgeon ডাক্তার যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী বেলাদেবীকে বিবাহ করেন।

পঞ্চম পুত্র রাঘবেন্দ্রনাথ বি-এ পাশ করিয়া ১৯১৭ খৃঃ অব্দে Deputy Superintendent of Police নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার বিভাগে সকলেরই শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন ও কর্ম্মস্থলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সুযোগ্য কর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় দশ বৎসরের মধ্যেই এক বৎসর রংপুর জেলার

Additional Superintendant of police স্বরূপ কার্য্য করার সুযোগ তাঁহার আসিয়াছিল। রাঘবেন্দ্রের সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে,মাত্র সাত বৎসর কর্ম্ম করার পর তিনি King's Police Medal পাইয়াছেন। পুলিশ-বিভাগে ইহা অপেক্ষা সম্মান কিছুই নাই; পুলিশ-বিভাগে কর্ম্ম করিতে করিতেই তিনি B. L. (আইন) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ছাত্রজীবনে রাঘবেন্দ্র ছাত্রসমিতির নেতা ছিলেন। রাঘবেন্দ্রের আর একটি বিশেষত্ব তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা। কলিকাতা হাইকোর্টের Chief Justice Sir Lancelot Sanderson, বঙ্গের গবর্ণর Lord Carmichael এবং Burmaর Governor Sir Hartcourt Butler প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিগণকে যখন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হইতে অভিনন্দন করা হইয়াছিল তখন রাঘবেন্দ্র বক্তৃতা দিয়া শ্রোতৃবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা পাইয়াছিলেন। রাঘবেন্দ্র ভূতপূর্ব্ব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার Vice-President Babu Surendra Nath Royর দৌহিত্রী ও রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী সরমাদেবীকে বিবাহ করেন।

ষষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রনাথ অতি শৈশবে মারা যান। এই পুত্রকে হারাইয়া গোপালচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাদিগকে আর একটি পুত্র উপহার দেন।

সপ্তম পুত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ Presidency College হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের M.A. পরীক্ষায় ১৯২২ সালের প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় University Jadunath Mahalaxmi Silver Medal পাইয়াছেন। শচীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অগ্রজ রাঘবেন্দ্রের ন্যায় তাঁহার সমসাময়িক সকল কলেজের ছাত্রদিগের সহিত অবিরত পরিচিত। ছাত্রসমিতি পরিচালিত সকল

সংকর্ম্মেই তাঁহাকে আমরা তৎপর থাকিতে প্রায়ই দেখিয়া থাকি। শচীন্দ্রনাথ আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের উকীল হইয়াছেন ও স্বীয় অধ্যবসায়ের ফলে অল্প সময়েই সুযোগ্য উকীল বলিয়া পরিচিত। শচীন্দ্রনাথ অসহযোগ সমিতির নেতা, কংগ্রেসের Secretary, মেদিনীপুর অন্তর্গত জাড়ার জমিদার সাতকড়িপতি রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধীরপতি রায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন।

গোপালচন্দ্রের সংসারে মা লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর কৃপা সমপরিমাণেই বিতরিত। পৌত্র, দৌহিত্র, প্রদৌহিত্র ইত্যাদিতে তাঁহার বংশ পরিপূর্ণ। গোপালচন্দ্র যে বৃদ্ধবয়সে তাঁহার নিম্নতন চারি পুরুষ দেখিয়া যাইতেছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। সর্ব্বাপেক্ষা সুখের বিষয় যে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী আজিও বর্ত্তমান। পরমেশ্বর গোপালচন্দ্রকে আরও দীর্ঘজীবন দান করুন, ইহাই আমাদের কাতর ও আন্তরিক প্রার্থনা। জগদীশ্বর তাঁহার কোন বাসনাই অতৃপ্ত রাখেন নাই ; ধন, যশ, সম্মান সকলই তিনি কর্ম্মজীবনে পাইয়াছেন। সৌভাগ্যবতী মন্দাকিনী তাঁহার সেবায় অদ্যাবধি নিযুক্ত। অধিকন্তু "পঞ্চপাণ্ডবের" ন্যায় পাঁচটি পুত্র তাঁহার বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। এই সকল পুরস্কারের জন্য গোপালচন্দ্র ভগবানের নিকট চিরঋণী—চিরকৃতজ্ঞ।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ-তালিকা
৺রামেশ্বর
৺রামনাথ
৺রামজীবন
৺কৃষ্ণরাম
৺রামপ্রসাদ
৺নৃসিংহনাথ
৺রুক্মিণীনাথ
৺হরিনাথ
৺দীননাথ
৺চন্দ্রনাথ
৺নবীন
ললিতকুমার
গোপাল
৺মহেন্দ্র
৺যোগীন্দ্র
চারুচন্দ্র
৺সনৎ
৺উপেন
নরেন
প্রসাদ
জীবন
ভূষণ
বৈদ্যনাথ
বিশ্বনাথ
৺বলেন্দ্র
ভূপেন্দ্র
শৈলেন্দ্র
দ্বিজেন্দ্র
র
যতীন্দ্র
জ্ঞানেন্দ্র
৺বীরেন্দ্র
নৃপেন্দ্র
রাঘবেন্দ্র
শচীন্দ্র
গিরীন্দ্র
জীতেন্দ্র
ধীরেন্দ্র
বরীন্দ্র
সত্যেন্দ্র
সৌরেন্দ্র
সুধীন্দ্র
সোমেন্দ্র
রথীন্দ্র
ঋষীন্দ্র
কমলেন্দ্র
রমেন্দ্র
ক্ষিতীন্দ্র
রবীন্দ্র
দেবেন্দ্র
হিতেন্দ্র
অতীন্দ্র

স্যর নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যর নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বড় বেলুনে বাস করিতেন। প্রপিতামহ ৺রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বননব গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনিই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এখানে তিনি তালুকাদি অর্জ্জন করেন। নলিনীরঞ্জনের পিতামহ ৺ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জজ কোর্টের খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মে বিশেষ নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। জীবনের শেষ নয় বৎসর তিনি ৺কাশী বাস করিয়াছিলেন। সেইখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। ত্রিলোচনের দ্বিতীয় ভ্রাতা নীলকণ্ঠ মুন্সেফ ছিলেন এবং বহুদিন সুখ্যাতির সহিত ঐ কাজ করিয়াছিলেন। ত্রিলোচনের চতুর্থ ভ্রাতা গোপালচন্দ্র বর্দ্ধমানের মহারাজার হুজুরি সেরেস্তাদার ছিলেন। পরে স্বীয় কার্য্যদক্ষতা গুণে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন। তিনি একনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন এবং একটি শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নলিনীরঞ্জনের প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা সকলেই সাধক ছিলেন। পিতামহ বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই অর্থে বহু লোককে প্রতিপালন করায় অধিক টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। নলিনীরঞ্জনের পিতার নাম সারদাপ্রসাদ। তিনি প্রথমে মুন্সেফ ছিলেন, পরে সবজজের কার্য্যে উন্নীত হইয়া বিচারকার্য্যে বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং নানা শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচটি শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং দেবকার্য্যে ও দুর্গোৎসবাদির জন্য ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

স্যার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ত্রিলোচনের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বৰ্দ্ধমান জজ-আদালতে ওকালতী করিয়াছিলেন এবং অল্প বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন। ত্রিলোচনের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র হংসেশ্বর বৰ্দ্ধমানে ওকালতী করিতেছেন। সারদা-প্রসাদের ছয় পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম জ্ঞানরঞ্জন, ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে অনেকদিন ওকালতী করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় নলিনীরঞ্জন; তৃতীয় শরৎরঞ্জন; ইনি উকিল; চতুর্থ ৺সতীশরঞ্জন ইনি মুন্সেফ ছিলেন, পঞ্চম ৺ দক্ষিণারঞ্জন, ষষ্ঠ যোগেশরঞ্জন।

নলিনীরঞ্জন ১২৭৩ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংরাজী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিংশ বৎসর বয়সে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম বিভাগে অনারের সহিত বি-এ পাশ করেন এবং ১৮৮৭ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম্-এ ও ১৮৮৮ সালে প্রথম বিভাগে বি-এল পাশ করেন। ১৮৮৯ সাল হইতে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। দ্বাবিংশতি বর্ষকাল বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ওকালতী করিবার পর ১৯১০ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাকে "নাইট" উপাধি প্রদান করেন। ১৯২৫ সালের আগষ্ট মাস হইতে তিনবার প্রধান বিচারপতির পদে কার্য্য করিয়া ১৯২৬ সালে নভেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েসনের সভাপতি এবং Cow Preservation League এর সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। স্তর নলিনীরঞ্জন নিজ গ্রামে একটী মধ্য ছাত্রবৃত্তি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন।

নলিনীরঞ্জন পিতৃ-পিতামহের অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছেন। ইনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। ইনি বীরভূম জেলার পাঁচরা গ্রামনিবাসী জমিদার ৺রাজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার পাঁচটি পুত্র।

জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম কামদাকুমার; দ্বিতীয়ের নাম হরকুমার; তৃতীয়ের নাম অনুজকুমার; চতুর্থের নাম সুধীরকুমার ও পঞ্চমের নাম প্রফুল্ল-কুমার। কামদাকুমার বীরভূম জেলার পার্ব্বতীপুর গ্রাম-নিবাসী বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। হরকুমার উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী এবং শ্রীযুত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। নলিনীরঞ্জনের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ রাজসাহী জেলার মহাদেবপুরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র চৌধুরীর সহিত হয়। দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয় কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক রায় সাহেব গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র মুন্সেফ শ্রীযুত চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত।

নবগ্রাম চট্টোপাধ্যায়-কুলপঞ্জিকা।

মধু চট্টোপাধ্যায় (খড়দহ)
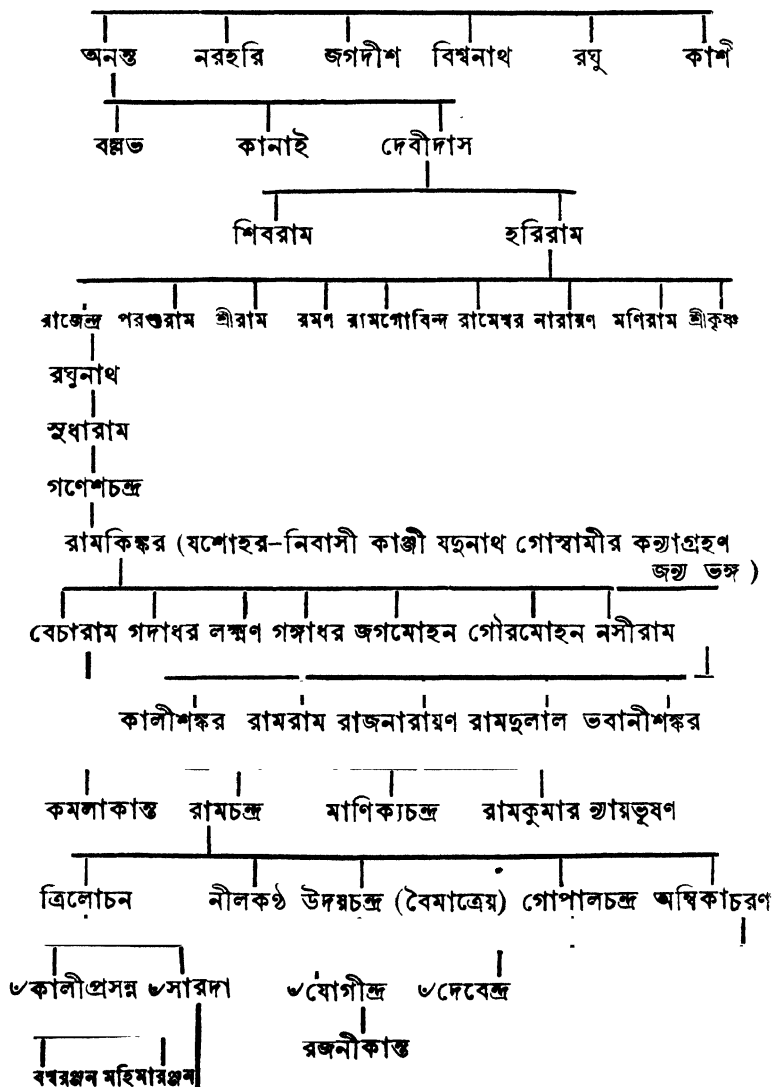
৺মৃত্যুঞ্জয় ৺বনমালী

যতীন্দ্র ধরণীন্দ্র ৺শচীন্দ্র

৺জ্ঞানরঞ্জন নলিনী শরৎ ৺সতীশ দক্ষিণারঞ্জন যোগেশ

কামদা ৺বদী (কন্যা) হরকুমার রাজেশ্বরী

অনুজা ইন্দিরা সুধীর প্রফুল্ল

অন্নপূর্ণা কন্যা) সত্যেন্দ্রনাথ

ইন্দুভূষণ সুবদিনী ৺শশীভূষণ সুলোচনা কনকবরণী

৺বরদানন্দ ৺জগদানন্দ ৺অঘোরানন্দ ৺হরিষানন্দ

৺দেবাদিদেব গুরুপদ সত্যপদ তারাপদ শ্যামাপদ

ভূদেব ৺শিবপদ উমাপদ

[illegible]ত্রনাথ ৺বিশ্বেশ্বর হংসেশ্বর

[illegible]বীন্দ্র ভুপেন্দ্র নৃপেন্দ্র গিরীন্দ্র শৈলেন্দ্র অমরেন্দ্র সৌরীন্দ্র

স্বর্গীয় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।

বাঙ্গালীর ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের প্রথম সময় কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে দ্বারকানাথ, হরিশ্চন্দ্র ও কেশবচন্দ্রের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনীতিক আলোচনায় হরিশ্চন্দ্র, বাগ্মিতায় কেশবচন্দ্র এবং বিচারে ও আইন-অভিজ্ঞতায় দ্বারকানাথ তদানীন্তন বঙ্গসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব পরিচয়

হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাইয়ের নিকটস্থ কলাছাড়া নামক গ্রামে দ্বারকানাথের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন। এখনও সেই গ্রামে দ্বারকানাথের পৈতৃক বিগ্রহ এবং ভদ্রাসন বর্ত্তমান আছে। দ্বারকানাথের প্রপিতামহ ৺হরেকৃষ্ণ মিত্র বর্দ্ধমান রাজসরকারে কাজ করিতেন। তিনি আম্‌তার নিকট আগুনসীতে নূতন বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। এই আগুনসীই দ্বারকানাথের জন্মস্থান। দ্বারকানাথের পিতার নাম ৺হরচন্দ্র মিত্র; হরচন্দ্রের চারি পুত্র ও চারি কন্যা; তন্মধ্যে দ্বারকানাথই জ্যেষ্ঠ। হরচন্দ্র হুগলীতে মোক্তারী করিতেন। তিনি পারশী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। হুগলীতে তাঁহার বিশেষ পসার ও প্রতিপত্তি ছিল। হরচন্দ্র বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিতেন বটে, কিন্তু দীন-দুঃখী-আশ্রিত-বৎসল ছিলেন বলিয়া এবং উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ হিন্দুজনোচিত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যয় করিতেন বলিয়া তিনি মৃত্যুকালে কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, বরং কিছু দেনা করিয়াই গিয়াছিলেন। কাজেই পিতার মৃত্যুর পর বালক দ্বারকানাথ বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে দ্বারকানাথের বয়স মাত্র ১৬।১৭ বৎসর।

১২৪০ সালে দ্বারকানাথ জন্মগ্রহণ করেন। দ্বারকানাথের বয়স যখন সাত বৎসর তখন হরচন্দ্র তাঁহাকে নিজ কর্ম্মস্থল হুগলীতে লইয়া যাইয়া তথাকার ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। তৎপর হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে তের বৎসর বয়সের সময় ভর্ত্তি হন। চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দ্বারকানাথ জুনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৮৲ টাকা করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৪৯ সালে দ্বারকানাথ কলেজের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাণী কাত্যায়নী-প্রদত্ত মাসিক আঠার টাকার একটি বৃত্তি-লাভ করেন এবং তাহার পর বৎসর সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি পান। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ পরীক্ষায় বাঙ্গালার সমুদায় কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়া উচ্চতম ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায় দ্বারকানাথ পুনরায় ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তাঁহার ইতিহাস ও রচনার উত্তরে এরূপ সারগর্ভতা ছিল যে, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা ছাপাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় দ্বারকানাথ মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি ও ডেবিড মণির স্বর্ণ-পদক পুরস্কার পান। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ পুনরায় ৪০৲ টাকা বৃত্তি ও বিবি মণি প্রদত্ত এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। অতঃপর মেডেল পরীক্ষায় দ্বারকানাথ উত্তীর্ণ হইয়া মেডেল লাভ করেন। তাঁহার এই মেডেল পরীক্ষার জন্য লিখিত রচনা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, ১৮৫৪-৫৫ সালের শিক্ষা-বিভাগের বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতে শিক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক তাহা প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচনা কাপ্তেন রিচার্ডসনও Literary Gazette পত্রিকায় ছাপাইয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

বাল্যপরিচয়

দ্বারকানাথ সাহিত্যে যেরূপ সুপণ্ডিত, গণিতবিদ্যাতেও তেমনি

ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি কলেজে অধ্যয়নকালেই নিজে নূতন নূতন তথ্য বাহির করিয়া অঙ্ক কষিতেন। ইংরাজী ভাষায় দ্বারকানাথের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। স্যার লুই জ্যাক্সন লিখিয়াছেন—"Amongst his more brilliant qualities, was his surprising command of English Language". দ্বারকানাথের অতি অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল। তিনি একবার পূজার সময় একবারমাত্র চণ্ডীপাঠ শুনিয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া তথায় স্ত্রীলোকদিগের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত মুখস্থ বলিয়াছিলেন!

দ্বারকানাথ অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। হাইকোর্টে ওকালতীকালে তিনি যখন বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইতেন তখন বিচারপতি হইতে সামান্য কেরাণী পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেন।

ছাত্রজীবনে দ্বারকানাথ দিনের বেলায় বড় একটা পড়িতেন না। নিশীথের নির্জ্জন সময়ে গ্রীষ্মকাল হইলে নদীতটে চন্দ্রালোকে বসিয়া বালক দ্বারকানাথ পাঠাভ্যাস করিতেন। প্রায়ই তিনি পড়িতে পড়িতে সেই নদীতটেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। যাঁহারা সেই সময় চুঁচুড়া ঘাটে প্রত্যূষে স্নান করিতে যাইতেন তাঁহারা প্রায়ই তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে পাইতেন। তাঁহার সহপাঠীরা কিন্তু এবিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিত না, কাজেই পরীক্ষার ফল বাহির হইলে যখন প্রতি পরীক্ষাতেই দ্বারকানাথ প্রথম স্থান অধিকার করিতেন, তখন সহপাঠীরা একেবারে ইহা ভাবিয়া আকুলই হইয়া পড়িতেন যে, না পড়িয়া না শুনিয়া দ্বারকানাথ কিরূপে পরীক্ষায় এরূপ উচ্চাসন লাভ করিলেন। দ্বারকানাথ পিতার মৃত্যুর পর একমাত্র বৃত্তির দ্বারা সংসার চালাইয়া নিজের পড়াশুনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু শুধু বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া ক'দিন চলে? কাজেই

দ্বারকানাথকে চাকুরীর অন্বেষণে কলিকাতায় আসিতে হইল। কলিকাতা কমিসরি-জেনারেল কর্ণেল রামসের আফিসে কতকগুলি অল্প বেতনের কেরাণীর পদ খালি ছিল, দ্বারকানাথ সেই অফিসে যাইয়া দারোয়ানের নিকট আপন অভিপ্রায় জানাইবামাত্র দারোয়ান অতি রুক্ষ ও তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল, "হামারি হিঁয়া কৈই কাম খালি নেহি হ্যায়।" দারোয়ানের এই কথা শুনিয়া দ্বারকানাথ নিজেকে অত্যন্ত অবমানিত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ মনে করিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,আর কখনও কোন চাকুরীর জন্য কাহারও নিকট উমেদারী করিবেন না। এই দিন হইতে দ্বারকানাথের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়, তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। তিনি আইন শিখিবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। এখন তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়ায় তিনি অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। এই সময়ে কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরচাঁদ মিত্রের এজলাসে একটি কেরাণীর কাজ খালি হয়, কিশোরচাঁদ দ্বারকানাথকে অনেক অনুরোধ করিয়া আনিয়া ১২০৲ কুড়ি-টাকা বেতনে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু আইন পড়া দ্বারকানাথ বন্ধ করিলেন না। একমাস আটদিন মাত্র কাজ করিয়া তিনি হঠাৎ একদিন পুলিশ কোর্টের সাহেব ইণ্টারপ্রিটারের কথায় একটু অবমানিত বোধ করিয়া আদালতের মধ্যেই কলম সজোরে ফেলিয়া দিয়া তখনই আদালত হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। অতঃপর কিছুদিন স্বগৃহে থাকিয়া একাগ্রমনে আইন অধ্যয়ন করিয়া দ্বারকানাথ ১৮৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে "কমিটি" পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বারকানাথ সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। নব্য উকিল হইলেও তিনি অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ

ওকালতী আরম্ভ

পসার ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। সে সময়ে রমাপ্রসাদ রায় ও শম্ভূনাথ পণ্ডিত সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান উকিল ছিলেন। ইঁহাদের চেষ্টায় নবীন উকিল দ্বারকানাথ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ক্রমে তাঁহার আইন-জ্ঞানের যশঃ চতুর্দ্দিকে এরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, তিনি ব্রিফ দেখিবারই সময়ই পাইতেন না। দ্বারকানাথ অল্পদিনের মধ্যে দেখিতে দেখিতে উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন। ওকালতীতে পশার ও যশঃ এত বৃদ্ধি পাইল যে, বাঙ্গালার একসীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রশংসা চলিতে লাগিল। বিচারপতি হইতে বড় বড় মক্কেলগণ পর্য্যন্ত তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

১৮৬২ সালে সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত মিলিত হইয়া হাইকোর্ট সংস্থাপিত হয়। ফলে ভাগ্য-লক্ষ্মীও দ্বারকানাথের প্রতি সুপ্রসন্না হন। বড় বড় যত কিছু মোকদ্দমা দ্বারকানাথের নিকট আসিতে লাগিল। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস পিকক বুঝিতে পারিলেন যে, দ্বারকানাথ নিতান্ত সামান্য উকিল নহেন, তাঁহার ভিতর তেজস্বিতা, মনস্বিতা, প্রতিভা ও সাধুতা রহিয়াছে। দ্বারকানাথ কিরূপ প্রতিভাশালী উকিল ছিলেন, তাহা তদানীন্তন এড্‌ভোকেট জেনারেলের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—Threc is no getting a case against Dwarakanath দ্বারকানাথের ওকালতীতে এরূপ পসার হইয়াছিল যে, তিনি যদি এক দিনের জন্যও উদ্যান-বাটীতে যাইতেন,তাহা হইলে সেখানে তাঁহার মক্কেলগণ তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য ছুটিত। বাক্‌পটুতায় দ্বারকানাথ যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহার যুক্তি ও তর্ক সেই প্রকার অকাট্য ছিল। দ্বারকানাথের এক বড় মুদ্রাদোষ ছিল। হাইকোর্টে বক্তৃতাকালে তিনি একটি পেন কলম হাতে লইয়া তাহা মোচড়াইতেন, যদি কলম ভাজিয়া

যাইত, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকানাথেরও বক্তৃতার স্রোত বন্ধ হইয়া যাইত। এই কারণে তিনি যখন বক্তৃতা করিতে উঠিতেন, তখন একটি লোক একগোছা পেন কলম লইয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকিত এবং একটি কলম ভাঙ্গিবামাত্র অমনি আর একটা তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিত। কলিকাতা হাইকোর্টে পনর জন জজের নিকট একটি দাসীর মোকদ্দমা (Rent case) হয়। সেই মোকদ্দমায় দ্বারকানাথ দরিদ্র প্রজা ঠাকুরাণী দাসীর পক্ষ বিনা পারিশ্রমিকে গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তিনি যে বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় দেন তাহাতে সমস্ত দেশ একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়া পড়ে। সাত দিন দ্বারকানাথ সমভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জজ, ব্যারিষ্টার. উকিল ও দর্শকগণ সকলেই তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার যশঃ ঘোষণা করিতে থাকেন। ভারতের ও ইংলণ্ডের সমস্ত সংবাদপত্রে শতমুখে তাঁহার প্রশংসাবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মোকদ্দমায় দ্বারকানাথের সূক্ষ্ম তর্ক ও অকাট্য যুক্তি দেখিয়া প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস পিকক তাঁহাকে হাইকোর্টের বিচারপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সে ১৮৬৭ সালের কথা, তখন হাইকোর্টের জজীয়তী এক শম্ভুনাথ পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে হয় নাই। হাইকোর্টের জজ তখন একটা দেখিবার, বলিবার ও শ্লাঘা করিবার বিষয় ছিল। ১২৭৪ সালের ২৫শে আষাঢ় তাঁহার জজ-পদপ্রাপ্তিতে 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—"বাবু দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। উকিলদল হইতে লোক মনোনীত করিতে হইলে ইঁহাকেই অগ্রে মনোনীত করা বিধেয়। ইনি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাপন্ন ও যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি আইনে দক্ষ, কেবল অল্পবয়স্ক বলিয়াই আমাদের কিঞ্চিৎ ভয় বোধ হয়। কারণ, একে ত এরূপ পদ এদেশীয়দিগের

দুষ্প্রাপ্য, যদি বা গবর্ণমেণ্টের দুর্ভেদ্য মুষ্টি হইতে একটিমাত্র বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে, এটি পাছে কাহার দোষে আবার এদেশীয়দিগের হস্ত-পরিভ্রষ্ট হইয়া যায়, এই আমাদিগের বিষম শঙ্কা। যাহা হউক, যেরূপ জনরব উঠিয়াছিল তাহা সত্য না হইয়া দ্বারকানাথবাবু যে এ পদ পাইয়াছেন, ইহাতে কেবল আমরা নই, সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

দ্বারকানাথ যে সময়ে বিচারপতির আসন গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স ৩৪ বৎসর মাত্র। ১৮৭১ সালের ১৭ই এপ্রিলের 'সোমপ্রকাশ' লেখেন,—'বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের ন্যায় ব্যবহারাজীব কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নয়, পৃথিবীর মধ্যে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিচারপতি হইয়াও তিনি অল্প ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন না। স্যার বার্ণেস পিককের মত আইনজ্ঞ বিচারপতি এ পর্য্যন্ত হাইকোর্টে উপবেশন করেন নাই, এমন স্যার বার্ণেস পিকককেও মধ্যে মধ্যে বিচারশক্তিতে দ্বারকানাথ অতিক্রম করিতেন। ফুলবেঞ্চে ফারমান খাঁ বনাম ভরতচন্দ্র সা চৌধুরী ও অপর দুইটি মুসলমানসংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারে দ্বারকানাথ মুসলমান আইনে যে অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন, অনেক মুসলমান আইনজ্ঞ উকিলও তদ্দর্শনে লজ্জায় অবনত মস্তক হন। (Appendix IV, 2nd judgment)। হিন্দু আইনে তাঁহার অসীম জ্ঞান ছিল। একটি মোকদ্দমায় প্রিভি কৌন্সিলের রায় প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে দ্বারকানাথ যে রায় লিখিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে স্যার বার্ণেস প্রকাশ্য আদালতে যে মন্তব্য মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"The judgment of Mr. Justice Dwaraka Nath Mitter, which he has just read and in which he has displayed great learning, ability and research, was written before the decision of the Privy Council of Gridhari

Lal *versus* The Goverment of Bengal was published here. My Hon'ble colleague has entered so fully into the reason and exhausted the arguments in support of the view which he has taken, that it is unnecessary for me to do more than to say that I concur in the reasons which he has arrived ; and it is extremely satisfactory to find that it is entirely in concurrence with the view taken in the judgment of the Privy council."

তাঁহার আইন-জ্ঞানের কথা আর অধিক কি উল্লেখ করিব ? সে সম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখ করিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে।

পারিবারিক জীবন।

দ্বারকানাথের পারিবারিক অবস্থা মন্দ ছিল না। তাঁহার নিজ পরিবার সংখ্যা সামান্য ছিল, মাতা, স্ত্রী ও পুত্র কন্যা। এতদ্ভিন্ন একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের নিয়মানুসারে ইঁহার নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়েরাও ইঁহার পরিবারভুক্ত ছিলেন। এই সকলকে লইয়া দ্বারকানাথের পরিবার সংখ্যা খুব বৃহৎ সংসারের ন্যায় দেখাইত। দ্বারকানাথের তিন বিবাহ হইয়াছিল। দ্বারকানাথ অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। যাহা কিছু উপার্জ্জিত হইত সে সমস্ত অর্থ মাতার হস্তে অর্পণ করিতেন, মাতা সেই অর্থ কি বাবদে ব্যয় করিতেন তাহার একবার খোঁজও লইতেন না।

দ্বারকানাথ হাইকোর্টের বিচারপতি হইলে অনেক নিকট ও দূরবর্ত্তী আত্মীয়-স্বজন আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, দ্বারকানাথ সযত্নে ও সানন্দে তাঁহাদের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভবানীপুরের বাটী অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের আগমনে সর্ব্বদা কলকোলাহিত হইয়া থাকিত। তিনি আশ্রিতদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি

রাখিতেন। তিনি আশ্রিত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহারাদি করিতেন। তিনি অন্নদানবিষয়ে একেবারে মুক্তহস্ত ছিলেন। ভবানীপুরের বাটীতে তিনি এত লোককে প্রতিপালন করিতেন যে, নিজ বাটীতে স্থানের সংকুলান হইত না বলিয়া তিনি তাহাদের থাকিবার জন্য আর একটি বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। আর দানের ত কথাই নাই। মাইকেল মধুসূদনের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহে তিনি ২০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দানের সীমা ছিল না, কেহ কখনও যাচক হইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। তিনি বড় পদ পাইয়াছিলেন বলিয়া আপন জননী জন্মভূমিকে ভুলিয়া যান নাই। নিজ গ্রাম আগুনসীতে তিনি নিজ ব্যয়ে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রিশ চল্লিশখানি গ্রাম হইতে প্রতিদিন শতাধিক লোক আসিয়া এখানে ঔষধ লইত ও চিকিৎসিত হইত; এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ব্যয় দ্বারকানাথই বহন করিতেন। এখনও এই দুইটী প্রতিষ্ঠান আগুন্‌সিতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্বারকানাথ ফরাসী দার্শনিক অগস্ত কোমটের শিষ্য—প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) ছিলেন। পরোপকার ছিল তাঁহার ধর্ম্ম। জগতের সমস্ত ধর্ম্মমতের মধ্যে শুধু এই পরহিতৈষণার ধর্ম্মকে তিনি 'ধর্ম্ম' বলিয়া মানিতেন। তবে তাই বলিয়া তিনি নিজ পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম-কর্ম্মকে জলাঞ্জলি দেন নাই—যথারীতি পৈতৃক পূজা-পার্ব্বণ করিতেন। দ্বারকানাথের হৃদয় বালকের ন্যায় সহজ ও সরল ছিল। তাঁহার মাতা একজন লোককে নূতন বাটীনির্ম্মাণের জন্য বহু সহস্র টাকা দেন। সেই টাকাগুলি সেই লোকটি বেমালুম উদরসাৎ করে। দ্বারকানাথ পাছে মায়ের মনে কষ্ট হয় সেজন্য সে লোকটাকে একটি কথাও বলেন নাই কারণ তাঁহার মাতার সহিত সেই লোকটির আত্মীয়তা ছিল। পুত্র-

কন্যাগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্ত দ্বারকানাথের ঐকান্তিক প্রযত্ন ছিল। মাসিক দুইশত টাকা বেতনে তিনি পুত্রের অঙ্কশিক্ষার জন্ম প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক রীজ সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জজ হইয়াও দ্বারকানাথ অধ্যয়নে নিরস্ত ছিলেন না; তিনি অবসর পাইলেই ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। ফরাসী ভাষায় অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার এরূপ ব্যুৎপত্তিলাভ হইয়াছিল যে, তিনি কোমৎ-প্রণীত বিশ্লিষ্ট জ্যামিতির (Analytical Geometry) ফরাসী হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেই সময়কার "মুখুয্যের ম্যাগাজিনে" তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। কাদার লাঁফোর গণিত-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিতে তিনি টাকা দিয়া টিকিট কিনিয়া লইতেন।

১৮৭৩ সালে তাঁহার গলক্ষত (cancer) রোগ হয়। তিনি এই রোগে ভুগিয়া শেষে অনুতাপ করিয়া বন্ধু গেভিস্ সাহেবকে লিখিয়া-ছিলেন যে, "মনু আমাদিগের (হিন্দুদিগের) নিমিত্ত যে সকল বিধান করিয়াছেন, ঠিক সেই নিয়মানুযায়ী চলিতে পারিলে আমাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সকল প্রকার উন্নতি এক সঙ্গে সাধিত হয়। মনুর অনুশাসনীসকল বিজ্ঞানসম্মত, এই সকল নিয়ম না মানিয়া চলায় এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করিতেছি, এ যাত্রা বাঁচিতে পারিলে জীবনকে নূতন পথে চালাইতে আরম্ভ করিব।

কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। রোগ-যন্ত্রণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুই মাস মধ্যে দ্বারকানাথের অবস্থা এতদূর মন্দ হইয়া দাঁড়াইল যে, তাঁহার জীবনের আশা সকলকেই এক প্রকার বিসর্জন দিতে হইল। দিন যত শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, রোগও তত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যন্ত্রণায় মুহুর্মুহুঃ অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পরিশেষে ১৮৭৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালা ১২৮০ সালের ১৪ই ফাল্গুন বুধবার দ্বারকানাথ বৃদ্ধা জননী,

সপ্তদশবর্ষীয়া পত্নী, দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের সমস্ত সংবাদপত্রে দ্বারকানাথের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল। হাইকোর্ট, স্কুল, অফিস সমস্ত বন্ধ হইয়াছিল। ইংলণ্ডে কনগ্রিব-প্রমুখ পজিটিভিষ্টেরা বাঙ্গালী দ্বারকানাথের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-সংস্থাপনে যত্নবান হন ও তাঁহাদের যত্নে ইংলণ্ডে Church of Humanity নামক পজিটিভিষ্টদিগের লণ্ডনস্থ উপাসনা-মন্দির-গৃহে দ্বারকানাথের এক ট্যাব্‌লেট নির্ম্মিত হইয়া ইহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। সেই ট্যাব্‌লেটে এই কথা খোদিত আছে—

DWARAKA NATH MITTER.

1832—1874.

Primipilo Della Santa Milizia.

Nell' Oriente.

দ্বারকানাথের দুই পুত্র ভূপেন্দ্র ও সুরেন্দ্র উভয়েই পরলোক গমন করিয়াছেন। ভূপেন্দ্রনাথের পুত্রগণের নাম—সমরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, অমরেন্দ্র, বীরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র। সুরেন্দ্রনাথের পুত্রের নাম রবীন্দ্র; ইনি ব্যারিষ্টার। রবীন্দ্রনাথের পুত্রের নাম রমাপ্রসাদ।

চট্টগ্রামের বৈশ্বানরগোত্রীয় সেনবংশ।

মহাত্মা "সত্যরাম" চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বৈশ্বানরগোত্রীয় সেনবংশের আদিপুরুষ। এই সেনবংশের কুর্চ্চিপত্রের শিরোভাগের লিখিত শ্লোক-পাঠে জানা যায়, তিনি রাঢ়ীয় বৈদ্য ছিলেন। নামান্তে শর্ম্মা পদবী লিখিতেন। শ্লোকটি এই—

"রাঢ়ায়াং পশ্চিমে দেশে কুলছত্র সমুদ্ভবঃ।
বৈশ্বানরস্য গোত্রস্য সেন রাঘবশর্ম্মণঃ॥
চট্টলে গচ্ছতি সত্যঃ রামস্তিষ্ঠতি বঙ্গকে।
যশো রাঢ়ে সমুদিত্য সেনাটাবুপতিষ্ঠতি॥"

পশ্চিম জনপদস্থিত রাঢ়নগরীতে বৈশ্বানর গোত্রীয় রাঘবসেনশর্ম্মার শ্রেষ্ঠকুলীনবংশ-সম্ভূত "সত্যরাম" চট্টলে গমন করেন। রাম বঙ্গদেশে থাকেন এবং যশোরাম রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সেনাটী গ্রামে বসতি করিতেছেন। বংশপরম্পরায় জনশ্রুতি যে, "সত্যরাম" দিল্লীর সম্রাটের অশ্বারোহী সৈনিক-বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি নানা ঘটনা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন।

চট্টগ্রামের একটা চাক্‌লার নাম চক্রশালা ছিল, পূর্ব্বে দুরূহ পর্ব্বত-শ্রেণী, পশ্চিমে সুবিশাল বঙ্গোপসাগর, উত্তরে কর্ণফুলী নদী এবং দক্ষিণে শঙ্খ নদী। এই চাকলার চতুঃসীমা প্রকৃতির ক্রীড়া-নিকেতন। এই মনোরম পুণ্যভূমি সুদৃঢ় দুর্গরূপে যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া স্থিত রহিয়াছে। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী জনপদে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের বসতি। বর্ত্তমানে ইহা পটীয়া মহকুমার অন্তর্গত এবং সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত। মহাত্মা "সত্যরাম" অশ্বারোহণে পার্ব্বত্যভূমি অতিক্রম করিয়া চক্রশালার দক্ষিণ সীমাবর্ত্তী শঙ্খনদীর তীরসন্নিহিত স্থানে কোন এক সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির গৃহে অতিথি হন। তাঁহার প্রতিভা

ও কৌলিন্যের পরিচয় পাইয়া গৃহস্বামী সুযোগ্য অতিথিপ্রবরকে কন্যাদান করেন এবং দাসদাসী-অনুচরবর্গসহ থাকিবার উপযুক্ত এক বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার বাসস্থানের চতুর্দ্দিকস্থিত জমি আবাদ করিয়া একটী ভূখণ্ড বরকে "আয়মা" (যৌতুক) স্বরূপে দান করেন। তাহা হইতে গ্রামের নাম "বরমা" হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম বরমা নামে পরিচিত। তাহাতে বরমা একটী সুবিস্তৃত গ্রামে পরিণত হইয়াছে। উক্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা "সত্যরামে"র যদুনন্দন নামে এক পুত্র জন্মে। যদুনন্দনের দুইপুত্র—সুবুদ্ধি রায় ও রঘুনাথ রায়। তাঁহারা প্রভূত ভূসম্পত্তির অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা শর্ম্মা পদবী কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না।

সুবুদ্ধি রায়ের বংশে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের মধ্যে মহীন্দ্র রায়, সীতারাম রায়, দুর্ল্লভ রায়, উৎসব রায়, কালাচান্দ প্রভৃতি অন্যতম। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামেই তরফসৃষ্টি হইয়া তাঁহাদের নাম চিরস্থায়ী হইয়াছে। মহীন্দ্র রায় অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তাঁহার অনেক সুকীর্ত্তির নিদর্শন বহুশতাব্দী পরেও বিদ্যমান থাকিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠার সাক্ষ্যদান করিবে। তাঁহার অধস্তন বংশধরগণের মধ্যে ৺রামকুমার সেন জজ-আদালতের কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসন্নকুমার সেনও পরলোক গমন করিয়াছেন। রামকুমারের দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেন ও সুখেন্দুবিকাশ সেন। ৺প্রসন্নকুমারের পুত্র শ্রীযুক্ত নিবারণ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র, শ্রীযুক্ত রমণী, শ্রীযুক্ত সুরেশ ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা। শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনশর্ম্মা এ-বি রেলওয়ের ডাক্তার। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেনশর্ম্মা ভারতবিখ্যাত কবি ৺নবীনচন্দ্র সেনের ভাগিনেয়। তাঁহারা নয়াপাড়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আচার-নিষ্ঠায় ও স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠায় ৺মহীন্দ্র রায়ের স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

সীতারামের বংশধরগণের মধ্যে স্বর্গীয় লক্ষ্মীচন্দ্র সেন, ৺জগচ্চন্দ্র সেন, ৺গগনচন্দ্র সেন ৺ত্রিপুরাচরণ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সমাজ-শাসনে ও সংরক্ষণে যেরূপ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অন্যত্র বিরল বলিতে হইবে। তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অপরিসীম ছিল। তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনশর্ম্মা জমিদারির শাসনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সেন চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটির ওভারসিয়ার। তিনি অত্যন্ত সৎসাহসী। সৎসাহসের ও কর্ম্মতৎপরতার জন্য তিনি অত্যন্ত যশোভাজন হইয়াছেন। তিনি জীবনকে বিপন্ন করিয়া জনৈক ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর জীবন রক্ষা করাতে ২৬৬৲ টাকার স্বর্ণপদক পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র সেন এল্ টি পাশ করিয়া শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র লাল সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র সেনশর্ম্মা এ-বি রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেনশর্ম্মা জমিদারী-সেরেস্তায় কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত সারদাকুমার সেন পরৈকোড়া গ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া আছেন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা ফরেষ্ট-বিভাগে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত। তাঁহারা মহামহিমান্বিত সীতারামের খ্যাতি রক্ষা করিতেছেন।

একমাত্র শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র সেনই দেশবিখ্যাত দুর্ল্লভ রায়ের বংশ রক্ষা করিয়াছেন। ৺দুর্ল্লভ রায়ের পিতৃব্য ছিলেন ৺অনন্তরাম রায়, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত শ্যামা

চরণ সেন জমিদারী শাসন ও সংরক্ষণ করেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব সেনশর্ম্মা বি-এল পাশ করিয়া চট্টগ্রামের অন্তর্গত পটীয়া মুন্‌সেফী আদালতে ওকালতি করিতেছেন। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেন এ-বি রেলওয়েতে কর্ম্ম করেন। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র সেন মোক্তার। শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সেন মুন্‌সেফী আদালতে নকল মোহরের কার্য্য করেন, তাঁহারা অনন্তরামের খ্যাতির ধারা রক্ষা করিতেছেন।

৺দুর্ল্লভ রায়ের সহোদর ভ্রাতার নাম ৺মণিরাম রায়, তাঁহার অধস্তন বংশধরগণের মধ্যে ৺রামজয় সেন অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতি লোক ছিলেন। তিনি শিবপ্রতিষ্ঠা, তুলট, মহান্নদান প্রভৃতি বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র ৺উমাচরণ সেন জমিদার। তিনি শঙ্খনদীর এক প্রকাণ্ড চক নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া প্রভূত ভূসম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন, তিনি পরোপকারী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন। সতীশচন্দ্র সেন বিলাত গমন করিয়া এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুখ্যাতির সহিত এম-বি পাশ করিয়া করিয়া মেডেল ও বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আই-এম্-এস উপাধি লাভ করিয়া মেসোপটেমিয়ায় সিবিল সার্জ্জনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা মহানগরীতে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। উক্ত মণি রায়ের বংশে কৈলাশচন্দ্র সেন অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতি লোক ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন মোক্তার। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।

উৎসব রায়ের বংশধরগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরকুমার সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সেন উৎসব রায়ের নাম

রক্ষা করিতেছেন। রাজকুমার সেনশর্ম্মা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুপ্রকৃতি লোক। তিনি রেজিষ্টারী অপিসে চাকুরী করেন। হরকুমার কবিরাজী করেন এবং সূর্য্যকুমার সেন রেঙ্গুন কাষ্টম আপিসে উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তাঁহারা তিনজনই নিঃসন্তান।

মহামহিমান্বিত ৺কালাচান্দের বংশধরের মধ্যে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ সেন ও শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র সেন দুইজনেই কালাচন্দের বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ সেন বর্ত্তমানে আনোয়ারা গ্রামে বসতি করিতেছেন। ইহাই হইল সুবুদ্ধি রায়ের বংশপরিচয়।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, মহাত্মা সত্যারাম সেনশর্ম্মার পুত্র যদু-নন্দন সেন, তাঁহার পুত্র সুবুদ্ধি রায় ও রঘুনাথ রায়। সুবুদ্ধি রায়ের বংশ-পরিচয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। রঘুনাথ রায়ের দুই পুত্র ৺জয়শ্রী মজুমদার ও নারায়ণ মজুমদার; নবাবের সময়ে ধনরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া ইঁহারা পদগৌরবসূচক 'মজুমদার'-উপাধি প্রাপ্ত হন। ৺জয়শ্রী মজুমদারের পুত্র, জয়কৃষ্ণ মজুমদার, তৎপুত্র মাণিক রায়। চট্টগ্রামের বৈশ্বানরগোত্র সেনবংশের বিশেষত্ব এই যে, যখন যিনি যে কর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তৎকর্ম্মানুযায়ী গৌরবসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইতেন এবং তৎ উপাধি তিনিই পদবীরূপে ধারণ করিতেন, তৎপরবর্ত্তীগণ তাহা ব্যবহার করিতেন না। স্বজাতীয় গৌরবরক্ষার্থ অধস্তন বংশধরগণ আদিপুরুষের নাম "সেন" স্মৃতিচিহ্নরূপে ধারণ করিয়া আত্মপরিচয় দেওয়াকে অধিকতর গৌরবের কার্য্য বলিয়া মনে করেন। যে সব পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মা পদগৌরবসূচক অথবা ভূসম্পত্তির অধীশ্বরত্ব হেতু মজুমদার, রায় চৌধুরী প্রভৃতি উপাধি নবাবের সময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ তৎপদবী গ্রহণ করাকে অন্যায় মনে করিয়াছেন। তাই মাণিক রায়ের পাঁচ পুত্র, নিধিরাম, দয়ারাম, গোবিন্দরাম, অভিরাম

ও মায়ারাম—সকলেই পিতার প্রাপ্ত উপাধি রায় না লিখিয়া জাতীয় পদবী "সেন" নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। দয়ারাম ও অভিরামের বংশে কেহই জীবিত নাই। গোবিন্দরামের বংশের বংশধর 'বরমা' হইতে বাঁশখালি মহকুমার অন্তর্গত দেবগ্রামে যাইয়া বাস করিতেছেন।

নিধিরামের বংশধরগণের মধ্যে ৺সন্তোষরাম সেন ভূজপুরগ্রামে যাইয়া গৃহজামাতারূপে বসবাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত নিশিচন্দ্রসেন ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন সেন বরমাগ্রামে থাকিয়া নিধিরামের স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন।

৺মায়ারামের পুত্র কন্দর্প রায়, কন্দর্প রায়ের পুত্র যাদব রায় ও কৃপারাম। যাদব রায়ের পুত্র যশ রায় ও মাধব রায়। মাধব রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ ও রাধারাম, রাধারামের পুত্র রামজয় সেন, তৎপুত্র অখিলচন্দ্র সেন। অখিলচন্দ্র সেন অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতি ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, ৺রমেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন। উমেশচন্দ্র সেন ডাক্তারী চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা রাধারামের নাম রক্ষা করিতেছেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মাধব রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ ও রাধারাম। ৺রামপ্রসাদের পুত্র রামচরণ, রামচরণের পুত্র ৺রামসুন্দর সেন, তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। তিনি সত্যনিষ্ঠ, অতিথি-সেবাতৎপর ও দেবভক্ত ছিলেন। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে রেলওয়ের ও ষ্টীমারের সাহায্যে যাতায়াতের যখন কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না, ডাকাতদের অত্যাচারে যখন দেশ উৎপীড়িত হইতেছিল, তখন তিনি নৌকাপথে ও পদব্রজে গয়া, কাশী, শ্রীক্ষেত্র, মথুরা ও বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এতদূর

সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে,"আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মিথ্যা বলিতে হয়", এই ধারণার বশীভূত হইয়া কখনও কোন জমি-জমার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাহার ফলে দেশের অনেকেই তাঁহার বহু ভূসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। তিনি এতই নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন যে, বাজার হইতে খাদ্যসম্ভার যাহা কিছু আনা হইত, তাহাতে তুলসী-পত্রের জল অভিষিক্ত না করিয়া ঘরে লইতে দিতেন না। তিনি জনসাধারণের অত্যন্ত ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহাকে সকলেই 'সেনঠাকুর' বলিয়া ডাকিত। গ্রামের দুষ্ট ছেলের দল তাঁহাকে সময় সময় বিব্রত করিয়া তুলিত। ছেলেদের জন্য বাড়ীর বাহিরে যাওয়ার সাধ্য ছিল না। কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষ্যে কোথাও যাওয়ার জন্য তিথি-নক্ষত্র-বার-বেলা দেখিয়া যাত্রা করিয়া চলিতেন। কতদূর যাওয়ার পর হয়ত কোন এক দুষ্ট ছেলে তাঁহাকে বলিল, "সেনঠাকুর মহাশয়" আপনি যে কাকের বিষ্ঠা ছুঁইয়াছেন। তাহা সত্য কি মিথ্যা বলা হইল তাহার বিচার না করিয়া অমনি বাড়ীর দিকে ফিরিতেন, বাড়ীর সম্মুখস্থিত পুকুরের জলে স্বতন্ত্র অবগাহন করিয়া শতাধিকবার নারায়ণ স্মরণ করতঃ গৃহে প্রবেশ করিতেন। তিনি কাহাকেও অবিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন ৺উদয়তারা দেবী, তাঁহার মধুর ব্যবহারে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলই মুগ্ধ ছিলেন। তিনি আদর্শ জননী ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীখানি শান্তিনিকেতন ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ রামসুন্দর সেন ১৮৯২ শকাব্দের কার্ত্তিক মাসে রাসপূর্ণিমা দিনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া চিরশান্তিধামে মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার দুই পুত্র—ত্রিপুরাচরণ সেনশর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন।

ত্রিপুরাচরণ সেনশর্ম্মা অত্যন্ত সরলপ্রকৃতি লোক ছিলেন, তিনি কবিরাজী করিতেন। কবিরাজী-ব্যবসায়-উপলক্ষ্যে ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে দুইবার রেঙ্গুণ প্রভৃতি স্থানে যাইয়া ব্যবসায় করেন। রেঙ্গুণ থাকা-

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা।

কালীন তিনি "ব্রহ্মবিহারী কাব্য", "ঐরাবতী মাহাত্ম্য", 'অনন্ত ব্রত' পাঁচালী রচনা করেন। ৬২ বৎসর বয়সে তিনি সস্ত্রীক এলাহাবাদ ও প্রয়াগতীর্থে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। ৬৮ বৎসর বয়সে ১৩৩০ সালের ৪ঠা শ্রাবণ শুক্রবার শুক্লপক্ষ সপ্তমী তিথিতে তিনি ত্রিবেণী ঘাটে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার আত্মশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণাচারে একাদশাহে ত্রিপুরাচরণ সেনশর্ম্মা উল্লেখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। চট্টগ্রামে বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজে ইহা সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠান।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত কবিরাজ। তিনি ১৭৯২ শকাব্দের ৩০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ছয়মাস বয়সের সময় অর্থাৎ ঐ শকাব্দের কার্ত্তিকমাসে রাসপূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার পিতৃদেব নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বয়স ষোড়শ বৎসর ছিল। তাঁহাদের যাহা ভূসম্পত্তি ছিল, সংরক্ষণের অভাবে তাহা পরহস্তগত হইয়া যায়। দারিদ্র্য-রাক্ষসের করাল কবলে তিনি নিপতিত হন। তদবস্থায় শ্যামাচরণ কোন মতে মধ্যবাঙ্গলা পড়া শেষ করিয়া কলাপব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সুচিয়ার স্বর্গীয় পণ্ডিত ৺উদয়মণি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সন্ধিবৃত্তি ও চতুষ্টয়বৃত্তি পড়া শেষ করিয়া নয়াপাড়া গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গীয় গুরুদাস তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপব্যাকরণ অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিয়া ১৬ বৎসর বয়সে বিক্রমপুরে পদব্রজে পাঁচদিনে মূলচরনামক গ্রামে স্বর্গীয় পণ্ডিত ৺কাশীচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তখন রেলগাড়ী ও ষ্টীমারাদি কোন যানের বন্দোবস্ত ছিল না। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার প্রতিভা-দর্শনে তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিয়া সাহিত্যাদি ব্যাকরণের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করান। সাহিত্যাদি ব্যাকরণে প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করিয়া তিনি বিক্রমপুরস্থ কামারখাড়াগ্রামে বিখ্যাত নৈয়ায়িক

৺চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট কিছুকাল ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপর হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালিতে স্বর্গীয় কবিরাজ ৺ বরদাকান্ত সেন কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট নিরামিষভোজী হইয়া চারিবৎসর কাল আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮১৪ শকাব্দে তিনি আয়ুর্ব্বেদ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে উপাধিপত্র প্রাপ্ত হন, তাহা এই :—

"শ্যামাচরণ সেনোঽয়মম্বষ্ঠবংশজঃ শ্রিয়া
আয়ুর্ব্বেদমধীয়ানশ্চিকিৎসা-নিপুণঃ পুনঃ।
সৎস্বভাবৈঃ সদাভাতি প্রদত্তঃ কবিরঞ্জনঃ
উপাধির্ভিষজে তস্মৈ প্রহৃষ্টচেতসা ময়া॥"
কবিরত্নোপাধিক শ্রীবরদাকান্ত সেন কবিরাজেন।
চতুর্দ্দশাধি কাষ্টাদশশত শকাব্দীয় সৌর
মার্গশীর্ষস্য ষোড়শ দিবসীয়া পত্রীয়ম্।

তিনি শিক্ষাজীবনের কার্য্য পরিসমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের অন্তর্গত ভাটীআইন গ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার চৌধুরী মহাশয়ের প্রথমা কন্যা ধর্ম্মপ্রাণা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী ৺সরোজিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তৎপর ১৩০০ সালের মাঘমাসে চট্টগ্রাম সহরে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের ও আয়ুর্ব্বেদ-অধ্যয়নের অভাবমোচনকল্পে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা ও চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত হন। চট্টগ্রামে তিনিই সর্ব্বপ্রথম আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নের ও সহজে, সুলভে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধলাভের পথ উন্মুক্ত করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার প্রতিভা জনসাধারণের নিকট প্রতিভাত হয়। সুচিকিৎসার জন্য তিনি বহু স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের কোন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক এ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসার অনুশীলন করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। লৌকিক প্রবাদ আছে, "স্ত্রীর ভাগ্যে ধন, পুরুষে ভাগ্যে জন"। তাঁহার বিবাহের পর হইতেই

যেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাহার গৃহে অধিষ্ঠিতা হইলেন। তাঁহার সুরম্য অট্টালিকাগুলিই তাহার নিদর্শন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বৈদিক বিদ্যালয়ে বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থসন্তান শিক্ষা লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থী ছাত্রগণের ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করেন।

যাঁহার স্নেহ ও পালনে কবিরাজ মহাশয়ের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, যাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় শিক্ষাজীবনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, যাঁহার উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে কর্ম্মজীবনের সূচনা হইয়াছিল, তাঁহার সেই পুণ্যময়ী স্বর্গীয়া জননী ৺ উদয়তারা দেবী ১৮২৬ শকাব্দের কার্ত্তিকমাসের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। শ্যামাচরণ শিশুকালে পিতৃহীন হইয়াও জননীর কর্ম্মনৈপুণ্যে ও অশেষ যত্নে পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ অনুভব করেন নাই। মাতার আজ্ঞা ছিল গ্রামে পানীয় জলের সংস্থান করিতে। তাঁহার আজ্ঞা-প্রতিপালনার্থ ইংরেজী ১৯১১ সালে বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া সর্ব্বসাধারণের পানীয় জলের উদ্দেশ্যে বরমা গ্রামে এক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া রিজার্ভ রাখিয়াছেন এবং তিন সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার পিতা ও মাতার (রামসুন্দর উদয়তারা) নামকরণে এক দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপন করিয়া দেশবাসীর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। দূরস্থিত রোগীগণের বাসের জন্য উক্ত রিজার্ভ পুকুরের পাড়ে এক স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করিয়া দুঃস্থ রোগীর চিকিৎসার পথ সুগম করিয়াছেন।

তিনি ১৩১৭ সালে কামাখ্যা-তীর্থে যান, তথায় মহিষ-বলিদানের বীভৎস কাণ্ড দর্শন করিয়া মহিষ-বলিদানের প্রতিবাদসূচক "বলিরহস্য" নামক এক শাস্ত্রীয় বিচার-গ্রন্থ সংকলন করিয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র বিতরণ করেন। বঙ্গের প্রায় সমস্ত ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদপত্রিকায় "বলিরহস্যে"র সমালোচনা হয়। সংবাদপত্রিকার সম্পাদকগণ তাঁহার ভূয়োদর্শনের ও শাস্ত্রজ্ঞানের, বিচার-পদ্ধতির ও রচনাচাতুর্য্যের ভূয়সী

প্রশংসা করেন। তাহার ফলে বঙ্গের বহু পরিবার হইতে মহিষ-বলি-প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। বহু পরিবারে মহিষ-বলির মানত রক্ষা করিতে যাইয়া মহিষ উৎসর্গ পূর্ব্বক ' বলিঘাত" না করিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন।

তিনি গয়াশ্রাদ্ধ ও বিষ্ণুপদে পিণ্ড দান করার জন্য গয়াধামে উপস্থিত হইয়া তথাকার শ্রাদ্ধাদির কার্য্য দেখিয়া এবং তথাকার বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সহিত শ্রাদ্ধবিষয়ে আলোচনা করিয়া চট্টগ্রামের মুখপত্র 'জ্যোতিঃ'তে "শ্রাদ্ধতত্ত্ব' নামক রণেধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালায় অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধপ্রণালীর অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করেন।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে নৈতিক জীবন গঠনের ও স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের এবং ধর্ম্মার্জ্জনের বিধি-ব্যবস্থা (ভারতবাসীর পক্ষে) যথোপযুক্ত করা হয় নাই বলিয়া, ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া "ব্রহ্মচর্য্য বা শিক্ষাজীবন" নামকরণে এক গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন; তাহাতে ভারতীয় শিক্ষার্থিগণের পক্ষে যে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অনুপযুক্ত তাহা প্রতিপাদন করিয়া অধ্যয়নশীল ছাত্রগণের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

তাঁহার প্রতিভা দর্শন করিয়া ঢাকার কবিরাজমণ্ডলী ১৩২৪ সালে তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বৈদ্যসম্মিলনী অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসা-সম্মিলনীর সভাপতিত্বে বরণ করেন, তাঁহার পূর্ব্বে উক্ত গ্রাম হইতে আর কোন ব্যক্তি সভাপতিত্ব করার জন্য চট্টগ্রামের বাহিরে আহূত হয়েন নাই। সর্ব্বপ্রথম তিনিই ঢাকা মহানগরীতে পূর্ব্ববঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসক সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করেন।

১৩২৭ সালে তিনি চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনী নামকরণে নিজ বাসভবনে এক সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কারভ্রষ্ট বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির

সংস্কার-গ্রহণের তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করতঃ বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত তাহা সপ্রমাণ করেন ও পণ্ডিতগণ হইতে ব্যবস্থাপত্র লিখাইয়া লন।

সেই ব্যবস্থাপত্রে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে। এই ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতগণের বহু ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী সহ ১৩২৮ বঙ্গাব্দে "অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈদ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থ সংকলন করিয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিতরণ করেন। তাহার ফলে বহু বৈদ্যসন্তান ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

১৯২৮ বঙ্গাব্দে চট্টল-প্রবাসী ও চট্টলবাসী বৈদ্য ব্রাহ্মণকে সমবেত করিয়া বৈদ্য ব্রাহ্মণ আর্ব্বাণ কোঃ ব্যাঙ্ক স্থাপন করতঃ দুঃস্থ বৈদ্যগণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

১৩৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া বৈদ্যজাতি" নামকরণে এক সারগর্ভ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তদ্দ্বারা বঙ্গীয় বৈদ্যগণের বহুকালের ভ্রান্ত ধারণার কথঞ্চিৎ নিরশন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রতীচ্যশিক্ষাভিমানী কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিগণকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি ১৩২৩ সালে "বাল্যবিবাহ" বা "ব্রহ্মচর্য্য" নামকরণে এক পুস্তক সঙ্কলন করেন। চট্টগ্রাম প্রাদেশিক কনফারেন্সে মাননীয় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে, প্রায় দশ সহস্র লোকের মধ্যে তিনিই বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যুক্তি ও তর্ক দ্বারা সেই প্রস্তাব রহিত করেন। ১৩৩১ সালে "বৈদ্যজাতির উৎপত্তি" নামক গ্রন্থ সংকলন করিয়া বৈদ্যগণ যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাহা প্রতিপাদন করেন। ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাস হইতে "বৈদ্যপ্রতিভা" নামক এক মাসিক পত্রিকা তাঁহার

সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতেছে। তিনি যেমন বিবিধশাস্ত্রপারদর্শী, তদ্রূপ সুবক্তা, জাতীয় তত্ত্বের আলোচনার জন্য বঙ্গের বহু জেলায় তিনি সাদরে আহূত হইয়া বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির গৌরব রক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রতি সভায় সমোচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন—যিনি শাস্ত্রীয় বিচারে প্রতিপাদন করিতে পারিবেন বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত নহেন, তিনি তাঁহাকে পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড দিবেন।

হিন্দুসমাজে যখনই ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও নীতিবিরুদ্ধ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনিই তাহার সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রসঙ্গত উদারমতই পোষণ করেন। মদনমোহন মালব্যের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার তিনি একজন সদস্য। যাবতীয় সদনুষ্ঠানে দেশের ও দশের মঙ্গলসাধনকার্য্যে নিয়ত যোগদান করেন। অমূল্যকৃষ্ণ, অতুলকৃষ্ণ, অমিয়কৃষ্ণ, অজিৎকৃষ্ণ নামে তাঁহার চারিপুত্র বিদ্যমান। প্রথম সন্তান এম্‌-এ পাশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন। নলিনীবালা, ইন্দুবালা, বিন্দুবালা, সিন্ধুবালা, জিন্দুবালা, তিন্দুবালা ও সরযূবালা নামে তাঁহার সাত কন্যা; চারি কন্যার বিবাহ হইয়াছে, অপর তিন কন্যা এখনও বিবাহের যোগ্য হয় নাই। তাঁহার বাসাবাড়ীটীকে একটী ছোটখাট হোষ্টেল বলা যাইতে পারে, প্রতি বেলায় ৩০ হইতে ৩৫ জনেরও অধিক লোক আহার করে। তিনি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের সাহায্য করিতে নিয়ত মুক্তহস্ত।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মাধব রায়ের পাঁচ সন্তান। তন্মধ্যে কালীচরণ নিঃসন্তান। দীননাথের সন্তান রুদ্রনারায়ণ। রুদ্রনারায়ণের সন্তান রামশরণ; তিনি বাঁশখালী গ্রামে যাইয়া গৃহজামাতারূপে বসতি করেন, তাঁহার পুত্র মাগন ও নিমাই। নিমাই নিঃসন্তান, মাগনের সন্তানগণের নাম অজ্ঞাত। ইঁহারা যাদব রায়ের অধস্তন বংশধর। যাদব রায়ের সহোদর ছিলেন, কৃপারাম। কৃপারামের সন্তান; মুক্তারাম ও ঘনশ্যাম,

তৎপুত্র মহেশচন্দ্র, তৎপুত্র কালীকিঙ্কর, নন্দকুমার, হরকুমার ও নয়নহরি। হরকুমার নিঃসন্তান, কালীকিঙ্করের পুত্র অপর্ণা, অন্নদা, অপূর্ব্ব ও অশ্বিনী। অপর্ণাচরণ ডাক্তারী করেন, অন্নদা কালেক্টরী অফিসে ক্লার্কের কার্য্যে নিযুক্ত, অপূর্ব্বকৃষ্ণ চান্দপুরে সওদাগরী অফিসে কার্য্য করেন, অশ্বিনীকুমার বি-এ পাশ করিয়া বি-এল পড়েন। নন্দকুমারের পুত্র নিকুঞ্জ, বিপিন ও বিনোদ. তাঁহারা ধনঘাটগ্রামে বসতি করিতেছেন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে—মাণিক রায়ের পাঁচ সন্তান, তন্মধ্যে গোবিন্দরামের পুত্র চান্দ রায় ও রামসুন্দর। চান্দ রায়ের সন্তান রামবল্লভ ও রামশরণ। রামশরণ কাসিয়াইস্ গ্রামে যাইয়া গৃহজামাতা রূপে বাস করেন, তৎপুত্র বসন্ত। বসন্তের পুত্র কুলচন্দ্র, তৎপুত্র প্রাণকৃষ্ণ ও বিশ্বম্ভর। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র নীলকমল, সতীশ ও রজনী। নীলকমল চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বিশ্বম্ভরের পুত্র মনোমোহন। মনোমোহন গৈড়লা গ্রামে বসতি করিতেছেন এবং কবিরাজী করেন। রামবল্লভের পুত্র ত্রাহিরাম, তিনি আনোয়ারা গ্রামে গৃহজামাতারূপে বাস করেন। তাঁহার পুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র অখিল ও নূতন, অখিলের পুত্র বীরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র, খগেন্দ্র। নূতনের পুত্র যতীন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, আদিপুরুষ সত্যনারায়ণ সেনশর্ম্মার পুত্র যদুনন্দন, তৎপুত্র সুবুদ্ধি রায় ও রঘুনাথ রায়, রঘুনাথ রায়ের পুত্র জয়শ্রী মজুমদার ও নারায়ণ মজুমদার, নারায়ণের পুত্র রাজারাম, তৎপুত্র ভৃগুরাম, ভৃগুরামের পুত্র জয়নারায়ণ। জয়নারায়ণের পুত্র বৈষ্ণবচরণ, শিবনারায়ণ, পার্ব্বতীচরণ ও রামসুন্দর এবং ত্রাহিরাম। বৈষ্ণবচরণ ও শিবনারায়ণ নিঃসন্তান। পার্ব্বতীচরণের পুত্র তিলক, গোলোক ও কালিদাস, তাঁহারা সকলেই পুত্রসন্তানবিহীন ছিলেন। রামসুন্দরের সন্তান চৈতন্য ও প্রসন্ন, চৈতন্য নিঃসন্তান। প্রসন্নের পুত্র উপেন্দ্র, তিনি বরমা স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

ত্রাহিরামের পুত্র নীলকমল ও দেশবিখ্যাত জননায়ক উকিল স্বর্গীয় যাত্রামোহন সেন। নীলকমল শিক্ষকতা করিতেন, তাঁহার পুত্র সন্তান নাই। যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের পুত্র মনোমোহন, যতীন্দ্রমোহন, ফণীন্দ্রমোহন, নীরেন্দ্রমোহন, দ্বিজেন্দ্র, বীরেন্দ্র, শৈলেন্দ্র ও রণেন্দ্র। মনোমোহন ও নীরেন্দ্রমোহন ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় উপলক্ষ্যে কলিকাতায় থাকেন। আজ তাঁহার নাম ভারতবিখ্যাত "দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত"। তিনি কলিকাতা মহানগরীর মেয়র-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চট্টল মাতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

দরমাহাটার বসু-বংশ

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণরাম বসু মহাশয় ভদ্রকালী হইতে সপরিবারে কলিকাতাস্থ শোভাবাজার দরমাহাটায় (বর্ত্তমান শোভাবাজার ষ্ট্রীটে) আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণরাম বসু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে নিষ্কর বাসোপযোগী জমি পাইয়া বসতি করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বহু বৎসর ধরিয়া ভদ্রকালীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—নন্দরাম, রাধাবল্লভ ও লালবিহারী। লালবিহারী বসু মহাশয়ের তিন পুত্র—তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামতনু ও কনিষ্ঠ জগন্নাথ।

জগন্নাথ বসু মহাশয়ের চারি পুত্র ও এক কন্যা—জ্যেষ্ঠ নয়নচন্দ্র, মধ্যম হলধর, তৃতীয় ভবানীচরণ। জগন্নাথ বসুর কন্যার পুত্র রামরতন মিত্র। রামরতন মিত্রের কেবলমাত্র এক কন্যা, তাঁহার সহিত দরমাহাটা রসিকলাল ঘোষ মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছিল। রসিকলাল ঘোষ মহাশয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থবিভাগে (Finance Department) উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। নয়নচন্দ্র

বসু ১১৭৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালিক সমাজের প্রথানুসারে তিনি অল্প বয়সে বিবাহ করেন। তাঁহার বয়স যখন অতি অল্প তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। কাজেই তাঁহার পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। পিতার সহিত বনিবনাও না হওয়ায় তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া যান। শ্বশুর মহাশয় ঢাকায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। ২।১ মাস শ্বশুরালয়ে বাস করিবার পর তিনি শ্বশুরগৃহে বাস করা নিতান্ত অপমানজনক মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন এবং কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি নীলামে জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া তাহা বিক্রয় করিতেন। তাঁহার অল্প বয়স ও কমনীয় আকৃতি দেখিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীলাম-বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তিনি নয়নচাঁদকে তাঁহার অধীনে একটী চাকুরী দিলেন। নয়নচাঁদ আপন প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে শীঘ্রই নিমকমহলের অন্যতম দেওয়ান হইলেন। এই কার্য্যে তিনি প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া অনেক জমিদারী ও নীলকুঠি ক্রয় করিয়াছিলেন। ইনি অতিশয় উদার ও ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। পূজা, পার্ব্বণ, দান ও অন্যান্য সৎকর্ম্মে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি দরমাহাটস্থ পৈতৃক বাসস্থানে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দুর যাবতীয় পূজাপার্ব্বণ ভক্তি ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। ইঁহার বাটীতে পূজোপলক্ষে ছাগবলি হইত। একবার একটী ছাগ যূপকাষ্ঠ হইতে ছুটিয়া গিয়া নয়নচাঁদের আশ্রয় লয়। নয়নচাঁদ ছাগশিশুর অশ্রু দেখিয়া এতদূর অভিভূত হন যে, তিনি তাহাকে বলি দেন নাই। তদবধি তাঁহার বাড়ীতে বলিপ্রথা উঠিয়া যায়।

হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, বংশের উন্নতি কি অবনতি

কুলদেব হইতে হয়, তাহা এই বংশের ইতিহাস হইতে সম্যক বুঝিতে পারা যায়। তৎকালে প্রায় সকল হিন্দুর বাড়ীতে নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। নয়নচাঁদ বসুর বাড়ীতেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ ছিল। কিন্তু ইহা ব্যতীত নয়নচাঁদ বাবু নিজে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যতদিন নয়নচাঁদ জীবিত ছিলেন তাঁহার বাটীতে এই শিলার বিধিমত অর্চ্চনাদি হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অবস্থাপন্ন ছিলেন তাঁহার বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিধিমত অর্চ্চিত হইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বংশের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঠাকুরঘর হইতে ৺লক্ষ্মীনারায়ণজীউ হঠাৎ এক দিবস অদৃশ্য হন। এই ঘটনার প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আর একবার এই ৺লক্ষ্মীনারায়ণশিলা একদিন অদৃশ্য হন। হিন্দু গৃহীর পক্ষে ইহা যে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই ঘটনায় নয়নচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ আহার ত্যাগ করিয়া ভগবানের উপাসনায় রত হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন নারায়ণ-শিলা তাঁহার গৃহে ফিরিয়া না আসেন ততদিন তিনি জলগ্রহণ করিবেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি সেই রাত্রেই স্বপ্ন পাইলেন যে, নারায়ণশিলা গঙ্গার ঘাটে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে রহিয়াছে। প্রাতঃকালে নয়নচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র কুলপুরোহিতের সহিত সেইস্থানে গিয়া তাঁহার পিতৃদেব-প্রতিষ্ঠিত নারায়ণশিলা প্রাপ্ত হইলেন। মৃত্যুর সময় নয়নচাঁদ ৺নারায়ণের সেবার জন্য ৫।৬ হাজার বিঘার তালুক রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ৬৪ বৎসর বয়সে চার পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পুত্রগণের নাম—রাজনারায়ণ, রামনারায়ণ, শ্রীনারায়ণ ও শিবনারায়ণ বসু এবং এক কন্যা।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কেবল একটী কন্যাসন্তান। ঐ কন্যাটী বিবাহের অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রামনারায়ণ বসুর দুই পুত্র,লক্ষীনারায়ণ ও নবীনচন্দ্র। লক্ষীনারায়ণের দুই পুত্র—শ্যামাচরণ ও সদানন্দ।

শ্যামাচরণ বসুর চারি পুত্র—মন্মথনাথ, হরিনাথ, তারিণীচরণ ও একটী কনিষ্ঠ পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মন্মথনাথ শ্যামবাজারে একটী বাটী ক্রয় করিয়া বাস করেন। নবীন চন্দ্রের চারি পুত্র—উপেন্দ্র, নরেন্দ্র, গিরীন্দ্র ও বিপিনচন্দ্র। নরেন্দ্র বসুর পুত্রসন্তান হয় নাই, ইহার এক কন্যা আছেন। ইনি ডাক-বিভাগে চাকুরি করিতেন। এক্ষণে পেন্সন ভোগ করিতেছেন। বিপিনচন্দ্রের পাঁচ পুত্র—লালচাঁদ, অমর, অরুণ, অজয় ও অনিল। বিপিনচন্দ্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীনারায়ণ বসুর তিন পুত্র—চন্দ্রনারায়ণ, মতিলাল ও গোপালদাস। চন্দ্রনারায়ণের এক পুত্র—ক্ষেত্রকৃষ্ণ। ক্ষেত্রকৃষ্ণের এক পুত্র হরিপদ। মতিলালের তিন পুত্র—নগেন্দ্র, অমৃতলাল ও ব্রজলাল। নগেন্দ্রের এক কন্যা। অমৃতলাল নিঃসন্তান। গোপালদাসের দুই পুত্র—শীতলচন্দ্র ও রাজেন্দ্রচন্দ্র। শীতলচন্দ্রের এক পুত্র। রাজেন্দ্র নিঃসন্তান।

নয়নচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র শিবনারায়ণ বসু ১২১৭ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ২৪ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। ইনি সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং হিন্দুশাস্ত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা এবং ভগবানের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ৪২ বৎসর বয়সে দরমাহাটার পৈতৃক বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া কম্বুলিয়াটোলায় বাটী ক্রয় করিয়া বসতি করেন। ৫১ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। শিবনারায়ণের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ ব্রজজীবন, মধ্যম বিহারীলাল ও কনিষ্ঠ শ্যামলাল। ইহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কাঁসারিপাড়া-নিবাসী গঙ্গাধর মিত্রের পুত্র পাঁচকড়ি

মিত্রের বিবাহ হইয়াছিল। মধ্যমা কন্যার সহিত গঙ্গাধর মিত্রের অপর পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। গঙ্গাধর মিত্র সওদাগর অফিসে বেনিয়ান ছিলেন। পাঁচকড়ি মিত্র বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার মত পাখোয়াজ বাজাইতে অতি অল্প লোকেই পারিত। মধ্যমা কন্যার একটী দৌহিত্র ও দৌহিত্রী। দৌহিত্রের নাম লালবিহারী দত্ত। ইনি হাটখোলা দত্ত বাড়ীর মন্মথনাথ দত্তের পুত্র। শিবনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত নিমতলা-নিবাসী প্যারিচাঁদ মিত্র (বিখ্যাত টেকচাঁদ মিত্র) মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র চমৎকার মিত্রের সহিত বিবাহ হয়। চমৎকার মিত্র কিছুকাল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান ছিলেন।

শিবনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজজীবন বসু মহাশয় তৎকালীন Junior ও Senior পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের কাষ্টমস ডিপার্টমেণ্টে (Customs Dept.) কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। ইনি অত্যন্ত সদাশয় এবং পরোপকারী ছিলেন। যে কোনও ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি ও মধুর সম্ভাষণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইত। হিন্দুশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল ইনি দুই দার পরিগ্রহ করেন। প্রথমে বাগুটীয়ার প্রসিদ্ধ মুখ্য কুলীন ঘোষ বংশে বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ঈশানচন্দ্র সিংহের একমাত্র সন্তানকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ডিমলার রাজা জানকীবল্লভ সেনের সহিত, মধ্যমা কন্যার বিবাহ মজিলপুরের জমিদার হরমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র দত্তের সহিত ও কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ ঝামাপুকুরনিবাসী ডাক্তার প্রিয়নাথ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র মিত্রের সহিত হয়। ব্রজজীবন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র পীতাম্বর বসু একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলকুমার ও দুই কন্যা রাখিয়া অল্প বয়সে মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করেন। তিনি দুই দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমে রামনগরনিবাসী কৈলাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ

পুত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত ও দ্বিতীয়বার ডাক্তার ভগবান রুদ্রের পৌত্রীর সহিত বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কলুটোলা-নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ রাহা ও কনিষ্ঠা কন্যার সহিত পটলডাঙ্গা-নিবাসী মন্মথধন রায়ের বিবাহ হইয়াছে। তিনি প্রতিবেশী দুঃস্থ পরিবারবর্গের কষ্টে সহানুভূতিসম্পন্ন ও দুঃখীর দুঃখ-মোচনে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিতেন।

ব্রজজীবনের কনিষ্ঠ পুত্র অতুলকৃষ্ণ হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল বৈদ্যনাথ দত্তের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং ঐ স্ত্রী একমাত্র শিশুপুত্র চণ্ডীচরণকে রাখিয়া গতাসু হইলে অতুলকৃষ্ণ তাঁহার শ্বশুরের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। চণ্ডীচরণ এখন হাইকোর্টের এটর্ণী। ইনি কলিকাতা বিডনষ্ট্রীট-নিবাসী চারুচন্দ্র মিত্রের এক পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। অতুলকৃষ্ণের দ্বিতীয়া স্ত্রীও একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া গত হইয়াছেন; পুত্র তারকনাথ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার ধর্ম্মতলানিবাসী ডিঙ্গাভাঙ্গা পালিত-বংশীয় পুলিনবিহারী পালিতের সহিত ও কনিষ্ঠা কন্যার শোভাবাজারের রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের জ্যেষ্ঠ পৌত্র কপিলকৃষ্ণ দেবের সহিত বিবাহ হইয়াছে। অতুলকৃষ্ণ T. C. Mookerjee কোং'র হেড ইঞ্জিনিয়র, স্পষ্টবক্তা এবং সাতিশয় আত্মীয়বৎসল ও সদালাপী।

শিবনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামলাল বসু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যায় ইঁহার এতদূর অভিজ্ঞতা ছিল যে, ইনি গঙ্গাতীরস্থ রোগীকেও আরাম করিয়াছেন। কলিকাতার বহু ধনিগৃহে ইঁহার পশার যথেষ্ট ছিল। বহু দীন-দুঃখীকে শ্যামলাল শুধু যে বিনা ফিতে চিকিৎসা করিতেন তাহা নহে, তাহাদের পথ্যাদিও নিজ ব্যয়ে ব্যবস্থা করিতেন। দীন-দুঃখীর প্রতি তাঁহার করুণার অন্ত ছিল না, বহুপ্রকারে তাহাদের উপকার করিতেন। এই কারণে তিনি তাহাদের

অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিত্য গীতাপাঠ করিতেন এবং সমগ্র গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। শ্যামলাল আড়বেলিয়ার বিখ্যাত নাগবংশীয় রামগতি নাগের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন।

শ্যামলালের পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা ; জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণলাল,মধ্যম প্রিয়লাল তৃতীয় হীরালাল, চতুর্থ পান্নালাল ও কনিষ্ঠ জহরলাল। কৃষ্ণলাল বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত, তিনি ঠনঠনিয়া শঙ্কর ঘোষের বংশধর অন্নদাপ্রসাদ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন,তাঁহার দুই পুত্র দুর্গাচরণ ও হরিচরণ এবং এক কন্যা। দুর্গাচরণ ই-আই রেলওয়ে কোম্পানীর ট্রাফিক বিভাগের একজন কর্ম্মচারী। হরিচরণ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখনও অধ্যয়ন করিতেছেন। কৃষ্ণলাল বসুর কন্যার সহিত ময়মনসিংহ কলেজের অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ দত্তের বিবাহ হইয়াছে। প্রিয়লাল বসু নৈহাটীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ সরকারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহার ন্যায় উন্নতচেতা ও ভ্রাতৃবৎসল লোক এ সংসারে বিরল। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মঙ্গলের জন্য নিজে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র দেবেন্দ্র ও রামচন্দ্র এবং এক কন্যা। কন্যার বিবাহ বহুবাজার-নিবাসী হরিদাস বিশ্বাসের সহিত হইয়াছে। হীরালাল বসু ছোট আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং ইংরেজী, সংস্কৃত ও দর্শনে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। পান্নালাল বসু কয়েক বৎসর ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের Captain ছিলেন,এক্ষণে প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করিতেছেন। তিনি বাকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্লভ হাজরার কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। জহরলাল বসু হাইকোর্টের একজন উকিল। ইনি সাহিত্য, দর্শন ও

জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন। ইনি হাটখোলা-দত্তবংশীয় ভবানীপুর বকুলবাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ীকে বিবাহ করিয়াছেন। শ্যামলাল বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত বারুইপুর ধবধপি-নিবাসী তারকনাথ দত্তের, মধ্যমা কন্যার সহিত বাড়ুবাগান-নিবাসী কালীপ্রসন্ন সিংহের পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র সিংহের, তৃতীয়া কন্যার সহিত পটলডাঙ্গা-নিবাসী গিরীন্দ্রনাথ দত্তের এবং কনিষ্ঠা কন্যার সহিত বেলুড়-নিবাসী ডাক্তার ননিলাল দত্তের বিবাহ হইয়াছে।

শিবনারায়ণ বসুর মধ্যম পুত্র বিহারীলাল বসু ১২৫৪ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাতৃবিয়োগ এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃবিয়োগ হয়। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি মেসার্স রেমফ্রি এণ্ড বোস সলিসিটার্সের ফার্ম্মে আরটিকেল হন। তিনি হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশের কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রায় এক বৎসর ঐ ফার্ম্মে কার্য্য করিবার পর মেসার্স জেমস্ এণ্ডারসন্ কোম্পানীর ম্যানেজার উক্ত সলিসিটর্স ফার্ম্মে একদিন কোনও কার্য্যোপলক্ষে যান। তথায় সুন্দর, অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণ যুবক বিহারীলালকে কার্য্যনিরত দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হন এবং জেমস্ এণ্ডারসন কোম্পানীর অধীনে চাকুরী লইতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধে বিহারীলাল এণ্ডারসন কোম্পানীতে মাসিক ২৫ বেতনে চাকুরী লন। তথায় চাকুরী করিবার কালে একদিন অফিসের একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহাকে অতি অভদ্রভাবে ডাকে. ইহাতে বিহারীলাল অতিমাত্র অপমানিত বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ইংরাজ কর্ম্মচারীর মুখের উপর জবাব দেন। উভয়ের মধ্যে মারামারি হইবার উপক্রম

হয়। মিঃ জেমস্ এণ্ডারসন ইহা দেখিতে পান এবং সেই কর্ম্মচারীকে তিরস্কার করিয়া বলেন, "আমার আফিসে যে একজন আত্মসম্মানজ্ঞান-সম্পন্ন লোক আছে, ইহা দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছি।" তদবধি মিঃ এণ্ডারসন বিহারীলাল সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে একটি দায়িত্বমূলক পদ প্রদান করিলেন। বিহারী-লাল এই পদে কার্য্য করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি উক্ত পদে কার্য্য করিত, সে ষোল হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। এণ্ডার্সনের নিকট এই কথা বলিলে এণ্ডার্সন তাঁহার প্রতি পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে ষোলশত টাকা পুরস্কার দিতে চাহিলেন। কিন্তু বিহারীলাল এণ্ডার্সনকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "আমি যখন আমার কার্য্যকালের নিরূপিত সময়ের মধ্যেই এই প্রতারণা ধরিয়াছি এবং এজন্য যখন আমাকে নিরূপিত সময়ের অতিরিক্ত কাজ করিতে হয় নাই, তখন আমি এই পুরস্কার পাইবার অধিকারী নহি।"

মিঃ এণ্ডারসন বিহারীলালের এই স্বার্থত্যাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার বেতন ১৫০৲ টাকা করিয়া দিলেন। দুই বৎসর পরে বিহারীলালকে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে ও কমিশনে বিক্রয় বিভাগের ভার দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বার বৎসর এই পদে কার্য্য করিবার পর ফার্ম্মটী উঠিয়া যায়। অতঃপর বিহারীলাল স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। শেষ বয়সে তিনি ইলিয়ট কোম্পানীর অংশীদার হইয়াছিলেন এবং জে, এইচ, ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানীর এজেণ্ট হইয়াছিলেন। একুশ বৎসর বয়স হইতে তেত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা অর্জ্জন করিয়া নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণোপযোগী অর্থ ব্যতীত সমস্তই দুঃখীর দুঃখমোচনে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে ও অন্যান্য সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিবেশী দুঃস্থ পরিবারবর্গের কষ্টে সহানুভূতিসম্পন্ন ও-

স্বর্গীয় বিহারীলাল বসু।

স্বর্গীয় শ্যামলাল বসু

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বসু।
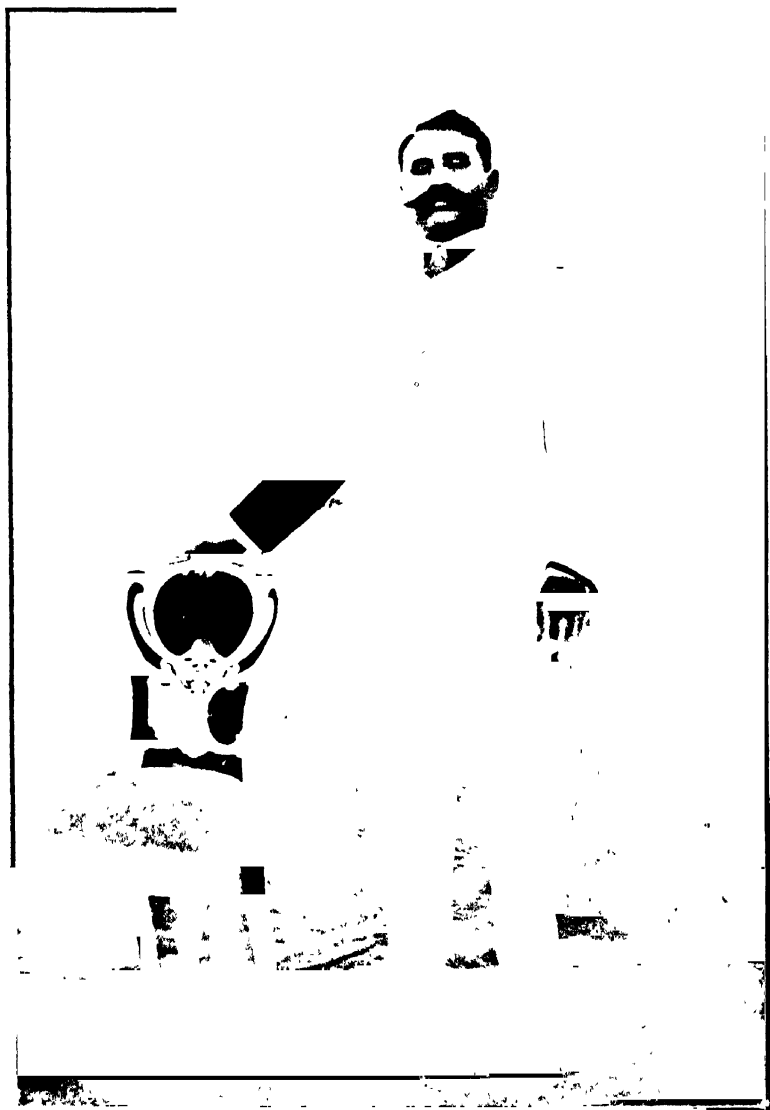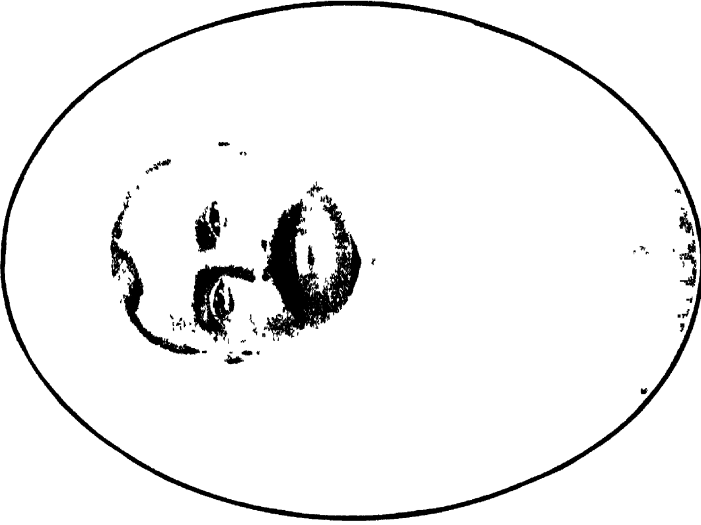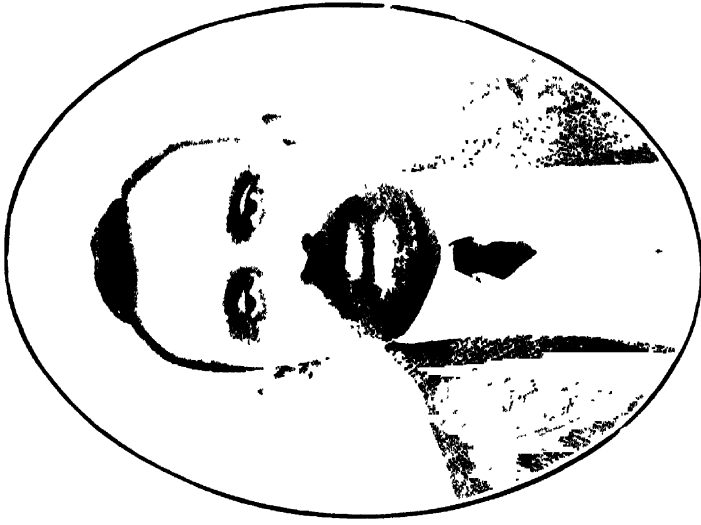
শ্রীযুক্ত সমীরেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু।
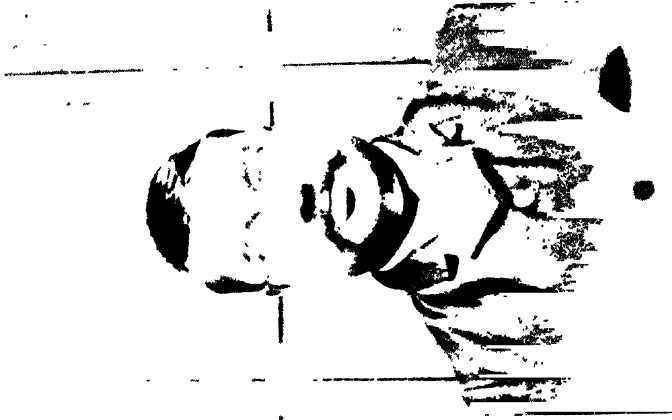
তাহাদের দুঃখমোচনে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন এবং তাহাদের সহিত নিজ আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিতেন। শেষ বয়সে বৃন্দাবন পাল লেনে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রে আস্থাবান্ ও সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন।

বিহারীলাল বসু মহাশয়ের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। কন্যার সহিত মজিলপুরের জমিদার গোপালদাস দত্তের পুত্র নন্দলাল দত্তের বিবাহ হয়। এই কন্যা বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই মারা যান।

বিহারীলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ জে, এইচ্ ইলিয়ট এণ্ড কোং লিমিটেডের বেনিয়ান ছিলেন। এই কোম্পানী বন্ধ হইলে নিজে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। যোগেন্দ্রনাথের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষে তিনি কুমারটুলীর মিত্রবংশে বিবাহ করেন, দ্বিতীয় পক্ষে তিনি রাজাবাজারের কালো সোমের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। ইনি অত্যন্ত স্বাধীনপ্রকৃতির লোক এবং সদালাপী। ইঁহার ছয় পুত্র ও এক কন্যা। কন্যার বিবাহ বারুইপুরের জমিদার হেমচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাস মিত্রের সহিত হয়। দুর্গাদাস হাইকোর্টের একজন বেঞ্চ ক্লার্ক। যোগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিলকুমারের দুই বিবাহ এবং দ্বিতীয়বারে বহুবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দত্তের চতুর্থা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিনয়কুমারের সহিত চন্দননগরনিবাসী শরৎচন্দ্র সিংহ রায়ের তৃতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছে। তৃতীয় পুত্র সুনীলকুমারের সহিত শিবনারায়ণ দাস লেন-নিবাসী শ্রীযুত মন্মথনাথ রুদ্রের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। চতুর্থ পুত্র অরুণকুমার, পঞ্চম পুত্র অজিতকুমার ও কনিষ্ঠ অমিতকুমার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন।

বিহারীলাল বসুর মধ্যম পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বসু। ইনি ব্যবসায় বাণিজ্য ও কয়লার খনি হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ১৯২৪

সালের জানুয়ারী মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষে বারুইপুরের জমিদার ৺হেমচন্দ্র চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে ও দ্বিতীয় পক্ষে রামবাগান-নিবাসী মহেন্দ্রচন্দ্র আইচের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। সুরেন্দ্রনাথ স্পষ্টবক্তা, নির্ভীক প্রকৃতির লোক ছিলেন। বহুলোককে ইনি অজস্র টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। কন্যার বিবাহ শিবপুরনিবাসী তুলসী-চরণ মিত্রের পুত্রের সহিত হইয়াছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ শচীন্দ্রনাথ। শৈলেন্দ্রনাথের বিবাহ কলিকাতা সিমুলিয়া নিবাসী ৺ গোষ্ঠচন্দ্র ঘোষের মধ্যম পুত্র রমেশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা তরুবালার সহিত হইয়াছে।

বিহারীলাল বসুর তৃতীয় পুত্রের নাম শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু। ভূপেন্দ্রনাথ ১২৮৩ বঙ্গাব্দে ১২ই শ্রাবণ বুধবার প্রাতঃকালে ৬ঘটিকার সময় কোম্বুলিয়াটোলাস্থ পৈতৃক বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। সাউথ সুবারবন স্কুল হইতে তিনি এণ্ট্রান্স, সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ হইতে তিনি এফ-এ পাশ করিয়া ঐ কলেজেই বি-এ পড়েন। অতঃপর তিনি হিসাব-নিকাশী পরীক্ষায় (Accountantship Examination) উত্তীর্ণ হন, কিন্তু সরকারী চাকুরী করিতে অস্বীকার করেন। তিনি কেরাণীস্বরূপ অতি অল্প বেতনে ইলিয়ট কোম্পানীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু আপন প্রতিভাবলে তিনি ঐ ফার্ম্মের একজন অংশীদার হন। যখন ফার্ম্মটী লিমিটেড কোম্পানীরূপে পরিণত হয়, তখন তিনি ঐ ফার্ম্মের অন্যতম ডিরেক্টর হন। এক্ষণে তিনি উক্ত ফার্ম্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ভূপেন্দ্রনাথ রামবাগানের দত্তবংশের শরৎচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলা দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহার এক পুত্র, দুই কন্যা। পুত্রের নাম শ্রীমান্ সমীরেন্দ্রনাথ বসু। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিজলীপ্রভার সহিত দরমাহাটা-নিবাসী স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র

ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত আশুতোষ ঘোষের বিবাহ হয়। আশুতোষ অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ও হাটখোলার বিখ্যাত জমিদার। ভূপেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলপ্রভার সহিত প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস এম্-ডি, সি-আই-ইর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার প্রভাসচন্দ্র দাসের বিবাহ হইয়াছে, প্রভাসচন্দ্র বিলাত হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। ইনি বিখ্যাত দন্তচিকিৎসক (Dental Sergeon)। ভূপেন্দ্রনাথের পুত্র সমীরেন্দ্রনাথের সহিত শ্যামবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺শ্যামলাল মিত্রের পৌত্র রায় শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবীর বিবাহ হইয়াছে ভূপেন্দ্রনাথ বাগবাজারে একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন।

এই বাটীতে তিনি যথারীতি পূজাপার্ব্বণাদি করিয়া থাকেন। ইঁহার স্ত্রী নির্ম্মলা দেবী আদর্শ হিন্দুরমণী। বাটীতে ৺মহামায়ার পূজার সময় ইনি স্বহস্তে পূজার আয়োজন ও ভোগাদি রন্ধন করিয়া থাকেন। বাটীর অন্যান্য মহিলাগণ তাঁহাকে এই কার্য্যে সাহায্য করেন। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় ইহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হওয়াতে তিনি উপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের সকল সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ক্ষত্রিয়ের যাহা উপযুক্ত কর্ম্ম তাহা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সহিত তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি এই বৎসর বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সহঃ সভাপতি ছিলেন। ইনি সাতিশয় মিষ্টভাষী ও আড়ম্বরবিহীন। স্পষ্টবাদিতা ইঁহার একটী গুণ।

বিহারীলালের চতুর্থ পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ; ইনি এক্ষণে ব্যবসা

করিতেছেন। ইনি মিষ্টভাষী এবং হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। ইনি ক্ষত্রিয়ের সংস্কার উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। নৃপেন্দ্রনাথ মজিলপুরের কেদারনাথ দত্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রনাথের সহিত হাওড়া-নিবাসী স্বর্গীয় বসন্ত কুমার ঘোষের মধ্যমা কন্যা অমিয়বালার বিবাহ হইয়াছে। ইঁহার মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ, তৃতীয় বীরেন্দ্রনাথ, চতুর্থ রবীন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ অশোকনাথ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত বারুইপুরের জমিদার সতীশচন্দ্র চৌধুরীর মধ্যম পুত্র কৃষ্ণদাস চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে।

বিহারীলালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু বি-এস-সি ষ্ট্রক্‌চারাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি উচ্চ প্রাথমিক, মধ্য ইংরাজী ও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর হাটখোলা দত্তবংশীয় রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুরের কন্যাকে বিবাহ করেন। ২১ বৎসর বয়সে তিনি B.SC. পাশ করেন। তিনি Eagle Foundry Co. Ltd. এর ম্যানেজার ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ক্ষত্রিয়ের সংস্কার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার তিনি অন্যতম সভ্য এবং বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। বহুদিন হইতে কায়স্থ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য এবং সহঃ সম্পাদক। ইঁহার একমাত্র পুত্রের ১৩২৬ সালের শেষভাগে মৃত্যু হওয়াতে ইনি সস্ত্রীক ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিবার মানসে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ মহারাজ বালানন্দ স্বামীজীর নিকট দীক্ষিত হইয়া ১৩২৭ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে ৺রাধারমণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া উপাসনা ও নিত্যসেবা করিতে থাকেন। ইনি ইঁহার উপার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ অংশ ধর্ম্মার্থে ও দেবসেবায় ব্যয় করেন। ইঁহার স্ত্রী অন্যান্য

বিষয়ে যেরূপ, এই বিষয়েও সেইরূপ ইঁহার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। তিনি হিন্দুর চিরাচরিত প্রথানুসারে বার মাসে তের পার্ব্বণ করিয়া থাকেন। নিত্যপূজা ইনি স্বহস্তেই করেন। কোনও রূপ প্রতিবন্ধক হইলে বা স্থানান্তরে গমন করিলে পুরোহিতের উপর সেবার ভার অর্পিত হয়। পার্ব্বণাদি উপলক্ষে যথারীতি ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম হইয়া থাকে। নিত্যপূজায় সস্ত্রীক স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া ৺নারায়ণকে ভোগ প্রদান করেন। প্রতিবৎসর অন্নকূপের সময় সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়।

দরমাহাটা বসু-বংশের তালিকা

নয়নচন্দ্র
রাজনারায়ণ
রামনারায়ণ
শ্রীনারায়ণ
শিবনারায়ণ
লক্ষ্মীনারায়ণ
নবীনচন্দ্র
ব্রজজীবন
বিহারী
শ্যামলাল
শ্যামাচরণ
সদানন্দ
মন্মথ
হরিচরণ
তারিণীচরণ
উপেন্দ্র
নরেন্দ্র
গিরীন্দ্র
বিপিনচন্দ্র
চন্দ্রনারায়ণ
মতিলাল
গোপালদাস
ক্ষেত্রকৃষ্ণ
শীতলচন্দ্র
রাজেন্দ্রচন্দ্র
নগেন্দ্র
অমৃত
ব্রজলাল
পীতাম্বর
অতুলচন্দ্র
নির্ম্মলকুমার
চণ্ডীচরণ
তারকনাথ
যোগেন্দ্রনাথ
সুরেন্দ্রনাথ
ভূপেন্দ্রনাথ
নৃপেন্দ্রনাথ
ফণীন্দ্রনাথ
সমীরেন্দ্রনাথ
০
শৈলেন্দ্রনাথ
শচীন্দ্রনাথ
অনিল
বিনয়
সুশীল
অরুণ
আজিত
অমিয়

নৃপেন্দ্রনাথ
শ্যামলাল
যতীন্দ্র
সত্যেন্দ্র
বীরেন্দ্র
রবীন্দ্র
অশোকনাথ
কৃষ্ণলাল
প্রিয়লাল
হীরালাল
পান্নালাল
জহরলাল
দেবেন্দ্র
রমেন্দ্র
দুর্গা
হরি

৺মোহিনী মোহন শর্ম্মা

স্বর্গীয় মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

১২৪৫ সালের ২১এ আষাঢ় পুণ্যতিথিতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালীর সংলগ্ন এলঙ্গি গ্রামে একটি খ্যাতিসম্পন্ন পবিত্রব্রাহ্মণবংশে স্বর্গীয় মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। এতদঞ্চলের তৎকালীন স্বনামধন্য পুরুষ ৺কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার পিতা ও ৺নবকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার পিতামহ এবং জেলা নদীয়ার অন্তর্গত মুড়াগাছা-নিবাসী ৺রামানন্দ ভৌমিক মহাশয়ের দুহিতা স্বর্গীয়া ভগবতী দেবী তাঁহার জননী ছিলেন। এই গরীয়সী জননীর এবং গরীয়ান্ পিতা ও পিতামহের আদর্শই মোহিনীমোহনের জীবনের সংগঠনী শক্তি। পিতামহ নবকিশোর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন কুমারখালীর রেশম-কুঠির সুদক্ষ দেওয়ান এবং পিতা কৃষ্ণলাল তৎকালীন মর্য্যাদাসম্পন্ন বঙ্গীয় পুলিশবিভাগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ দারোগা ছিলেন। প্রাচ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত মোহিনীমোহনের মাতৃকুল ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সৌজন্যে ব্রাহ্মণসমাজে নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

পাশ্চাত্য রীতি ও কর্ম্মধারার সহিত সংস্রবযুক্ত এবং সহজাত প্রাচ্য গুণান্বিত পিতা ও পিতামহ হইতে এবং প্রাচ্য আদর্শে নিয়ন্ত্রিত মাতৃকুল হইতে মোহিনীমোহন শিক্ষা ও সভ্যতার যে একটা সংস্কৃত ও মার্জ্জিত অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দোষ-বিচ্যুত গুণাবলীরই অপূর্ব্ব সমন্বয় এবং মোহিনীমোহনের ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনে যে প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহা তাহারই ফলস্বরূপ।

মোহিনীমোহনের পাঁচ ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিলেন এবং মোহিনী-মোহনই তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তাঁহার ২২ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ এবং ২৭ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয় এবং এই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই

একটা বৃহৎ পরিবারের ভার বিষয়ানভিজ্ঞ যুবক মোহিনীমোহনের স্কন্ধে নিপতিত হয়। যখন তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূচনামাত্র, সেই যৌবন-প্রারম্ভেই মোহিনীমোহন উপর্য্যুপরি স্বজনবিয়োগ ও রোগশোকে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়েন। তথাপি তিনি অম্লানবদনে ও অবিচলিতচিত্তে কতকগুলি বিপন্না বিধবা ও আর্ত্তের ভার স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়া সংসারপথের যাত্রী হয়েন।

বাল্যকাল হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মোহিনীমোহনের জীবন শান্তিপূর্ণ না হইলেও পঠদ্দশায় প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি অসাধারণ মেধা ও চরিত্রবলে তৎকালীন ছাত্রসমাজে একটি উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া পরিচিত হয়েন। তিনি পরীক্ষায়, কি স্কুলে, কি কলেজে কখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই। সেকালের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা, জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তৎকালীন বিদ্বৎ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

মোহিনীমোহন যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালে বিশেষ আদরণীয় ও অর্থকরী হইলেও সংসারক্ষেত্রে এই নব-প্রবিষ্ট যুবক তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যার উপযুক্ত অন্য কোনও বিশিষ্ট কর্ম্মের জন্য অপেক্ষা করিতে সমর্থ না হইয়া, ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে এই কুষ্টিয়া মহকুমায় সর্ব্ব-প্রথম আঠার টাকা বেতনের একটি কেরাণীর পদগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু জ্ঞান ও শক্তি অপ্রতিহত। যতই সামান্যক্ষেত্রে তাহা প্রযুক্ত হউক না কেন, তাহার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও মোহিনীমোহনের অসাধারণ কর্ম্মশক্তি অচিরেই স্ফুরিত হইয়া উঠিল। তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে লুক্কায়িত উজ্জ্বল রত্নখণ্ডের মত মোহিনীমোহনের প্রতিভা দিন দিন ভাস্বর হইয়া উঠিল। মহাকবি বলিয়াছেন,—"রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না, রত্নকেই লোকে অন্বেষণ করিয়া লয়"। পুরুষরত্ন মোহিনীমোহনের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। মোহিনীমোহন

এই সামান্য কার্য্যে অত্যল্পকাল-মধ্যেই যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিলেন, তাহাতেই তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী কুষ্টিয়ার তৎকালীন সবডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরবর্ত্তী কালে বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি এবং স্যর ডব্লিউ, হাণ্টার মোহিনীমোহনের চরিত্র, জ্ঞান ও কর্ম্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া, বদলির সময়ে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে এবং পরে বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েটে উপযুক্ত ও সম্মানিত পদ প্রদান করেন। পরে মোহিনীমোহন তাঁহাদেরই পরামর্শ ও উৎসাহে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েন এবং ঐ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বিচারাসন অলঙ্কৃত করেন।

মোহিনীমোহনের ঘটনাবহুল কর্ম্মজীবনে তাঁহার অসাধারণ নিপুণতা, নির্ভীকচিত্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিম্নোক্ত ঘটনাটি তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মোহিনীমোহন যখন নোয়াখালিতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন সরকারী তহবিল আত্মসাৎ করার অপরাধে তত্রত্য দেওয়ানী আদালতের জনৈক কর্ম্মচারী এবং কালেক্টরীর সেরেস্তাদার অভিযুক্ত হয়েন। বিচারভার মোহিনীমোহনের উপর অর্পিত হয় এবং কালেক্টর সাহেব আসামীদ্বয়কে শাস্তি দিবার জন্য মোহিনীমোহনকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা, ন্যায়পরায়ণ মোহিনীমোহন কালেক্টর সাহেবের বিরাগভয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না। আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে যে প্রমাণ উপস্থিত হইল তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া দৃঢ়চিত্তে ন্যায়বিচার করিয়া আসামীদ্বয়কে মুক্ত করিয়া দিলেন। এই ঘটনায় যদিও কালেক্টর সাহেবের রোষবহ্নিতে পড়িয়া মোহিনীমোহনকে কিছুকাল বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তথাপি ধর্ম্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক মোহিনীমোহন তাহাতে কিছুমাত্র কাতর ও অবনমিত হয়েন নাই।

পরিণামে কালেক্টর সাহেবের সহিত মোহিনীমোহনের যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয় তাহা ক্রমে কমিশনার ও পরে বঙ্গের লাট বাহাদুরের গোচরে আনীত হয়। ফলে মোহিনীমোহনের শীঘ্রই বেতন বৃদ্ধি হয় এবং পক্ষান্তরে কালেক্টর সাহেব কোন জেলার ভারপ্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হয়েন। ন্যায়নিষ্ঠ মোহিনী-মোহন কর্ম্মজীবনের কঠোর কর্ত্তব্য কিরূপ দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সহিত সমাপন করিতেন তৎসম্বন্ধে আর একটী ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে কোনও গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত কতকগুলি আসামীর বিচারভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। আসামীগণের বিরুদ্ধে যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইল তাহাতে তিনি তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবার অনুকূলে বিবেকের অনুমোদন পাইলেন না; কাজেই তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই কমিশনার সাহেব তাঁহার অফিস পরিদর্শন করেন এবং তাঁহার এ বিচার-ফলের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে উদ্যত হইবামাত্র তিনি দুঃখিত ও উত্তেজিত হইয়া প্রকাশ্য আদালতে নির্ভীকচিত্তে বলিয়া উঠিলেন :— "Do you think Mr. , I have sold my conscience for money?" এইরূপে মোহিনীমোহন তাঁহার কর্ম্মজীবনে অসংখ্য ঘটনায় যে সৎসাহস, ন্যায়পরায়ণতা, বিচারক্ষমতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, জনপ্রিয়তা এবং প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার কর্ম্মজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট দেশবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁহাকে কীর্ত্তির রাজ্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

সত্য ও ন্যায় মোহিনীমোহনের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়ে। সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত মোহিনী-

মোহন স্বীয় পুত্রকেও বিপন্ন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। মোহিনী-মোহন তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ও তাহার সমবয়স্ক একটী বাঙ্গালী ছাত্র সহ ভাবুয়া মহকুমায় থাকা কালে তাঁহার জনৈক দুষ্টমতি পদাতিক ঐ ছাত্রটীকে সঙ্গে লইয়া ডেপুটী বাবুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া কোনও এক ব্যক্তির পুষ্করিণী হইতে মৎস্য ধরিয়া লয়। পরে মোহিনীমোহন ঐ বিষয় শুনিবামাত্র অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া পুষ্করিণীর স্বত্বাধিকারীকে ডাকাইলেন এবং তাহার সম্মুখে ঐ পদাতিক, ছাত্র ও পুত্রকে উপস্থিত করাইয়া বলিলেন, "ইহারা তোমার পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিয়া বড়ই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে থানায় অথবা আদালতে অভিযোগ করিয়া ইহাদের অপরাধের সমুচিত শাস্তি বিধান কর।" বলা বাহুল্য, মোহিনীমোহনের এই ন্যায়নিষ্ঠা ও দৃঢ়চিত্ততা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেল এবং এই ব্যাপারটী আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে দিল না।

সততা ও অমায়িকতা-গুণে মোহিনীমোহন সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। সরকারী কার্য্যের নিয়মানুসারে তিনি যখনই বদলির আদেশ পাইতেন, তখনই সেই স্থানের অধিবাসিবৃন্দ মোহিনীমোহনের অভাব-চিন্তায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেন। তিনি যখনই যেখানে বিদায়-অভিনন্দন পাইয়াছেন, বক্তৃতা ও গীতাদিতে তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ সততা, অমায়িকতা, ও ন্যায়নিষ্ঠা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার বিদায়-অভিনন্দন-উপলক্ষে তমলুকের বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে বিবিধ পত্রপুষ্প-শোভিত সুসজ্জিত গৃহে প্রাচীরগাত্রে এবং তৎসন্নিহিত পাদপ-শাখা-বিলম্বিত আলোকমালায় সমুদ্ভাসিত প্রমোদোদ্যানে, বহুবর্ণ-রঞ্জিত আলোকাক্ষরে লিখিত সেক্‌স্‌পিয়র ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কবিগণের "I am armed so strong in honesty", ..."Flattery is the food of fools" ইত্যাদি অমরগাথা-সমূহের মোহিনী স্মৃতি অদ্যাপি ঐ অঞ্চলে শ্রদ্ধার সহিত কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

মোহিনীমোহন রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কিছু দিনের জন্য ভাগলপুরে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টরের কার্য্য করেন; তাঁহার তৎকালীন পেস্কার এখনও জীবিত থাকিয়া পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছেন। মোহিনীমোহনের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তিনি স্বতই বলিয়া থাকেন—"আমি বহু হাকিমের অধীন চাকরী করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মত ন্যায়নিষ্ঠ, তেজস্বী অথচ কোমলহৃদয় হাকিম কখনও দেখি নাই। তিনি দণ্ড দিবার সময়ে আসামীকে বলিতেন—"দেখ, বাবা, তুমি দোষী কি নির্দ্দোষ তাহা আমি নিশ্চয় জানি না; প্রকৃত ঘটনা অবশ্য একমাত্র ভগবান জানেন। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে সেগুলি তোমার দোষই সপ্রমাণ করিতেছে। অতএব, আইন অনুসারে বাধ্য হইয়া তোমাকে দণ্ড দিতে হইতেছে। এজন্য আমি দুঃখিত।"

মোহিনীমোহনের ছাত্রজীবন ও কর্ম্মজীবনের যে গৌরবকাহিনী এখনও পর্য্যন্ত লোকমুখে প্রচারিত হইতেছে, তাহা ভিন্ন তাঁহার প্রতিভায় প্রীত ও কর্ম্মকুশলতায় মুগ্ধ শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষকগণের প্রদত্ত বহু প্রশংসা-পত্রের উদ্ধার সাধন হইয়াছে।

মোহিনীমোহন অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ও সম্মানের সহিত কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়া সরকারী কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণপূর্ব্বক সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর পেন্‌সন্ ভোগ করেন। সাধারণতঃ অবসর-গ্রহণ ও পেন্‌সন্-ভোগ নিষ্ক্রিয়তাসূচক হইলেও কর্ম্মী মোহিনীমোহনের এই বার্দ্ধক্য ও দীর্ঘ অবসরকাল একটা যৌবনসুলভ উদ্যম ও অক্লান্ত কর্ম্মের মধ্যেই অতিবাহিত হইয়াছে। জন্মগত অধিকারস্বরূপে তিনি যে নিয়মানুবর্ত্তিতা, নিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাব পিতা ও মাতার নিকটে প্রাপ্ত হয়েন এবং বাল্যে যে আদর্শ ঐ সদ্‌গুণনিচয়ের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট হইয়া পড়ে, তাহাই তাঁহার কৈশোরে অসাধারণ মেধা এবং যৌবনে অপরিমেয়

কর্ম্মশক্তিতে পরিণত হইয়া যায়। তখন অলক্ষিতভাবে তাঁহার হৃদয়ে একটা স্বধর্ম্মপরায়ণতা, জাতীয়তা ও স্বদেশবৎসলতার বীজ উপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই উদার মনোবৃত্তি মোহিনীমোহনের সরকারী কর্ম্মজীবনের পরাধীনবৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে নাই। স্বদেশহিতৈষণার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই মহদুদ্দেশ্যসাধনকল্পে কুষ্টিয়া সহরে তাঁহার বর্ত্তমান আবাস সংস্থাপন করিলেন এবং অবসরপ্রাপ্ত মোহিনীমোহন একটা বিরাট বিশাল কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুধ্যানে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে তিনি যখন দেশীয় শিল্পের দিক দিয়া স্বদেশের একটা প্রধান অভাব লক্ষ্য করিলেন, তাহার কিছুকাল পরেই বঙ্গব্যবচ্ছেদ-উপলক্ষে একটা প্রবল আন্দোলন দেশমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যখন দেশের খ্যাতনামা বাগ্মী ও নেতৃবর্গ এই আন্দোলনে বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সভা আহ্বান ও বক্তৃতাপ্রদান করিয়া সমগ্র দেশ মুখরিত করিতেছিলেন, যখন জনসাধারণ দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদেশজাত পণ্যের পরিহার-চিন্তা করিতেছিলেন, তখন মোহিনীমোহন তাঁহার সেই চিন্তাকে একটা আকার দিয়া মূর্ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি অবিলম্বেই ক্ষুদ্র আয়োজনে একটা কাপড়ের কল সংস্থাপন করিলেন। মোহিনীমোহনের পবিত্র নাম হইতেই উত্তরকালে এই কলের নাম "মোহিনী মিল" হইয়াছে। দেশমাতৃকার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে একটা নূতন আকার দিবার জন্য কি অকৃত্রিম অনুরাগ একজন সরকারী কর্ম্মচারীর হৃদয়ে নিহিত ছিল এবং তাঁহারই দেশাত্মবোধের পরিকল্পনা, সর্ব্বস্ব-নিয়োগ এবং কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ফলে একটী অতি সামান্য গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান হইতে কি একটা বিরাট সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানে সমুদ্ভব হইয়াছে তাহারই মূর্ত্ত

ইতিহাস এই "মোহিনী মিল।" যখন বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলনে বাগ্মাস্থানীয় নেতৃবৃন্দ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুখরিত করিতেছিলেন, তখন এই নীরবকর্ম্মী মোহিনীমোহন স্বদেশের লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার এবং অন্ন-সমস্যার সমাধান-কল্পে নির্জ্জনে দেশমাতৃকার চরণে যে অর্ঘ্য স্থাপন করেন তাহারই পরিণতি এই "মোহিনী মিল"। স্বতই মনে হয়, ঋষিকল্প মোহিনীমোহন যেন দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বড় সাধের এই তৎকালীন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান একদিন বাঙ্গালার তথা ভারতের গৌরবের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

মোহিনীমোহন এই মিলের সংস্থাপয়িতা হইলেও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশবাসীর হৃদয়ে শিল্পোন্নতির প্রতি যে একটা প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল, "মোহিনী মিল" তাহারই সুফল সন্দেহ নাই। দেশ-সেবার এই নূতন পন্থা বঙ্গদেশে ইতিপূর্ব্বে কেহ লক্ষ্য করে নাই। স্বদেশী আন্দোলনের চিন্তাধারায় দেশের আর্থিক উন্নতির উপায়-উদ্ভাবন-কল্পে এই বিশিষ্ট উপায়টির দিকে যে সমস্ত মনীষীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল স্বর্গীয় মোহিনীমোহন তাঁহাদের অন্যতম এবং মিলের পরিকল্পনা মোহিনীমোহনের নিজস্ব। মোহিনীমোহন প্রথমতঃ তাঁহার কৃতবিদ্য পুত্রদ্বয়ের সহায়তায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে এই বিরাট অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেন। এই প্রকার জাতীয় অনুষ্ঠানের ফলাফল তখন অনিশ্চিত ছিল। কেন না, বস্ত্রশিল্প তখন বাঙ্গলায় অজ্ঞাত ছিল, ল্যাঙ্কাশায়ার তখন ভারতের লজ্জানিবারণ করিত এবং তাহারই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কাপড়ের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হইত। সে সময়ে বোম্বে ও আমেদাবাদ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বস্ত্রশিল্পে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম ছিল। বাঙ্গলায় একজনও ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৃটিশ শাসনের ২০০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে এই জাতীয় শিল্পানুষ্ঠানের বিশেষ কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত না হইলেও এই

মিলের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে মোহিনীমোহনের মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। বহুব্যয় ও শ্রমস্বীকারে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র বম্বে ও আমেদাবাদে মোহিনীমোহন তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয়কে মিল পরিচালনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সাধারণে এপর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্যকলাপ কেবল লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। পরে মিলের উন্নতি নিঃসংশয় হইলে এই মিলটিকে সাধারণের সম্পত্তিস্বরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য মোহিনীমোহন সাধারণের পক্ষ হইতে অনুরোধ প্রাপ্ত হয়েন। মিল-সংস্থাপনে মোহিনীমোহনের কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মোন্নতি-সাধনের কোন অভিপ্রায় ছিল না। জাতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন-কল্পে প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি এবং প্রসারই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। সুতরাং স্বদেশবৎসল উদারকর্ম্মা মোহিনীমোহন জনসাধারণের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তাহারই সাধু সঙ্কল্পে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ১৯০৮ সালে যৌথ কারবারে পরিণত হইল। স্বহস্ত-রোপিত নানা ফলপুষ্পশোভিত মহামহীরুহের ন্যায় মোহিনীমোহনের সেই স্বযত্ন-প্রতিষ্ঠিত মোহিনী মিল আজ নানা বিভাগে বিস্তৃত ও নানাগুণে বিভূষিত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। আজ তাঁহার সেই অসাধারণ কৃতিত্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া একটা বিরাট আকারে সগৌরবে উচ্চশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আজ তাঁহার এই বিরাট অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতার কত শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও শত শত শ্রমিক-সন্তান কর্ম্মীস্বরূপে যোগদান করিয়া এই অন্নসমস্যার দিনে অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে। আজ পরমুখাপেক্ষী বহু ভারতসন্তান মোহিনীমোহনের পরিকল্পিত স্বদেশজাত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে। আজ অমরধামে শান্তির রাজ্যে তাঁহার পবিত্র আত্মার উদ্দেশে সহস্র সহস্র ভক্ত্যবনত নরনারীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সাদরে অর্পিত হইতেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে মোহিনীমোহন যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ছিল। তিনি কখনও অহঙ্কার বা ক্রোধের বশীভূত হইতেন না। তাঁহার ধর্ম্মলিপ্সা চিরদিনই বলবতী ছিল। তিনি সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং দেবদ্বিজে যথেষ্ট ভক্তিমান্ ছিলেন। এমন কি ইষ্টমন্ত্র জপ না করিয়া তিনি কখনও জলগ্রহণ করিতেন না। নিষ্ঠাবান হিন্দুর যাহা কর্ত্তব্য, তিনি তাহা পালন করিতেন; কিন্তু ধর্ম্মের গোঁড়ামী ও আড়ম্বরকে ঘৃণা করিতেন। তিনি জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অতীত ছিলেন। তাঁহার নিজের বেশভূষা সামান্যই ছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালবাসিলেও তিনি বিলাসিতা ভালবাসিতেন না। তাঁহার বাবুগিরি আদৌ ছিল না। এমন কি, কেহ তাঁহাকে কখনও কেশের পারিপাট্য সাধন করিতে দেখেন নাই। তাঁহার জীবনটাকে তিনি যেন সহজ সরল করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিজের কোনও অনাবশ্যক সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য বিলাস-চরিতার্থতা হেতু তিনি কখনও অর্থ নষ্ট করেন নাই। তিনি উপযুক্ত দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। কি বিদ্যার্থী, কি গৃহহীন, কি নিরন্ন, কি কন্যাদায়গ্রস্ত, কি বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি, যিনিই যখন তাঁহার নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন তিনিই তাহা লাভ করিয়াছেন। মোহিনীমোহন আর্ত্তের বন্ধু এবং অজাতশত্রু ছিলেন।

গার্হস্থ্য জীবনে মোহিনীমোহন যে অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান ও মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছেন তাহা মানবতার আদর্শ। আভি-জাত্যের গৌরব ও বিলাসবিভ্রম সাধারণতঃ পরার্থপরতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিপন্থী হইলেও, চিত্তবৃত্তির কোনও হীন অনুপ্রেরণা তাঁহার হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই; বরং আর্ত্তের পরিত্রাণকল্পে তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইয়াছে। আর। থাকা কালে মাতারাম কাহার

নামক তাঁহার জনৈক চাকর দুরারোগ্য বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইলে মোহিনীমোহনের হৃদয় যেরূপ গভীরভাবে আলোড়িত হইয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই কঠিন ব্যাধির কবল হইতে মাতারামকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে সুদক্ষ ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া এবং তাহার পথ্যাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া দিয়া, চিকিৎসকগণের নিষেধ সত্ত্বেও সংক্রামতাভয়ে আদৌ ভীত না হইয়া, মাতারামের শুশ্রূষার জন্য অবসর-সময়ে আপনাকে এবং অন্য সময়ে তদীয় একাদশ বর্ষ বয়স্ক প্রাণাধিক পুত্রকে নিয়োজিত করিয়া যে আত্মোৎসর্গের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছিলেন তাহা মানবের ইতিহাসে খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তিনি আপনার ও প্রাণপ্রিয় পুত্রের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও আর মাতারামকে বাঁচাইতে পারিলেন না এবং যখন তিনি মাতারামের ইহলোকের কর্ত্তব্যে বিফলপ্রয়াস হইলেন, তখন ধর্ম্মাত্মা মোহিনীমোহন মাতারামের মৃত্যুকালে তাহার ব্যবহৃত যে সুবর্ণ-তাবিজ খুলিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, পরে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বারাণসীতে গমন করিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণ-কামনায় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা বেদপাঠ করাইয়া মাতারামের পরিত্যক্ত উক্ত সুবর্ণ-তাবিজ তাঁহাদিগকে দান করিয়াছিলেন। মোহিনীমোহনের এই আত্মোৎসর্গ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সমাজের

মোহিনীমোহনের গুণরাশির মধ্যে সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাহাই তাঁহার দীর্ঘজীবনলাভের প্রধান কারণ। তিনি মিতাহারী ছিলেন। ক্ষুধা ও জীর্ণশক্তির অনুপাতে যখন যে খাদ্য যে পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য, তিনি তাহাই নিয়মিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আহার করিতেন। যতই উপাদেয়, রুচিকর বা লোভনীয় হউক না কেন, তদতিরিক্ত কোন দ্রব্যই তিনি আহার করিতেন না। কোন মাদক দ্রব্যের এমন কি পান-তামাকের

সহিতও তাঁহার জীবনে কখনও পরিচয় হয় নাই। তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রয়োজন অনুসারে যখন যেটুকু পরিশ্রম করা আবশ্যক তাহা তিনি করিতেন এবং নিয়মিত ভ্রমণে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞান-পিপাসু ছিলেন। তাঁহার নিজের একটি পুস্তকালয় ছিল। তিনি জ্ঞান ও গবেষণামূলক পুস্তকাদি এবং সংবাদপত্র নিয়মিতরূপে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন এবং সময়ের মূল্য এতই বুঝিতেন যে, জীবনের একটি মুহূর্ত্তও তিনি বৃথা যাইতে দিতেন না। তিনি অতীব সংযমী ছিলেন। কোনও সময়ে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক কর্ণেল ডিয়ায়ের ব্যবস্থা-নুরারে রোগপ্রশমনার্থ তিনি অহিফেনসংযুক্ত ঔষধ অনেকদিন যাবৎ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়েন। পরে অন্য কোন ব্যাধির চিকিৎসার্থ খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনানের পরামর্শ চাহিলে তিনি বলেন যে, হোমিও-প্যাথিক ঔষধের দ্বারা তাঁহার রোগ আরোগ্য হইতে পারে কিন্তু ঔষধের সহিত তিনি যে অহিফেন-ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা সম্ভব হইবে না এবং তাঁহার দেহে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কোন ক্রিয়াও হইবে না। মোহিনীমোহন ডাক্তার ইউনানের ঐ কথা শুনিবামাত্র একটু হাসিয়া বলিলেন—"আমি কোন অভ্যাসের দাস নহি। অহিফেন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে আদৌ অসম্ভব বা কঠিন নহে। আমি এই মুহূর্ত্ত হইতেই উহা পরিত্যাগ করিলাম।" তদবধি মোহিনীমোহন জীবনে আর কখনও অহিফেন বা অহিফেন-সংযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করেন নাই। বলা বাহুল্য, ডাক্তার ইউনানের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ-ব্যবহারে তিনি ঈপ্সিত ফল লাভ করেন। মোহিনী-মোহন স্থূলকায় ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি শালপ্রাংশু মহাবাহু ছিলেন। তাঁহার দেহ সর্ব্বথা কর্ম্মঠ ছিল, তিনি অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কখনও স্থবির হয়েন নাই। তিনি কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও যে সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, ইহাই তাঁহার সংযমশক্তি ও নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মোহিনীমোহনের জীবনে আর একটি মহৎগুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। ধর্ম্মে বা কর্ম্মে তিনি আদৌ আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না, কখনও আভিজাত্যের গৌরব করিতেন না। তাঁহাকে কেহ কখনও কোনও কার্য্যে বাক্‌চাতুর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখেন নাই। তিনি নীরবকর্ম্মী এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। অচল, অটলভাবে কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া তিনি জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন।

মোহিনীমোহনের একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি যুগপৎ কুলিশকঠোর ও কুসুমকোমল ছিলেন। কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও বিবেকের অনুপ্রেরণায় তিনি যেমন বজ্রের ন্যায় কঠোর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতে জানিতেন, তেমন তাঁহার হৃদয় কুসুমের ন্যায় কোমলতা-গুণবিশিষ্টও ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মোহিনীমোহন তাঁহার উপযুক্ত পুত্রকে বহুজন-বাঞ্ছিত সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট-পদ গ্রহণ করিতে না দিয়া তাঁহাকে মিলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উন্নতি-সাধনে নিয়োজিত করিয়া তিনি যে সৎসাহসের পরিচয় দেন তাহা বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসে বিরল। এইরূপ চরিত্রতেজে মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় বলীয়ান্ হইলেও মোহিনীমোহন অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্য ও সৌজন্য সকলকেই মুগ্ধ করিত। তিনি ব্যথিতের বেদনা এবং বিপন্নের দুঃখ অনুভব করিতে পারিতেন। তিনি নানাবিধ দুরারোগ্য রোগের যথা—অম্লপিত্ত ও হাঁপকাশের দৈব ঔষধ বিনামূল্যে বহু রোগীকে প্রদান করিয়া রোগমুক্ত করিতেন। দীন, দুঃখী এবং অভাবগ্রস্ত রায়তের অভাব-মোচনে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কর্ম্মজীবনে যেখানেই থাকুন না কেন, সেইখানেই দরিদ্র ছাত্রদিগকে তাঁহার আবাসে রাখিয়া বিদ্যোৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এবং অর্থসাহায্য দ্বারা বিদ্যার্থীদিগের প্রভূত-

কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত যথাযোগ্য ভক্তি ও সম্মান লাভে বঞ্চিত হয়েন নাই। দানশীল মোহিনীমোহন যখনই কোন দান করিতেন, তাহা প্রকাশ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার দানের মধ্যে এমন গুপ্তদান অনেক ছিল যাহা তাঁহার প্রাণপ্রিয় সন্তানগণকে পর্য্যন্ত জানিতে দিতেন না।

বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে মোহিনীমোহনের জীবনী সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিবার স্থান নাই। এক কথায়, বঙ্গজননীর সুসন্তান, স্বদেশের গৌরবরবি, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক, অশেষগুণালঙ্কৃত মোহিনীমোহনকে আমরা নবযুগের আদর্শ বলিতে পারি। তিনি একাধারে নরদেবতা ও কর্ম্মী তাপস ছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন ভাবী পুরুষের অনুকরণীয়। এই জড়দেহ নশ্বর হইলেও তাহা কি উপয়ে সুদীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন ও মানবের হিতানুষ্ঠানপূর্ব্বক পার্থিব সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াও কিরূপে অমরত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাই এই মহাপুরুষ মোহিনীমোহন স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়া সুদীর্ঘ ৮৪ বৎসর ৪ মাস বয়সে বার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক নিয়মে বিশেষ কোন ব্যাধির কবলে কবলিত না হইয়া সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে ইষ্টধ্যানে ১৩২৮ সালের ২০শে কার্ত্তিক তারিখে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

মোহিনীমোহনের চারি পুত্র—তন্মধ্যে প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত সতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, বি-এল ভাগলপুর জজ কোর্টের উকিল। অপর তিনপুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন বর্ত্তমানে মোহিনীমোহনের অক্ষয় কীর্ত্তি "মোহিনী মিলের" ম্যানেজিং এজেণ্ট-পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কাটোয়া থানায় দেওয়াসীন নামে ক্ষুদ্র পল্লী অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে, বহু পূর্ব্বে এক ব্রহ্মচারীর উপর দেবতার আবেশ হয়। তিনি এই স্থানে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যহ ধূমধামের সহিত পূজার্চ্চন করিতেন এবং পীড়িতের পীড়া শান্তির জন্য এবং বন্ধ্যার পুত্র লাভ নিমিত্ত ঔষধ বিতরণ করিতেন। ক্রমে ২।৪ জন তাঁহার সেবক হইয়া তথায় বাস করিতে থাকিল। গুণে আকৃষ্ট হইয়া আরও লোক তথায় ঘর-বাড়ী করিল। স্থানটী মনোরম—নদীর তীরে। ক্রমশঃ স্থানটী পল্লীরূপে পরিণত হইল। ব্রহ্মচারীকে লোকে দেওয়াসীন (দেবাসীন) বলিত। কালবশতঃ লোকের কথায় কথায় সে স্থানের নামও দেওয়াসীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পল্লীতে যোগেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম। অল্প বয়সেই তাঁহার লোকান্তর ঘটিয়াছে। জনশ্রুতি আছে, ইঁহার বহু পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল পদ্মাপারে। ইঁহারা খনিয়ানের চাটুর্জ্জী, শ্রীকরের সন্তান। সুরুই মেল। যোগেন্দ্রচন্দ্রের পুত্র নীলমণির ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ নন্দকিশোর একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি উপাদেয় সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি কীটদষ্ট হইয়াছে এবং ঐ গুলির সারাংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ছিন্ন জীর্ণ পত্রাবলীর সংযোজন জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় নাই। তাঁহার উপাধি ছিল, সার্ব্বভৌম। নীলমণির ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ (প্রপিতামহ) নফরচন্দ্র ১০৪ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। পরের দুঃখ-মোচনের প্রবৃত্তি তাঁহার বড়ই প্রবল ছিল। লোককে টাকা ধার দিয়া তিনি কখন দলিল লয়েন নাই ; চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী মানিয়া ছাড়িয়া দিতেন। তাহাতে কাহারও টাকা অনাদায় হইলে বলিতেন,—ও টাকা

আমার নয়, আমার হইলে ঘরে ঢুকিত। তিনি বিনা বিষ্ণুপূজয় জলগ্রহণ করিতেন না। পূর্ব্ব হইতে ইঁহাদের লবণ, রেশম ও সূতার কারবার ছিল। আমাদের কবি (পাঁচালীর একনিষ্ঠ সেবক বা প্রবর্ত্তক) দাশু রায় মহাশয়ের মাতুলালয় পীলা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে যে কুঠীর চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা ইঁহাদেরই। এই পাঁচ প্রকারেই ইঁহাদের অবস্থা উন্নত। নফরচন্দ্রের পুত্র ডোমনচন্দ্র। তিনি বেশভূষাপ্রিয় বাবু ছিলেন। তিনি অল্পবয়সেই উপরত হন তাঁহার একমাত্র পুত্র এই যোগেন্দ্রচন্দ্র। তিনি পৈতামহ গুণাবলীর সহিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। বরং তাঁহার সদ্‌গুণ বিশিষ্টরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি বিশেষ অধ্যবসায়ী পুরুষ ছিলেন। প্রথমে তিনি পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া অধ্যবসায়গুণে সংস্কৃত ভাষায় অনেকটা জ্ঞানলাভ বরিয়াছিলেন। গীতা ও ভাগবতে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। দয়া ধর্ম্ম মায়া মমতা তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার ছিল। তিনি কঠিনে কোমলে ছিলেন। যিনি কঠিন, তাঁহার কাছে তিনিও কঠিন। ন্যায় ধর্ম্ম সত্যের সঙ্গে সরল সুন্দর ভাবে চলিতেন। পাড়াগাঁয়ে তাঁহার বাড়ী। তাঁহার মড়াই-বাঁধা ধান আর পুকুরের মাছ পরের জন্যই ব্যয়িত হইত। দুই এক বৎসরের অজন্মা হইলে স্বগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরা বলিত,—ভাবনা কি?—যোগীবাবুর গোলাই আমাদের। তা' বাস্তবিক; আজ ঘরে অন্ন নাই বলিয়া যে কোন লোক তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইলে সে কখনই বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিত না। কোন ভদ্রলোককে খাবারের জন্য টাকা বা ধান বাড়ী দিয়া কখন তাহার সুদ গ্রহণ করিতেন না। মহালের বাকী খাজনা—যত দিনের বাকী পড়া হউক না, ব্রাহ্মণের সুদখরচা একবারে ছিল না। কাহারও গৃহবিবাদ ঘটিলে তিনি বিনা আহ্বানে যে কোন রূপে তাহা মিটাইয়া দিতেন। পক্ষ কিছু ত্যাগ করিলে

কার্য্যটা মিটিয়া যায় অথচ পক্ষ সে ত্যাগ স্বীকার করিতেছে না, তিনি নিজ হইতে প্রতিপক্ষের নামে অর্থ দিয়া তাহাকে ক্ষান্ত করিতেন, বিবাদ মিটাইয়া দিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতেন! লোকের কন্যাদায়ে, মাতৃ-পিতৃদায়ে, দীন ব্রাহ্মণসন্তানের উপনয়নে নানাপ্রকারে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং স্বয়ং কার্য্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য-সমাধান্তে বাটী আসিতেন। কর্ম্মকর্ত্তা যতই সামান্য লোক হউন, তাচ্ছিল্য জ্ঞান করিতেন না। এ অঞ্চলের ছোট বড় সকলের জ্ঞান ছিল, যোগীবাবু অনেকের মা বাপ। তাঁহার একমাত্র পুত্র নীলমণিতেও পৈতৃক গুণাবলী সঞ্চারিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গোলোকবিহারী রায়।

ইনি রাঢ়ী শ্রেণী কাশ্যপ গোত্রের সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। কাটোয়া থানার অধীন শিলাগ্রামে ইঁহার বাস। পূর্ব্বে ইঁহার পিতামহ জগবন্ধু রায় ছোট কুলগাছি গ্রাম হইতে সপরিবারে আসিয়া শিলাগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার এখানে আগমন সম্বন্ধে জনপ্রবাদ আছে যে, জগবন্ধু কোন মোকদ্দমায় একবার মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে উপরুদ্ধ হন; কিন্তু তাহাতে তিনি নিতান্ত নারাজ ছিলেন। তিনি আমোদচ্ছলেও কখন মিথ্যা বলেন নাই; মিথ্যাকে বিষবৎ জ্ঞান করিতেন। যখন দেখিলেন, মিথ্যা না বলিলে বড় লোকের বিষ-নয়নে পড়িয়া জ্বলিতে পুড়িতে হইবে, হয়ত মরিতেই হইবে, নিস্তার কিছুতেই নাই, তখন তিনি 'ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ'—এই চাণক্য-নীতির অনুসরণ করিয়া গ্রামের জন্য কুলত্যাগ না করিয়া কুলের কারণ গ্রাম ত্যাগপূর্ব্বক সত্যরক্ষা করিলেন।—শিলাগ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এ স্থানটী কৃষিপ্রধান। তিনি এখানে লোকের নিকট ২।৫ বিঘা জমী কোর্ফা সূত্রে লইয়া চাষ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে চাষে বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল। হাতেও কিছু নগদ টাকা সঞ্চিত ছিল। সে সময়ে এলিয়াস্ আগাওয়াঞ্জন সাহেব শিলাগ্রামের (সাত সেকা পরগণার) জমিদার। তিনি উক্ত গ্রাম পত্তনি দিবার ঘোষণা দিলেন। এই অঞ্চলের অনেক ধনী উক্ত গ্রাম পত্তনি পাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। জগবন্ধু যেন সত্যরক্ষার পুরস্কারস্বরূপ সেই জগবন্ধুর কৃপায় অতি সহজে সুবিধায় গ্রামখানি পত্তনি পাইলেন। তিনি কখন ব্রাহ্মণের বাকী খাজনায় সুদখরচা

শ্রীযুক্ত গোলকবিহারী রায়

লইতেন না। উক্ত শিলাগ্রামের দক্ষিণে খড়ী নাম্নী নদী প্রবাহিতা। উহার এক বৃহৎ বিল। বর্ষায় বন্যার জলে যখন সমস্ত বিলটী জলপ্লাবিত হয়, তখন এক ভীষণ দৃশ্য। বন্যার জলে নিকটের অনেক ভূমি জলমগ্ন হইয়া তৈয়ারী ফসল নষ্ট হইত। কখন কখন মোটেই আবাদ হইতে পারিত না। প্রজারা অসমর্থতাবশতঃ বিষম ক্ষতি সহ্য করিয়া আসিত। উক্ত রায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে ভেরীর বাঁধ নামে এক বৃহৎ বাঁধ বাঁধিয়া সেই সব স্থানকে প্রচুর শস্যশালী করিয়া গিয়াছেন। বাঁধ বাঁধিতে জগবন্ধু কোন প্রজার কাছে কপর্দ্দক খরচাও গ্রহণ করেন নাই। আজ পর্য্যন্ত সামান্য হারে সে সব জমী প্রজারা ভোগ করিতেছেন।

জগবন্ধুর পুত্র গিরিশচন্দ্র। তৎ পুত্র অমুল্যহরি, রাধিকা-প্রসাদ ও গোলোকবিহারী। অমূল্যহরি এক পুত্র রাখিয়া অকালে লোকান্তর গমন করেন। পুত্রের নাম নারায়ণচন্দ্র। রাধিকাপ্রসাদ অপুত্রক উপরত হন। সর্ব্বকনিষ্ঠ গোলোকবিহারী পৈতামহ গুণাবলীর সহিত ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণচন্দ্র সহ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পরমসুখ হাজরা।

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত কুড়িচি নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে ইহার বাস। ইনি উপবীতধারী উগ্রক্ষত্রিয়। ইহাদের অশৌচকাল দ্বাদশ দিবস। ইহাদের পূর্ব্ববংশীয়গণ 'বর্ম্মণ' অভিখ্যাধারী ক্ষত্রিয়। ইহারা কিন্তু এখানে আসিয়া 'উগ্রক্ষত্রিয়' আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। কার্য্যকলাপে কিন্তু বর্ম্মণ 'বর্ম্মাণী' লিখিয়া বা বলিয়া থাকেন। উপবীত-গ্রহণের হুজুগে ইহাদের উপবীত-গ্রহণ নহে, বহু পূর্ব্ব হইতে ইহাদের উপবীত গ্রহণ আছে। তবে মালার আকারেই সর্ব্বদা সকলে উপবীত ধারণ করেন, ক্রিয়া-কাণ্ডের সময় দক্ষিণাবর্ত্তে ধৃত হয়।

ইহাদের কুলদেবতা সিংহবাহিনী ও শ্রীধর। যে ঊর্দ্ধতন পুরুষ পূর্ব্বনিবাস পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার নাম কাহারও স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায় নাই।—তিনি দুর্গাচরণ। তাঁহার দুই পুত্র। প্রথম বিশ্বনাথ, দ্বিতীয় ভোলানাথ। ইহারা দুইজনে দুইটী শিবমন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথ ও ভোলানাথের পর কয়েক পুরুষের নাম পাওয়া যায় নাই। পরের নিম্নের তালিকা প্রকাশিত হইল। জনপ্রবাদ আছে, ভাগবতের সহিত উক্ত দেবতার কথোপকথন হইত।

পরমসুখ সন ১২৯৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন ধনীর পুত্র, ধার্ম্মিক মহাজন।

শ্রীযুক্ত পরমস্থক হাজরা।

কুড়চির হাজরা-বংশ

দুর্গাচরণ
বিশ্বনাথ
ভোলানাথ
ভাগবত
শ্রীমন্ত
সর্ব্বচরণ
নীলমাধব
প্রতাপ
পরমসুখ
সরসামোহন
নিরঞ্জন
রামরঞ্জন
যামিনীমোহন
আনন্দময়ী
লালতমোহন
ধীরেন্দ্র
বীরেন্দ্র
অশোকবাসিনী
সত্যনারায়ণ
মেনকারাণী
বিভাবতী

শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল।

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত রোগুা গ্রামে সন ১২৭০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সিদ্ধ শ্রোত্রিয় রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ। নবাবের আমল হইতে ইহারা মণ্ডলোপাধিক তবে কাহার সময় হইতে এ উপাধি আসিল, পূর্ব্বোপাধি পরিত্যক্ত হইতে লাগিল, তাহা অবধারণ করা অসম্ভব। মণ্ডল উপাধি অহিন্দুর আছে, হিন্দুর মধ্যে অনেক জাতির আছে। এই শব্দটী যে সম্মানসূচক ও গৌরবাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা নবাবের আমল হইতে প্রচলিত, এই কথা লোকে ধারণা ও বিশ্বাসবশে বলিয়া থাকেন, কিন্তু শব্দটী সংস্কৃতমূলক মন্ত্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আরবী বা পারশী বলিয়া যদি কাহারও জানা থাকে, তবে তাহা বিস্তৃত জানাইতে তাঁহাকে উপরোধ করি।

'চতুর্যোজন পর্য্যন্তমধিকার নৃপস্য চ
যো রাজা বহুত গুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ।'

অতএব দেখা যায়, অধিকার বা কর্ত্তৃত্ব-করণেই উক্ত মণ্ডল উপাধি তখনকার লোকে প্রাপ্ত হইতেন। এখনও প্রবাদ আছে—গ্রামস্থ মণ্ডলো রাজা। 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' ইত্যাদি।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়ের এগারটী পুত্র। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র কবি (ধীত) র সিমলাল গ্রাম। অতএব সিমলাল ইহাদের মূল উপাধি।

গাঁই অনুসারেই উপাধির প্রচলন, যথা—

'বন্দ্যঘাটি গ্রামী' হইতে বন্দ্যোপাধ্যায়; চট্টগ্রামী হইতে চট্টোপাধ্যায়; গাঙ্গুলিগ্রামী হইতে গাঙ্গুলি বা গঙ্গোপাধ্যায়; 'মুখুটীগ্রামী' হইতে

মুখোপাধ্যায়; 'ভট্টগ্রামী' হইতে ভট্টাচার্য্য; বটব্যালগ্রামী হইতে বটব্যাল; কাঞ্জারিগ্রামী হইতে কাঞ্জিলাল; বাপুলীগ্রামী হইতে বাপুলি; পর্কটীগ্রামী হইতে পাকড়াশী ইত্যাদি।

চন্দ্রভূষণের ঘরের প্রাচীন কাগজপত্র দেখিয়া জানা যায়, লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় ইঁহাদের অবস্থা উন্নত ছিল; ক্রমশঃ হীন হইয়া দাঁড়ায়। তৎপরে ইঁহার পিতামহ গদাধর মুরশিদাবাদ সহরে ঘৃতের কারবার করিয়া অবস্থার অনেক উন্নতিসাধন করেন। বর্দ্ধমান রাজসরকার হইতে নিজ গ্রামখানি পত্তনি লয়েন এবং চারিদিকে সম্পত্তি খরিদ করিয়া 'কর্ত্তা' উপাধি লাভ করেন। গদাধর মণ্ডল এ প্রদেশে একজন প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন। তাঁহার দানক্রিয়া ছিল, আর তিনি অতিথি-অভ্যাগতকে গুরুতুল্যজ্ঞানে সেবা করিতেন। তাঁহারা দুই পাঁচদিন গৃহে অবস্থিতি করিলেও সমভাবে তাঁহাদের তুষ্টিসাধন করিতেন।

চন্দ্রভূষণ কবি। ইঁহাকে বাবু বলিয়া সম্বোধন করিলে অসন্তুষ্ট হন। ইনি বাবু শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, বিবিধ প্রকারে যাহার বাব্ (আয় ও ব্যয়) আছে, তিনিই বাবু; কিম্বা বা (চমৎকার) বু খোসবু—সদ্‌গন্ধ আছে, অর্থাৎ যাঁহার নানা কার্য্যে যশোখ্যাতি আছে, তিনিই বাবু। আমার সে সব কিছুই নাই, কেবল একখানা ফর্সা কাপড় আর পিরিহান পরিয়া মিথ্যা বাবু সাজিতে লজ্জা বোধ হয়।

ইনি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'প্রবাদ পদ্ম' নামক চারিখণ্ড গ্রন্থ লিখিয়া ভাষার একটা ভঙ্গ অঙ্গকে সন্ধিত করিয়াছেন। তৎসঙ্গে সুনীতির প্রচারে সুখদায়ক হইয়াছে বলিতে হইবে। পুস্তকের একটু পরিচয় দিতে বড়ই বাসনা হইল। ইহা বঙ্গভাষায় প্রচলিত নৈতিক প্রবাদের গল্প বই। একটী প্রবাদ যথা—

'ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট'। ইহার গল্পশেষ করিয়া পূর্ণ প্রবাদটী লিখিত হইল।—

'ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট,
অন্যের ত আছেই কষ্ট।
পাওয়া যায় দেখ্‌তে পষ্ট,
এতে শুধু পর পুষ্ট।
তাতেই বলি ওহে ভ্রান্ত,
বাদী বিবাদী হও ক্ষান্ত।
নইলে হবে সর্ব্বস্বান্ত,
শুভ হবে হলে শান্ত।

একটী প্রবাদ,—

'তোর পায়ে পড়ি না
তোর কাজের পায় পড়ি।"

ইহার গল্পটী শেষ করিয়া পূর্ণ প্রবাদটী লিখিত হইল, যথা—

সময় ফেরে পড়েছিলাম
শত্রুর হাতে মর্‌তে ;
তাই ত আমি গিয়েছিলাম
তোমার পায়ে ধর্‌তে।
তা' না হলে ওরে অবোধ
তোর পায়ে কি ধরি ?
তোর পায়ে পড়ি না, তোর
কাজের পায় পড়ি !

এমত অনেক দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বাহুল্যভয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

চন্দ্রভূষণ নিজ বাসস্থান রোওা গ্রামের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাও লিখিত হইল। ইহা ইতিহাসের একটা ভাল

শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ শর্ম্মামণ্ডল

অঙ্গ। ইহাদের বাস ছিল নিকটবর্ত্তী শিলা গ্রামে। সেখানে ইহাদের অনেকগুলি জ্ঞাতির বাস। বলা বাহুল্য, তাঁহাদেরও 'মণ্ডল' উপাধি। ইহার পূর্ব্বপুরুষ (তাঁহার নাম জানা যায় না) তথা হইতে এইস্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন ছিল, সেই বন কাটিয়া ২।৫ ঘর সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। তখন চারিদিকে বন ছিল। তাহাতে যেন স্থানটী রোঁদ্ (বেড়া) দেওয়া মত হইল। এজন্য লোকে ঐ স্থানে রোঁদ্ দেওয়া বলিত। ক্রমশঃ ইহার অপভ্রংশ 'রোণ্ডা' নাম দাঁড়াইয়াছে। গ্রামখানির আয়তন এখনও ক্ষুদ্র। ইহার পূর্ব্বে আরও ক্ষুদ্র ছিল। লতা-পাতা-বেষ্টিত ক্ষুদ্র কুঞ্জে ভাগবত পাঠ হইত। সে স্থানে কতই লোকের সমাগম হয়? যতই হউক, তাহার ক্ষুদ্রত্ব ঘুচে না। গবর্ণমেণ্টের সবডিবিসন ম্যাপে এই রোণ্ডা (রোঁদ্ দেওয়া)র নাম সেই হিসাবে বুঝি 'ভাগবতপুর' রাখা হইয়াছে।

বংশ-তালিকা।
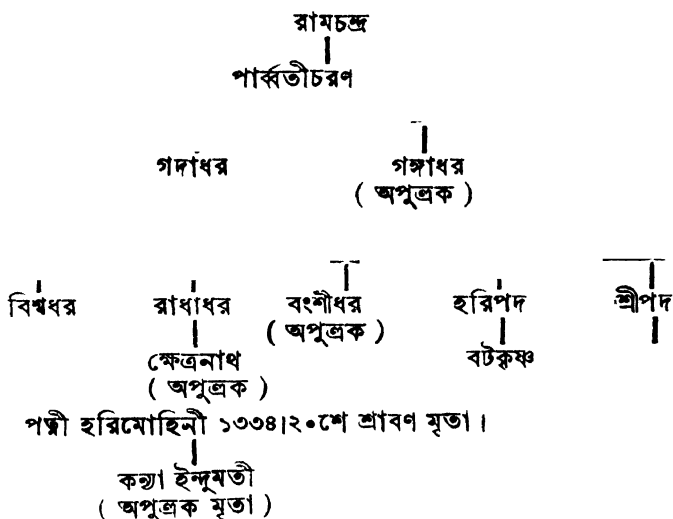
শ্রীবাটীর চন্দ্র-বংশ।

স্বর্গীয় হরিহর চন্দ্র

বংশ-গরিমায়, ধনে, মানে, সদনুষ্ঠানে শ্রীবাটীর চন্দ্রবংশ বঙ্গদেশে সুবিখ্যাত। এরূপ বনিয়াদি ও সদাচারী বংশ গন্ধবণিক জাতির মধ্যে বিরল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম এই বংশের আদি বাসস্থান। মহারাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় যখন সপ্তগ্রাম আক্রান্ত হয়, তখন এই শাণ্ডিল্য গোত্রীয় চন্দ্রবংশের কোন মহাপুরুষ কুলদেবতা শ্রীশ্রীরঘুনাথজীউ ঠাকুর সঙ্গে করিয়া বর্দ্ধমান জেলার কৈথনগ্রামে বসবাস করেন। তথায় মুসলমান অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া স্বর্গীয় শোভারাম চন্দ্র ১১৬০ বঙ্গাব্দে কুলদেবতা ও পুরোহিত-সমভিব্যাহারে কাটোয়া থানার শ্রীবাটী গ্রামে উঠিয়া আসিতে বাধ্য হন। লবণ-ব্যবসায়ে ইঁহারা বড়লোক। উক্ত ব্যবসায় ইঁহাদের একচেটিয়া ছিল।

বাহিরে সারি সারি উন্নত অট্টালিকার সৌন্দর্য্য, ভিতরে তাহার কারুকার্য্য, সুগঠিত মন্দিরসমূহের ও পূজার দালানের শিল্পচাতুর্য্য, চতুষ্পার্শ্বের সমুন্নত তালবৃক্ষশ্রেণী ও বাঁধান ঘাট-সমন্বিত স্বচ্ছ সরোবরগুলি দেখিলে এই স্থানকে বাস্তবিক 'শ্রী'র বাটী বলিয়া বুঝিতে হয়। এই বংশের মহাত্মারা জলকষ্ট-নিবারণ-কারণ বিভিন্ন গ্রামে ও জমিদারীর মধ্যে ন্যূনাধিক ২০০ দুই শত পুষ্করিণী খনন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ, নৈতিক শিক্ষা, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণনিচয়ের কথা, বিদ্যোৎসাহিতা, বদান্যতা, কারবারের বিস্তৃতি, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির কথা, তুলট করিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণ স্বাৎকরণ স্বর্ণ-রৌপ্যরথের ধুমধাম, প্রভৃতির কথা লিপিবদ্ধ করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। কাঙ্গালী বিদায়ের সময় মোটা টাকার মূল তহবিল কোন উচ্চ কর্ম্মচারী

অপলাপ করিলে, এই বংশের মহাপুরুষ রুক্মিণীবল্লভ বলিয়াছিলেন—যাউক্ সে না হয় বড় কাঙ্গালীতেই লইয়াছে। ইহা কম তিতিক্ষার কথা নহে। এই বংশের অনেক রমণী সতীদাহে গিয়াছেন। তাঁহাদের আঁচলা (বস্ত্রখণ্ড) আজ পর্য্যন্ত ইঁহাদের ঘরে সঞ্চিত আছে।

বংশগত সদাচার, সদ্ব্যবহার, সন্নিষ্ঠা, দয়া-দাক্ষিণ্য, পরোপকার-প্রবৃত্তি লইয়া স্বর্গীয় হরিহর চন্দ্র ১২৬৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ৬৫ বৎসর বয়সের সময় সন ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসে সজ্ঞানে ইষ্ট চিন্তা করিতে করিতে গঙ্গাগর্ভে স্বর্গগমন করেন। তাঁহার পিতার নাম কৈলাশনাথ চন্দ্র। তিনি অতি বলবান ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। হরিহরের তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে কৈলাশনাথ চন্দ্র স্বর্গগত হয়েন। হরিহর চন্দ্রের দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র ধনপতি চন্দ্র বিষয়-কর্ম্মে ব্যাপৃত; কনিষ্ঠ সচ্চিদানন্দ বি-এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ পড়িতেছেন। হরিহর চন্দ্র অতিশয় সুশ্রী ও কান্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে সংসার-বিরাগী ও জপতপ-নিরত ছিলেন। এই সময়ে তিনি ভারতের প্রায় সকল প্রধান প্রধান তীর্থ পর্য্যটন করেন। পরে জ্যেষ্ঠদের অনুশাসনে ও মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সংসারী হন। তিনি কীর্ণাহার-নিবাসী ৺কৃষ্ণবল্লভ রায়ের কন্যা শীতলাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। সন ১৩১৬ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। হরিহর চন্দ্র অতিশয় মাতৃপিতৃভক্ত ছিলেন। মাতার আদেশ কখন লঙ্ঘন করেন নাই; পিতৃ-চরণের বাধা প্রতিদিন পূজা করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন। তিনি তীর্থভ্রমণের পর জানি না কিরূপে এক শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরের মুখ দেখিয়া তাঁহার চরিত্র ঠিক বলিয়া দিতেন। তিনি স্বজাতির উন্নতিকল্পে সন ১৩১৭ সালে মাননীয় বি কে পালের সহযোগে গন্ধবণিক জাতিকে সংঘবদ্ধ করাইয়া বৈশ্যাচার গ্রহণ করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও

অর্থব্যয় করিয়াছেন। আজ সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া 'গন্ধকবণিক মহাসম্মিলনী' নাম ধারণ পূর্ব্বক পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি সঙ্গতীপ্রিয়, সুরসিক ও সুকবি ছিলেন। তত্ত্ব ও নীতিবিষয়ক বহু কবিতা লিখিয়াছেন। এখানে তাহার একটু নমুনা দিলাম—

প্রার্থনা।

দাও ভকতি দাও ভকতি
করি এই স্তুতি মিনতি ;
চাই না ধরম চাই না করম,
তাহে নাহি আসক্তি।
চাই না স্বরগ নানা উপভোগ
চাই না প্রভু বিভূতি ;
চাই না মান চাই না জ্ঞান
চাই না প্রভু মুকতি।
লভি দাস্যপদ সেবিতে ও পদ
পাই যেন শকতি।

চন্দ্র-বংশের তালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

স্বর্গীয় হরিহর চন্দ্র

চন্দ্রবংশের তালিকা।

(ঊর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষের নাম দেওয়া গেল)

১। চূড়ামণি চন্দ্র
|
২। রূপচাঁদ চন্দ্র
|
৩। কল্যাণ চন্দ্র
|
৪। লোহারাম চন্দ্র
|
৫। শোভারাম চন্দ্র (শ্রীবাটী আগমন করেন)
|
৬। মুলুকচাঁদ চন্দ্র
|
৭। ভবানীচরণ চন্দ্র
(১১৫৯—১২২২)
|

৮। রাধাবল্লভ (১১৮০-৩৬) | রুক্মিণীবল্লভ (১১৮৩-৬১) | সীতারাম

(১২১০-৫৫) সীতারাম চন্দ্র পত্নী দ্রবময়ী
|
৯। (১২৩১-৭১) কৈলাসনাথ চন্দ্র পত্নী ভবতারিণী
|

গঙ্গা | ভোগবতী | গোবিন্দসুন্দরী | পরমসুখ | আশুতোষ | পরমেশ্বরী
|
১০। (১২৮৬-৩৩) হরিহর চন্দ্র

হরিহর চন্দ্র
(১২৭৬-১৬) শীলতা সুন্দরী (পত্নী)
১১। জ্ঞানদা
প্রমথ
(মৃত)
বিল্ববাসিনী
স্বামী
বিজয়
(মৃত)
ধনপতি
ভোলানাথ দে
প্রমথনাথ সিংহ
রাজরাজেশ্বরী
১২। লক্ষ্মীনারায়ণ (মৃত)
সূর্য্যনারায়ণ
পুষ্পরাণী
সচ্চিদানন্দ
পত্নী উমারাণী
সাবিত্রী
স্বামী জয়কৃষ্ণ দত্ত
সতী
স্বামী রাধাশ্যাম সিংহ
পার্ব্বতী
(মৃত)

সৈয়দ মহম্মদ সয়াতুল্লা।

সৈয়দ মহম্মদ সয়াতুল্লার পূর্ব্বপুরুষ পয়গম্বর ওয়ালিয়ার বংশধর। তিনি বক্তিয়ার খিলিজির সহিত আসামে আগমন করেন। ইসলাম ধর্ম্মের গৌরব প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আসামে আসেন। যখন বক্তিয়ার খিলিজী তিব্বতে যান, তখন ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ আসাম রাজাদের রাজধানী রঙ্গপুরে অবস্থান করিতে থাকেন। রঙ্গপুর এখন শিবসাগর নামে খ্যাত। প্রথমে আসামের হিন্দু ও আহোম রাজারা তাঁহাকে বিশেষ নির্য্যাতন করিতেন; কিন্তু পরে তাঁহাকে আসামের জঙ্গলে নিষ্কর জমি দেওয়া হয়। তদবধি ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা আসামেই অবস্থান করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। সৈয়দ মহম্মদ সয়াতুল্লার পিতার সময় পর্য্যন্ত এই বংশ শিষ্যবর্গের দানের উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন।

সৈয়দ মহম্মদ সয়াতুল্লার পিতা মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ তয়াবুল্লা আসাম উপত্যকার মধ্যে একজন প্রাচ্যভাষাবিদ্‌ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পার্শী ও আরবী ভাষায় তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে গৌহাটি স্কুলের পার্শী ও আরবী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। প্রতি বৎসর তাঁহাকে আসাম উপত্যকার স্কুল-সমূহে ইস্‌লাম ভাষায় কিরূপ শিক্ষাদান হইতেছে তাহা পরিদর্শন করিবার ও সে সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইত।

মৌল্বী সৈয়দ মহম্মদ তয়াবুল্লার চারি পুত্র, তন্মধ্যে সৈয়দ মহম্মদ সয়াতুল্লা মধ্যম। আসাম উপত্যকার সৈয়দ বংশের মধ্যে সৈয়দ মহম্মদ সয়াতুল্লাই সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী শিক্ষা করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে

গৌহাটিতে ইঁহার জন্ম হয়। গৌহাটি হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া ইনি পরে গৌহাটি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯০৫ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি এ ও ১৯০৬ সালে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মসলমানদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে রসায়নশাস্ত্রে এম্-এ পাশ করেন। তৎপর বৎসর রিপণ কলেজ হইতে ইনি বি-এল পাশ করেন।

বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই ইঁহাকে গৌহাটি কটন কলেজের অধ্যাপক-পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আসামীদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে এই পদ প্রাপ্ত হন। ১৯০৯ সালে ইনি অধ্যাপকতা পরিত্যাগ করিয়া গৌহাটিতে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি তথায় ওকালতী করিয়া ১৯২০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত ওকালতী করিবার পর আসাম গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুন্সেফ-পদে নিযুক্ত করেন।

ইতিপূর্ব্বে একবার ইঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহা কলিকাতা গেজেটে ঘোষণাও করা হইয়াছিল; কিন্তু ইনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

বঙ্গ-বিভাগ হইতে একাল পর্য্যন্ত তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভায় আসামের মুসলমানদের প্রতিনিধি-স্বরূপ সভ্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মিঃ মণ্টেগু ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিতে আসিলে ইনি আসাম উপত্যকার মুসলমান প্রতিনিধিদের নেতারূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পর ইনি আর নূতন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী হয়েন নাই। দ্বিতীয় বার নির্ব্বাচনের সময় ইনি কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন এবং আসামে উপস্থিত ছিলেন

না; তাহা সত্ত্বেও ইনি আসাম শাসন-পরিষদের অস্থায়ী সদস্যকে পরাজিত করিয়া সভা নির্ব্বাচিত হন।

মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইবার পর ইনি শিক্ষা, কৃষি ও শিল্প এবং সমবায় -সমিতির উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেছেন। সংস্কৃত ও মাদ্রাসা শিক্ষা-পদ্ধতির ইনি বিশেষ পক্ষপাতী। সেকেণ্ডারী স্কুল সমূহের শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকর্ষ-সাধনের জন্য তিনি একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন। আসাম প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দিবার আইন পাশ করিবার জন্য ইনি একটি আইনের খসড়া রচনা করিতেছেন।

খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আব্দুল লতিফ
বি-এ, বি-এল্, এফ্-আর-ই-এস্।

খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আব্দুল লতিফ প্রসিদ্ধ সাধু প্রথম সৈয়দ সাহজালাল বোখারীর বংশধর। মোগলেরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বোখারা আক্রমণ ও লুণ্ঠনাদি করিলে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। ই-আই রেলওয়ের পানাগড়ের নিকট কাঁকশায় তাঁহার যে সমাধি-মন্দির আছে তাহা আজিও শত শত ভক্ত মুসলমানের নিকট তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। রঙ্গপুর জেলার অন্তঃপাতী মাহিগঞ্জে উক্ত বংশের তৃতীয় শাহ জালাল বোখারীর যে সমাধি-মন্দির আছে তাহাও মুসলমান তীর্থযাত্রীদের নিকট পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। আব্দুল লতিফের অন্য এক পূর্ব্বপুরুষ মোল্লা সৈয়দ হাদী কয়েক খানি আরবী গ্রন্থের লেখক; আরবীয় দর্শন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে তিনি এতদুর প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন যে, ভারতের বহির্ভাগ হইতেও বহু ছাত্র তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য বর্দ্ধমানে আসিতেন। এই বংশ বর্দ্ধমান জেলায় পাঠান ও মোগল সম্রাটদের নিকট হইতে অনেক ইনাম্ সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। আব্দুল লতিফের পিতৃব্য পিতা মীরদাদ আলি বর্দ্ধমানের একজন ধনাঢ্য ভূস্বামী ছিলেন এবং শিক্ষিত লোকদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তিনি বিখ্যাত পার্শী কবি শামসুদ্দীনকে রাখিয়াছিলেন। আব্দুল লতিফের পিতামহ সৈয়দ মহম্মদ মহসীন আরবী ও পার্শী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে তিনি কাজী ছিলেন। তাঁহার পিতামহের ভ্রাতা সৈয়দ আবুল হাসান উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতায় ইউনানী চিকিৎসা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রতাপ

খানবাহাদুর সৈয়দ আবদুল লতিফ

চাঁদের সহিত জঙ্গলে সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। আব্দুল লতিফের অতি বৃদ্ধ প্রমাতামহ সৈয়দ মেহদি হাসান তাঁহার কলিকাতাস্থ বাটী কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে দান করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কলিকাতার মির্জ্জা মেহদি লেন ও মেহদি বাগ আজিও তাঁহার দানের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আব্দুল লতিফের পিতৃব্য খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আউলাদ হাসান প্রথমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরীতে প্রবৃত্ত হন। তিনি ৩০ বৎসরের অধিক কাল রেজিষ্টারী বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন এবং রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের প্রথম ইনস্পেক্টররূপে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা নগরীতে বাস করিতেছেন। তথায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল তাঁহাকে "আধুনিক ঐতিহাসিক" (Modern historian) বলিয়া উল্লেখ করেন।

এই বংশের মধ্যে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ বিষয়ে আব্দুল লতিফ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী আব্দুল লতিফ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শৈশব দশাতেই তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পিতৃব্য খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আউলাদ হাসান তাঁহাকে লালন পালন করেন। ঢাকা মাদ্রাসা ও ঢাকা গবর্ণমেণ্ট কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ক্লাসে তিনি সর্ব্বদাই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। তিনি প্রতি পরীক্ষায়ই বৃত্তি, পারিতোষিক ও পদক পুরস্কার পাইতেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা কলেজ হইতে ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করেন। ১৯০২ সালে তিনি প্রথমে শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৯০৪ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বাখরগঞ্জ, ঢাকা,

খুলনা ও কলিকাতার আদালতে কাজ করিয়াছেন। একাদশ বৎসরের অধিককাল তিনি বাখরগঞ্জে কাটাইয়াছিলেন; তথায় সুবিচার ও সুশাসনের জন্য এখনও তাঁহার নাম লোক-মুখে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তথায় তিনি কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তন্মধ্যে (১) লতিফ মিউনিসিপ্যাল সেমিনারী (পটুয়াখালির হাইস্কুল); (২) লতিফ মধ্য মাদ্রাসা; (৩) তুষখালীতে একটি জুনিয়ার স্কুল; বরিশাল ও পটুয়াখালীতে তিনি সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি পটুয়াখালীতে ডাকাতি বন্ধ করিয়া সরকারকে অশান্তির হাত হইতে রক্ষা করেন। গত জার্ম্মান যুদ্ধের সময় তিনি সৈন্য সরবরাহ করিয়া এবং সেই সঙ্গে দেশবাসীর বিশ্বাস অর্জ্জন করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হন। বাখরগঞ্জের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন :—

"I am desired by the Chief Secretary to convey the thanks of Government for your loyal co-operation in making the present international situation clear to your co-religionists. I, as a representative of Government in Backergunge, am glad to think that I can rely upon your advice and assistance in all matters affecting the Mohamedan community."

অর্থাৎ বাখরগঞ্জে আমি গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ আছি বলিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী আপনাকে গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। আপনি এই যুদ্ধের সময় আপনার স্বধর্ম্মীদিগকে যে ভাবে গবর্ণমেণ্টের অনুকূল করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইতেছে। মুসলমান

সমাজের কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে আমি আপনার পরামর্শ পাই, ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

গত যুদ্ধের সময় তিনি যে সুকার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা ভারতের প্রধান সেনাপতি-প্রেরিত সংবাদে ১৯১৯ সালের ২৮শে জুলাই তারিখের লণ্ডন গেজেটে প্রকাশিত বিবরণে স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯১৭ সালে রাজনৈতিক মামলার আসামীদের বিচারার্থ যে বিশেষ আদালত (Special tribunal) গঠিত হইয়াছিল তিনি তাহার কমিশনার হইয়াছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯২১ সালে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। অবকাশকালে তিনি সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া থাকেন। ইংরাজী ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, স্থাপত্য, আইন ও শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থাদি তিনি পাঠ করেন। তৎপ্রণীত "Influence of the French Revolution on English Poetry" পুস্তকখানি এরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, তাহা ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান লেখকদের পর্য্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ১৯০৭-০৮ সালের মধ্যে তিনি শিক্ষাবিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেগুলি শিক্ষা-বিভাগীয় লোকের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। তিনি বাখরগঞ্জের চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা "Dacca Review"তে প্রকাশিত হইয়াছে। "Land Tenures in Bengal" ও "Elements of Mohamedan Law" নামক দুইখানি আইনের গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন। তিনি ১৯২৪ সালে ভারতের ধান ও চাউল রপ্তানী সম্বন্ধে "Economic Aspect of the Indian Rice Export Trade" নামক গবেষণাপূর্ণ একখানি পুস্তক লিখিয়া দেশের লোকের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। ইহা বিলাতে সমাদৃত হইলে

তিনি Royal Economic Societyর Fellow নিযুক্ত হন। তিনি বাঙ্গালার এসিয়াটিক্ সোসাইটীর একজন সদস্য। ১৯১১ সালে তিনি করোনেসন দরবার-পদক পুরস্কার পান। ১৯১৫ সালে তিনি "খাঁ সাহেব" ও ১৯১৮ সালে "খাঁ বাহাদুর" উপাধি পান। ১৯২৭ সালে পটুয়াখালিতে মসজিদের সমক্ষে বাজনা লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিরোধ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে নিরপেক্ষ-জ্ঞানে পুনরায় পটুয়াখালীর মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ করিয়া পাঠান।

মাননীয় বিচারপতি রায় শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, এম্-এ, বি-এল।

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত গাঙ্গাটীয়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে ১৭৭৭ শকের ২২শে পৌষ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। গাঙ্গাটীয়ার চক্রবর্ত্তী বংশের আদিনিবাস ২৪ পরগণা জিলার নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়ায় ছিল। তথা হইতে কালক্রমে তাঁহারা ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণার মধ্যে একস্থানে স্বীয় পূর্ব্বনিবাসের নামে ভাটাপাড়া গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় বসতি করেন। অতঃপর এই বংশের অন্যতম কৃতিপুরুষ রাঘবেন্দ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন-মানসে উক্ত কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত হরিশচন্দ্রপটী-নিবাসী তৎকালীন বিখ্যাত নৈয়ায়িক জীবানন্দ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের আবাসে বিদ্যার্থীরূপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় পাঠ-সমাপনান্তে আচার্য্য জীবানন্দের কন্যা ৺ গঙ্গা-দেবীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক বসতি করেন ও বংশ-পরম্পরায় অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে নিরত থাকেন। অতঃপর সেই বংশের অন্যতম পুরুষ দ্বারকানাথের প্রপিতামহ রামানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত হরিশ্চন্দ্রপটীর পার্শ্ববর্ত্তী গাঙ্গাটীয়া গ্রামে নিজ আবাস স্থাপন করেন। ৺ রামানন্দ চক্রবর্ত্তী একজন শিবভক্ত পরম ধার্ম্মিক মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি স্বগ্রামে ধর্ম্মাদি চর্চ্চায় ও শিবের আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন। ৺ রামানন্দ চক্রবর্ত্তীর উপযুক্ত সন্তান ৺ কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী পিতার ন্যায় অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ চিলেন। এই বংশের মধ্যে তিনিই প্রথম ময়মনসিংহ সদরে ওকালতী কার্য্যে

ব্রতী হন এবং কালক্রমে তত্রত্য ব্যবহারোপজীবিবর্গের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। অর্থের মোহময় মদিরায় কিছুমাত্র অভিভূত না হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ কালীকিশোর ধর্ম্মজীবন-যাপন অভিপ্রায়ে যৌবনের অন্তে প্রৌঢ়ের প্রারম্ভেই কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর-পূজন-মানসে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতা দক্ষিণা কালিকা দেবীর একজন একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। তখনকার দিনে যাতায়তের সুবিধা না থাকায় তীর্থাদি দর্শনে যাত্রা করা একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। অনেকে তীর্থাদি দর্শনে বাহির হইলে মহাযাত্রা করিয়া বাহির হইত, কারণ গৃহে প্রত্যাগমনের আশা খুব অল্পই ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ কালীকিশোর আত্মীয়-স্বজনের বহু বাধা বিপত্তি সত্বেও সঙ্কল্পচ্যুত না হইয়া স্বীয় জননী সহ ৺কাশীধামে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন এবং তথা হইতে বিশ্বনাথের কৃপায় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ৺শ্রীশ্রীজগন্মাতা দক্ষিণা কালিকা দেবীকে স্বীয় আরাধ্যা মাতা অন্নপূর্ণা দেবীর নামে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বিভূতি-দর্শনে লোকে তাঁহাকে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিত। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেবায় ও ধ্যানে তৎপর থাকিয়া ৫৩ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

পাঠ্যাবস্থা।

দ্বারকানাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। দ্বারকানাথ শৈশবে ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং উক্ত স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ পূর্ব্বক স্থানীয় জিলা স্কুলে প্রবেশ করেন।

ময়মনসিংহে শিক্ষা সমাপনপূর্ব্বক দ্বারকানাথ কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। তথা হইতে তিনি ক্রমান্বয়ে

রায় শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তি বাহাদুর।

এল-এ, বি-এ, ও এম-এ পরীক্ষা পাশ করেন। এণ্ট্রান্স, এল-এ, ও বি-এ পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পান। তিনি অতীব সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষা পাশ করিয়া তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রায়ন স্কলারশিপ নামক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানে তিনি এম-এ পাশ করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তদানীন্তন বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু ওকালতি করিতে কৃতসঙ্কল্প দ্বারকানাথ তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হন।

কর্ম্ম-জীবন।

তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি ও প্রতিভা ছাত্রজীবনের ন্যায় তাঁহার কর্ম্মজীবনকেও মহিমান্বিত করিয়াছিল, ব্যবসায়িক কর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, তৎসহ মধুর ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে কলিকাতার জন-সমাজের অঙ্গীরূপে পরিণত করিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের অমূল্য অবসরটুকুও তিনি দেহ-ধর্ম্ম রক্ষার্থে ব্যয় না করিয়া বাণীর সেবায় নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার বৃহৎ পুস্তকাগার অমূল্য পুস্তকরাজিতে শোভিত। দরিদ্র ছাত্রবৃন্দের জন্য তিনি নিজ বাটীতে একটা ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক বহু দরিদ্র ছাত্রকে অন্ন ও বিদ্যাদানে কৃতার্থ করেন। দরিদ্রনরনারায়ণদিগকে অন্ন দান করিতেও তিনি মুক্তহস্ত। অতিথি-অভ্যাগত বা দরিদ্র ও নিঃস্ব ক্ষুধার্ত্তেরা তাঁহার বাটীতে আসিলে কখন সন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যাগমন করে নাই। সার্থক পিতা কালীকিশোর ৺শ্রীশ্রীজগন্মাতা অন্নপূর্ণা দেবীকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঘরে গৃহিণী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপেই বিরাজমানা, অন্নদানে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার সর্ব্বদাই অবারিত।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হন ও উক্ত পদে স্থায়ী সভ্যরূপে তিনি এখনও বর্ত্তমান। তদানীন্তন বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুর তাঁহাকে বঙ্গীয় কৃষি-সভার অন্যতম সভ্যপদে মনোনীত করেন। তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের "এসিয়াটিক সোসাইটী"র একজন সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ সোসাইটীর সভ্যরূপে পরিগণিত হন। পশ্চিম বঙ্গের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে গৃহীত হন। তিনি ময়মনসংহবাসী সর্ব্বসাধারণের এত অধিক প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন যে, তাঁহারা তাঁহাকে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির পদে বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে অন্যান্য সভ্যদের সহিত একমত হইতে না পারায় তিনি উক্ত সম্মান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী মাননীয় বৃটিশ রাজ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৩১ মার্চ্চ তাঁহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি উক্তপদে নিযুক্ত হইয়া অতীব যশের সহিত কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। বিচারকার্য্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও নীতিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য রাজকীয় ও অ-রাজকীয় সর্ব্বসাধারণকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছে। তাঁহার কার্য্যপ্রণালীতে সকলেই আপ্যায়িত ও মুগ্ধ।

বিচারাসনে বাদী প্রতিবাদী কেহই অসন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করে না। সকলেই তাঁহার সুবিচারের প্রশংসা করেন। বিচারকার্য্যে তাঁহার যশোরাশি ইতিমধ্যেই দিগন্তবিস্তৃত হইয়াছে। তিনি ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হাইকোর্টের বিচারাসনে আরোহণ করিলেন। হাই-কোর্টের নিয়মানুসারে ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমের পর কেহ উক্ত আসন

অলঙ্কৃত করিতে পারেন নাই। গুণগ্রাহী বৃটিশ রাজ তাঁহাকেই এই প্রথম অধিক বয়সে উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

গার্হস্থ্য জীবন

গার্হস্থ্য. জীবনে দ্বারকানাথ একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। সর্ব্বদা সমাজ-হিতে রত। রাজনীতি কখনও তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই।

সমাজের বরেণ্য কতিপয় ব্রাহ্মণের সাহায্যে তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের কৃষিবল সংগঠনে ও অন্যান্য দেশ-হিতকর কার্য্যেই তাঁহার সমধিক উৎসাহ ও আগ্রহ। তাঁহার পুত্রগণের নাম ১। শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী B. A. B. L. Advocate, High Court. ২। শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী B. A. ৩। শ্রীমান আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ৪। শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী।

সমাজ ও দেশহিতব্রতে দ্বারকানাথ

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দ্বারকানাথ পিতা কালীকিশোরের উপযুক্ত সন্তান. তিনি নিজব্যয়ে তাঁহার পৈত্রিক বসতবাটীতে স্বীয় পিতা ও পরমারাধ্যা জননী ৺ রাজরাজেশ্বরী দেবীর নামে এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রোশ চতুষ্টয়-ব্যাপী সর্ব্বসাধারণের এক মহান অভাব দূরীভূত করিয়াছেন।

প্রপিতামহ ৺ রামানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামে মহকুমায় একটী ইংরাজী হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্রত্য ছাত্রবৃন্দের একটি মহান্ অভাব মোচন করিয়াছেন। ৺কাশীধামে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে ত্রিলোচন-ঘাটের পার্শ্ববর্ত্তী গোলাঘাটের তীরে "দ্বারকাপুরী" নামে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক "পূর্ণেশ্বর" "রামরাজেশ্বর" "দ্বারকপ্রসন্নেশ্বর" নামক তিনটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐগুলির নিত্য পূজা ও অতিথি-অভ্যাগতের নিত্য-সেবার বিধান করিয়াছেন।

৺ কাশীধামস্থ দুঃস্থ ব্রাহ্মণসন্তানদিগকে বিনামূল্যে শাস্ত্রজ্ঞান বিতরণের জন্য তিনি বাঙ্গালীটোলায় "দ্বারকা-চতুষ্পাঠী" নামক একটী টোল স্থাপনপূর্ব্বক একজন সর্ব্বগুণান্বিত নৈষ্ঠিক অধ্যাপককে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া "কীর্ত্তি যস্য স জীবতি" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

দ্বারকানাথ প্রকৃতই দানবীর। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। কোনও সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহারা কেবল দানমাত্রেই আপ্যায়িত হইয়া যান না, পরন্তু তাঁহার সহিত তাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী শাস্ত্রীয় ও ধর্ম্মবিষয়ক আলাপ-আলোচনায় অসীম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে তিনি অতিশয় ভালবাসেন।

তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার মানসে তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গদেশস্থ যাবতীয় টোলের অধ্যাপক-মণ্ডলীর বাৎসরিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। দ্বারকানাথের পাণ্ডিত্যে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া নবদ্বীপাধিবাসী পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাকে তাঁহাদের সভাপতির পদে বরণ করিয়াছেন। দ্বারকানাথ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও তাঁহার কুলাচার কখনও ত্যাগ করেন নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নিয়মিত কর্ত্তব্যগুলি তিনি কখনও অবহেলা করেন না। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের সমস্ত লক্ষণই তাঁহাতে বর্ত্তমান। কর্ম্মজীবনের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি রজঃ বা তমঃ গুণের দ্বারা অধিকৃত হন নাই। বৃহৎ সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত তাঁহাকে কখনও বিচলিত করিতে পারে নাই। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তাঁহার সমভাব—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বভূতেষু যোঽহপশ্যতি অর্জ্জুনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরসংমত॥"—গীতা।

স্বর্গীয় নিমাইচরণ বসু

স্বর্গীয় নিমাইচন্দ্র বসু

এই বসুবংশের আদিনিবাস পানিহাটী ২৪ পরগণা। সেথায় বার মাসে তের পার্ব্বণ, ক্রিয়া-কলাপ সকলই মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড হইতে গঙ্গাতীরস্থ তাঁহাদের বিশাল ভবনে যাইবার রাস্তা হলধর বসু রোড নামে প্রসিদ্ধ। হলধর বসু নিমাইচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের কনিষ্ঠ।

নিমাইচন্দ্রের পিতামহের নাম মদনমোহন বসু। মদনমোহন ব্যবসায়ী ছিলেন। মদনমোহনের পুত্রগণের নাম—পঞ্চানন, হলধর, নবীন, যাদব ও পূর্ণ। হলধর আমেরিকায় একটী কারবার খুলিয়াছিলেন।

নিমাইচন্দ্রের পিতা নবীন ব্যবসায়ী ও মুৎসুদ্দী ছিলেন। নবীনের পুত্রগণের নাম—নিমাই, উদয়, প্রতাপ, অতুল, অমর ও অবিনাশ।

নিমাই বসু ১৮৪৬ খৃঃ ২৮শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু স্কুলের ছাত্র; পানিহাটির বাটী হইতে নিমাইচন্দ্র প্রত্যহ হিন্দু স্কুলে যাতায়ত করিতেন। ১৮৬২ খৃঃ তিনি বৃত্তি লইয়া উক্ত স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৮ খ্রীঃ তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। পরে ঘোষ এণ্ড বসুর নিকট আর্টিকেল ক্লাক হন এবং পাঁচ বৎসর পরে স্বয়ং সলিসিটর হন।

তিনি প্রতিদিন ঠিক বেলা ১০টার সময় আপনার আফিসে উপস্থিত হইতেন এবং চেম্বারের কার্য্য করিতেন; কোন দিনই তাঁহার জীবনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। সলিসিটার হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনন্যসাধারণ হইয়াছিল। কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে বিচারপতিগণ প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার মত গ্রহণ করিতেন। এক সময়ে তাঁহার পক্ষের কৌন্সলী উপস্থিত না হইতে পারায় বিচারপতিগণ

তাঁহাকে তাঁহার মক্কেলের পক্ষে সওয়াল জবাব করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এটর্ণিগিরি ব্যবসায় হইলেও নিরবচ্ছিন্ন ব্যবসায়-হিসাবেই তিনি এটর্ণিগিরি করিতেন না; একার্য্যে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল।

তিনি কিছুকাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনার ছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন যে, যতদিন নাগরিকগণ নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা না পায় এবং নাগরিকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ না করে, ততদিন তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করা বিড়ম্বনামাত্র, এই বুঝিয়া তিনি কমিশনার-পদ পরিত্যাগ করেন এবং সাধ্যানুরূপ জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় ভয়ানক প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, একথা অনেকেরই স্মৃতিপথে জাগরূক আছে। দলে দলে সহরবাসী প্রাণভয়ে সহর ত্যাগ করিয়া পলাইতে থাকে। রোগ অপেক্ষা Segregation Camp অধিক আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই আতঙ্কের সময় নিমাইবাবু গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া প্লেগাক্রান্ত রোগীদিগের জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে একটি করিয়া স্বতন্ত্র ঘর রাখিবার ব্যবস্থা করেন; তাহার ফলে যাহারা সহর ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিতে সাহসী হয় এবং অনেকে ফিরিয়া আসে।

স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারিগণের সহিত নিমাইবাবু প্রত্যেক প্লেগাক্রান্ত বাড়ী পরীক্ষা করিরা রোগীর স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা করিতেন। এই কার্য্য বহুদিন যাবৎ তিনি অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিয়া সম্পন্ন করেন। তাঁহার বয়সে অহোরাত্র এ প্রকার পরিশ্রম করা অল্প কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচায়ক নহে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল।

তাঁহার বাটীর পার্শ্বস্থ লেনটী তাঁহারই নাম বহন করিতেছে; এই লেনটী তাঁহারই প্রদত্ত জমির উপর দিয়াই গিয়াছে; তিনি যখন মিউ-

নিসিপাল কমিশনার, সেই সময়ই এই জমি সাধারণের হিতার্থে তিনি মিউনিসিপালিটীকে দান করিয়াছিলেন।

লর্ড রিপণকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য মিঃ ডব্লিউ সি বনার্জ্জি ও আর ডি মেটা প্রভৃতিকে লইয়া যে কমিটি গঠিত হয়, নিমাই বাবু সেই কমিটীর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন,কিন্তু অর্থের সদ্ব্যয় করিতে কোন দিন বিরত ছিলেন না। জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ ও আনন্দ বিতরণ তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল।

তাঁহার বাগমারির বাগান এক সময়ে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণের মিলনক্ষেত্র ছিল। এই সুন্দর সুসজ্জিত উদ্যান-বাটিকাতে প্রতি সপ্তাহে বহু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের সমাগম হইত এবং পরিপূর্ণ আনন্দের প্রবাহ বহিয়া যাইত। পরে যখন তাঁহার পুত্রগণ বড় হইলেন নিমাইবাবু তখন বাগমারি ত্যাগ করিয়া দারজিলিংএ নূতন বাগমারি সৃষ্টি করিয়া প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যের কাল তথায় অতিবাহিত করিতেন, দার্জ্জিলিংয়ের বাগমারি তথাকার দ্রষ্টব্য স্থানের অন্যতম, এমন সুসজ্জিত রম্য হর্ম্ম্য দার্জ্জিলিঙ্গে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সুদৃশ্য বিশাল গৃহের অধিকারী নিমাইবাবু দার্জ্জিলিং-জীবনের একটি institutionএ পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার আতিথ্য মনোহর দারর্জ্জিলিংকে আরও মনোহারী করিয়া রাখিয়াছিল। নিমাইবাবু ও দার্জ্জিলিং দুইটী অভিন্ন—এই ভাব নিমাইবাবুর বহু বন্ধুজনের কল্পনায় দৃঢ়বদ্ধ ছিল, এখন নিমাইবাবু নাই, তাঁহাদের সে দার্জ্জিলিংও নাই, ইহাই মনে হইতেছে।

তাঁহার অতিথি-বাৎসল্য এক অপূর্ব্ব পদার্থ ছিল। উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে সকলেই, কুচবিহারের মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া একজন সামান্য অতিথি পর্য্যন্ত, তাঁহার বাগমারিতে যথোচিত সমাদর

লাভ করিতেন তাঁহার বিশাল সহৃদয়তার বেষ্টনের মধ্যে সকলকারই স্থান ছিল।

পরিচারক-পরিচারিকা পর্য্যন্ত কোন দিন তাঁহার মুখে রূঢ় কথা শুনে নাই। সমব্যবসায়ী জুনিয়রগণ তাঁহার নিকট সমধিক উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করিত। এটর্ণী স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ জে সি দত্ত ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার আর্টিকেল ক্লার্ক ছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে তাঁহার নিকট আর্টিকেল ক্লার্ক ছিলেন।

তাঁহার মত স্বজন-বৎসলও এ যুগে বিরল। তিনি একটা বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন। একশতাধিক আত্মীয়স্বজন লইয়া একই পরিবার মধ্যে সুদীর্ঘ কাল শান্তিতে বাস করার দৃষ্টান্ত এই কলিকাতা সহরে নিমাইবাবুর বাটীতেই দেখা যাইত। আজও তাঁহার পরিবার মধ্যে এই একান্নবর্ত্তী পারিবারিক নিয়ম অব্যাহতভাবে চলিতেছে। তাঁহার প্রিয় শিষ্য ভূপেন্দ্রনাথ বসু এই বিষয়ে নিমাই-বাবুর আদর্শ স্বীয় পরিবার মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

নিমাইবাবুর বিশাল পরিবারের পাকশালায় প্রতিদিন দুই মণ চাউল সিদ্ধ হইত এবং তাহার আনুসঙ্গিক ব্যয় তিনি চিরদিন স্বয়ং বহন করিয়াছেন। কোন এক সময়ে তাঁহার বর্দ্ধমান পরিবারবর্গের পুরাতন বসতবাটীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি সঙ্কল্প করেন, রাস্তার পরপারে একটা নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিবেন; সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহার অধিক সময় লাগিত না; জমী সংগ্রহ, উপকরণ সংগ্রহ সবই হইয়া গিয়াছে, এমন সময় তাঁহার এক ভ্রাতা আসিয়া দাদাকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি বাড়ী ছাড়িয়া যেন না যান, ভ্রাতৃবৎসল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। পুরাতন বাটীকে আরও বর্দ্ধিত করিলেন। তাহার ফলে এখনকার ২৮ নয়ানচাঁদ
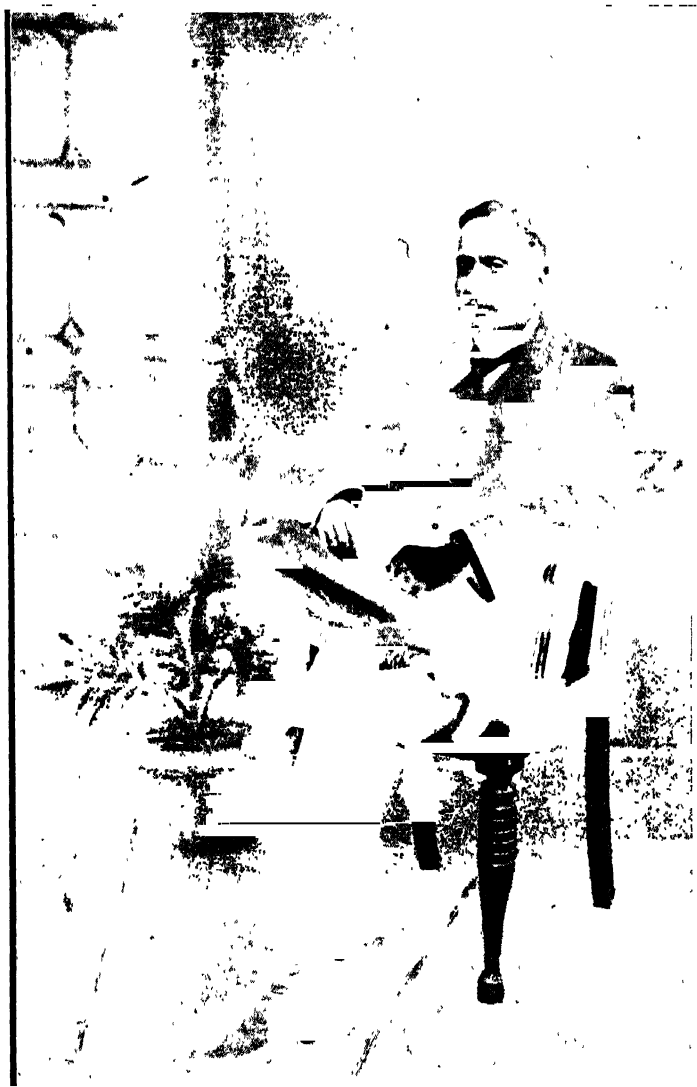
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু।

দত্তের গলির বাটী চতুর্গুণ বড় হইয়াছে এবং প্রভূত টাকা তাঁহার ব্যয় হইয়াছে।

কোন এক আত্মীয়ের বসবাসের জন্য একটী বাটী ৬০০০৲ টাকা খরচ করিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। আত্মীয় সপরিবার তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে উক্ত আত্মীয়ের মৃত্যু হইল ; তাঁহার বংশধরগণ বাড়ীখানি তাঁহাদের নামে লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলে বিনা বাক্যব্যয়ে নিমাইবাবু তাহাই করিলেন ; বলিলেন, "উহাদেরই বাসের জন্য বাড়ী কিনিয়াছিলাম, বাড়ীখানা উহাদেরই হউক।" এ সকল বিষয় অনন্যসাধারণ সহৃদয়তারই পরিচয়।

এত বড় মানুষটা এমন সরল, এত সহজে অধিগম্য, এমন প্রসন্ন-চিত্ত, এত সরল, যে তাঁহার সহিত একবার কথা কহিয়াছে সেই বুঝিতে পারিয়াছে। তার পর অগাধ অর্থের অধিকারীর নিকট এ সরলতা ও প্রসন্নচিত্ততা সহজে কেহ প্রত্যাশা করে না ; সুতরাং দূর হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যে কল্পনা লইয়া মানুষ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত, তাঁহার সেই সরলতা ও সরসতা তাহাকে বিমুগ্ধ না করিয়া পারিত না। নিমাইচরণের ন্যায় মাতৃভক্ত অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি হিন্দুসমাজের সকল প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না ; কিন্তু এই মাতৃভক্তি প্রণোদিত হইয়া তিনি মাতৃশ্রাদ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া অতিশয় সমারোহ-সহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

মহাসমারোহ সহকারে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাই তাঁহার মাতৃভক্তির পরিচয় নহে। প্রত্যহ কোর্ট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সান্ধ্যভোজনের পূর্ব্বে তিনি মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ; শিশুর ন্যায় মাতৃক্রোড়ে মাথা রাখিয়া মাতার সহিত প্রতিদিনের ঘটনার আলোচনা করিতেন, সে চিত্র অতি সরল, সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী। ডিনার খাইয়া আর মাতার কক্ষে প্রবেশ করিতেন না, পাছে মাতার নিষ্ঠায় আঘাত লাগে। মাতা

যখন তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতেন, নিমাইবাবুর কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি যে অবস্থায় থাকিতেন সেই অবস্থায় আসিয়া মাতার শোকাশ্রু মুছিয়া দিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেন।

তিনি এক সময়ে একটি বড় মোকদ্দমায় রেঙ্গুন গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে কতকগুলি বর্ম্মা পনি কিনিয়া আনিয়াছিলেন। পৌঁছিবামাত্র মাতাকে দেখান হইল. যেটী মাতার পছন্দ হইল, সেটী মাতার গঙ্গাস্নানে যাইবার গাড়ির জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল।

নিমাই বসু orthodox ছিলেন না। সাহেব ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার মত আহারে বিহারে সাহেবী বাঙ্গালী কেহ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তিনি বাহ্যিক ব্যাপারেই সাহেবী ভাবাপন্ন ছিলেন না, যে সব গুণে সাহেব সাহেব, সে সকল সদ্‌গুণ তাঁহার চরিত্রে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার জীবনের motto ছিল Now or Never। Now or never এই কার্য্যতৎপরতা ও কর্ত্তব্যানুরাগ তাঁহার জীবনের প্রত্যেক সামান্য কার্য্যেও ফুটিয়া উঠিত। তিনি যেদিন যাহা করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন, সময়, পরিশ্রম, অর্থব্যয় কিছুতেই তাঁহাকে সে সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতে পারে নাই। তথাকথিত সাহেবীয়ানার লক্ষণ সুরা-সেবন কিন্তু তাঁহার সাহেবীয়ানায় সুরার স্থান ছিল না, তিনি কখনও সুরা স্পর্শ করেন নাই—তিনি ছিলেন teeto-taller

১৯২৬ খৃঃ ১৫ই জুন তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য হাইকোর্টের সমস্ত বিচারপতি সমবেত হন। ঐ সভায় প্রধান বিচারপতি বলেন—

Mr. Bose was undoubtedly a man of whom the profession was entitled to be proud. They naturally desire to express in public their sense of the loss which they

শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী বসু বাহাদুর

have sustained. In the case of Mr. Bose our feelings of regret cannot fail to be tempered by the knowledge that during his life he established for himself a reputation for ability and integrity in a profession in which he practised for 50 years, that he lived to a great age and that he was able to obtain from life, interests and pleasures in matters outside his profession in a manner and to an extent which do not ordinarily fall to the lot of men. In conclusion, my learned brothers and I join with you in your expressio n of regret and of sympathy with the members of Mr. Bose's family.

নিমাইবাবুর চারি পুত্র হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র ও তৃতীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বসু। মধ্যম বিজয় চন্দ্র ও কনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র গতাসু হইয়াছিলেন।

অক্ষয়বাবু কলিকাতা হাইকোর্টের একজন সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণি; নিমাই বাবুর প্রতিষ্ঠিত অফিসের এখন তিনিই কর্ণধার। বিপিনবাবু জেনারেল পোষ্ট অফিসের প্রধান ধনাধ্যক্ষ। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় পরিতুষ্ট হইয়া ১৯১৯ খৃঃ রায় সাহেব ও ১৯২৬ সালে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর পুত্রগণের নাম সুধীর, শ্রীশ, সুবোধ সুশীল ও সনৎ। বিপিনবাবুর দুই পুত্র—ভূপেনচন্দ্র ও শিবচন্দ্র।

ডাঃ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চক্ষুরোগের চিকিৎসক ডাঃ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত তেলিনীপাড়া গ্রামে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী শান্তিপুর গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পিতার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রামলোচন মুখোপাধ্যায় তেলিনীপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। তাহার পর হইতে ৺রামলোচনের বংশধরগণ উল্লিখিত তেলিনীপাড়ায় বাস করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের কুলজী এই প্রবন্ধের শেষে লিখিত হইল। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের পিতা হরিপদ মুখোপাধ্যায় অতি অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন। কোন আত্মীয়ের নিকট কোনরূপ সাহায্য না পাওয়ায় তিনি আপন যত্ন ও চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিতে থাকেন। কিছুদিন পরে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শ্বশুরমহাশয় বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার শ্বশুরমহাশয় কয়েক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে সুশীলকুমারের জন্ম হয়। এই সময়ে হরিপদ কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, আর অধিক দূর পাঠ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। তিনি গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি পাইতেছিলেন। এই বৃত্তি না পাইলে তাঁহার পড়াশুনার এইখানেই পরিসমাপ্তি হইত। তিনি এই বৃত্তি ও প্রাইভেট টিউসনির উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে লেখাপড়া ও সংসার চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি হুগলীর দায়রা জজ ও সবজজ আদালতে ওকালতী করিতে থাকেন। সেই সময়ে স্বগ্রামে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি স্থানীয়

ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ও ভাইস্ চেয়ারম্যান, ডিস্পেনসারী কমিটীর মেম্বর এবং তত্রত্য তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নিযুক্ত হন। হরিপদ বাবু এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়া বাটীতে আসিয়া বসিয়াছেন।

সুশীলকুমার বাল্যাবস্থায় গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি পরে স্থানীয় তেলিনীপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন; তথা হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ও হুগলী কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। মেডিকেল কলেজে পাঠকালে তিনি গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি এবং কোন বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য অনার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে একটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুশীলকুমার যখন মেডিকেল কলেজে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়েন, সেই বৎসর যেসকল ছাত্র অপথালমলজি (Opthalmology and Opthalmic Surgery) ও অপথালমিক অস্ত্রবিদ্যায় অনার্স পরীক্ষা দেন, তাহাতে সুশীলকুমার প্রথম হইয়া সুবর্ণ পদক পারিতোষিক লাভ করেন। মেডিকেল কলেজ হইতে বাহির হইয়া সুশীলকুমার প্রথমতঃ উক্ত কলেজের আউট-ডোর ডিস্পেন্সারীতে হাউস সার্জ্জনের কার্য্য করেন। এই পদে ছয়মাস কার্য্য করিবার পর তিনি উক্ত কলেজের চক্ষুবিভাগে জুনিয়র হাউস্ সার্জ্জন নিযুক্ত হন। এই বিভাগেও ছয় মাস কার্য্য করিবার পর মেও হাসপাতালে হাউস সার্জ্জনের কার্য্য পান। এখানে কিছুদিন কাজ করিবার পর আবার তাঁহাকে মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগে হাউস্ সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত করা হয়। কলেজের নিয়মানুসারে এই পদের স্থিতিকাল এক বৎসর মাত্র। এই এক বৎসরকাল শেষ হইলে তিনি আর চাকুরীর জন্য চেষ্টা না করিয়া স্বাধীনভাবে কলিকাতায় চক্ষুরোগের চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে কলিকাতার নবনির্ম্মিত কার-

মাইকেল মেডিকেল কলেজে চক্ষুর অস্ত্রচিকিৎসক প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়, আজিও তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

এই সময়ে বিলাত যাইয়া চক্ষুরোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল বাসনার সঞ্চার হয়। তদনুসারে তিনি ১৯১৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর বিলাত যাত্রা করেন। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে তথায় পৌছিয়া এডিনবার্গ সহরে যান এবং পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসে "এল আর সি এস্" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তদনন্তর এডিনবার্গ হইতে লণ্ডনে আসেন। এখানে আসিয়া তথাকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চক্ষুরোগ চিকিৎসার হাসপাতালে (Moor Field Eye Hospital) প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য শিখিতে থাকেন। এই সময়ে হাসপাতালের কার্য্য শেষ করিয়া প্রত্যহই ট্রেণে অক্সফোর্ডে গিয়া অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটীর ডি ও ক্লাসের লেক্‌চার শুনিতে থাকেন। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে ডাঃ মুখোপাধ্যায় ডি ও পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। ডি ও পরীক্ষা যুক্ত রাজ্যের চক্ষুরোগ-চিকিৎসার সর্ব্বপ্রধান পরীক্ষা। ঠিক ঐ সময়ে লণ্ডনের রয়াল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্‌স্ ও সার্জ্জন্‌সে চক্ষুরোগ সম্বন্ধে ডি ও এম্ এস্ নামক একটি নূতন পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি ঐ পরীক্ষায়ও যশের সহিত উত্তীর্ণ হন। ইহার পর সুশীলকুমার পুনরায় এডিনবরায় যান এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "এফ আর সি এস" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া ১৯২১ সালের ৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় আসিয়া পৌছেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৩নং বীডন ষ্ট্রীটে তাঁহার চেম্বার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে কারমাইকেল কলেজে আউট-ডোরে যান এবং বেলা ১২টা—৮টা পর্য্যন্ত নিজ চেম্বারে রোগী দেখেন।

তাহার চেম্বারে নেপাল, যুক্ত প্রদেশ, আসাম, বেহার, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি নানাস্থান হইতে রোগী আসিয়া থাকে।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় এক্ষণে যে যে কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) বেঙ্গল কাউনসিল অব মেডিকেল রেজিষ্ট্রেশনের নির্ব্বাচিত সদস্য।

(২) ষ্টেট মেডিকাল ফ্যাকালটীর গবর্ণমেণ্ট-মনোনীত সদস্য।

(৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ এম্-বি পরীক্ষায় সার্জ্জারির পরীক্ষক।

(৪) কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের সম্পাদক।

(৫) রয়াল সোসাইটী অব মেডিসিনের ফেলো।

(৬) ইউনাইটেড কিংডমের চক্ষু সম্বন্ধীয় সমিতির (Opthal-mological Society) সদস্য।

(৭) অক্স্ফোর্ডের চক্ষুরোগ সম্বন্ধীয় কংগ্রেসের (Opthal-mological Congress) সদস্য।

নিম্নে ইহাদের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল :—

কেদারনাথ

হরিপদ
বিষ্ণুপদ
সুনীল
সন্তোষ
কৃষ্ণ
পূর্ণ
দুর্গামণি
গঙ্গামণি
সুরবালা
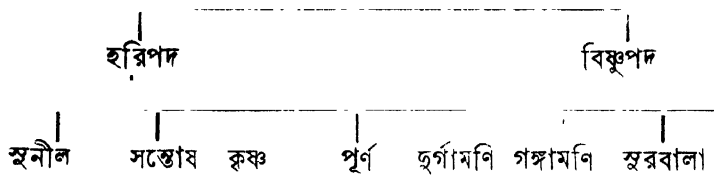
বাউষখালীর সিংহ-গোষ্ঠী

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন।

বাউষখালী গ্রাম ফরিদপুর জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত, ফরিদপুর টাউন হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে কুমার নদের তীরে অবস্থিত। বাউষখালীর সিংহ-বংশ বাৎস্যগোত্রীয় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ; ইঁহাদের আদিনিবাস ছিল নদীয়া জেলা—রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আনুলিয়া গ্রামে। প্রবাদ আছে, আনুলিয়ার কালিদাস সিংহ ঢাকা জেলায় চাকুরি করিতেন, তখন তিনি ইস্বদীয়া গ্রামের রাধানাথ ভদ্রের কন্যা অথবা পিসীকে বিবাহ করেন। এই ভদ্রবংশ বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন, সে জন্য কালিদাস দেশে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। তখন তিনি শ্বশুর-বংশের নিকট হইতে বাউষখালী তালুক বিবাহের যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া এই বাউষখালী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই তালুক তাঁহার পুত্র মনোহর সিংহের নামে ১২৯৯ সনে অর্থাৎ লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ এই তালুক ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

কালিদাস সিংহের নিম্নলিখিত অধস্তন অষ্টম পুরুষ এখন বাউষখালী গ্রামে বাস করিতেছেন।

এক সময়ে এই সিংহ বংশে জনবাহুল্য ছিল। সভারামের পাঁচ পুত্র হইয়াছিল—দুর্গাপ্রসাদ, গৌরীপ্রসাদ, ভবানীপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ও চণ্ডীপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদের আট পুত্র—রাধানাথ, কাশীনাথ, শম্ভুনাথ,

বৈদ্যনাথ, গোলোকনাথ, জগন্নাথ, লোকনাথ ও প্রাণনাথ, এবং তিন কন্যা —লক্ষ্মীমণি, অন্নময়ী ও পদ্মমণি।

রাধানাথের দৌহিত্র প্রসন্নকুমার ঘোষের দুই পুত্র শ্রীলালবিহারী ও শ্রীবিনোদবিহারী বাউষখালীতে বাস করিতেছেন। কাশীনাথের দৌহিত্র প্যারীমোহন ঘোষের পুত্র শ্রীঅমৃতলাল ঘোষও বাউষখালীতে বাস করিতেছেন। গোলোকনাথ সিংহের পুত্র মথুরানাথের একটি পুত্র হইয়াছিল, সেটি শৈশবে মৃত। মথুরানাথের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্রীযুক্তা মনোরমা এখন জীবিত আছেন। বৈদ্যনাথের বংশ নাই। লোকনাথ ও প্রাণনাথ অল্প বয়সে মারা গিয়াছিলেন। জগন্নাথের চারিপুত্র ও পাঁচ কন্যা হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই মৃত, কাহারও বংশ নাই। শম্ভুনাথের চারি পুত্র ও দুই কন্যা হইয়াছিল,—তন্মধ্যে একমাত্র কালীচরণ দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযতীন্দ্রমোহনই দুর্গাপ্রসাদ সিংহের একমাত্র বংশধর।

দুর্গাপ্রসাদের কন্যা লক্ষ্মীমণিকে রামলোচন বসু বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র রামজয় ও রামনাথ বসু বাউষখালী পত্তনী তালুকের এক তৃতীয়াংশ পাইয়া সিংহ-বাটীর সন্নিকটে সনাতনদি গ্রামে বাস করেন। তাঁহাদের বংশধরগণও সেখানে বাস করিতেছেন। অন্নময়ীর পুত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষ মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষও বাউষখালীতে বাস করিতেছেন।

দুর্গাপ্রসাদ সিংহ পুত্র-পৌত্র-কন্যা-দৌহিত্রগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া দীর্ঘকাল সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইয়াছিলেন। ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার ৺গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে অনেকেই উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন, তন্মধ্যে শম্ভুনাথই সমধিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি টেংরাখোলার নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন এবং এই অঞ্চলে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। তিনি যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন,

তেমন অকাতরে ব্যয় করিতেন। বাড়ীতে দুর্গোৎসব-দোল-দীপান্বিকা, রটন্তী প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। অতিথি-অভ্যাগত-আত্মীয়-কুটুম্বগণের সমাগমে প্রত্যহ প্রতিবেলায় প্রায় একশত পাতা পড়িত। তিনি ৺গয়া-কাশী-শ্রীবৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেম ; তখন রেল হয় নাই, সুতরাং এই সকল তীর্থগমন বহু ক্লেশ ও ব্যয়সাধ্য ছিল। তাঁহার পিতা দুর্গাপ্রসাদের ৺গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলে ঘটা করিয়া তাঁহার দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। ১২৫৩ সনে ৬৪ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। তখন তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে একমাত্র জগন্নাথ জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীচরণের বয়স ১০ বৎসর মাত্র।

কালীচরণ নাবালক অবস্থায় পিতৃহীন হইয়া এক মহাবিপদে পড়িলেন। বাউষখালী গ্রামের পত্তনী-স্বত্ব পাইকপাড়ার জমিদার রাণী কাত্যায়ণীর নিকট হইতে ১২৪৫ সনে কাশীনাথ সিংহ ও রামজয় বসু এই নামে পাট্টা করা হইয়াছিল, ইহার মধ্যে সিংহদিগের দুই-তৃতীয়াংশ ও বসুদিগের এক তৃতীয়াংশ ছিল, কিন্তু পাট্টাতে এই অংশ উল্লেখ করা ছিল না। শম্ভুনাথের মৃত্যুর পর বসুগণ ইহার অর্দ্ধেক দাবি করিয়া বসিলেন, এবং ইহা লইয়া বসুদিগের সহিত বহুবর্ষব্যাপী মামলা-মোকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইল। অবশেষে ১২৭২ সনে উভয় পক্ষে রফানিষ্পত্তি হয় এবং বসুগণ সিংহদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য দুই তৃতীয়াংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। কালীচরণ এইরূপে বহু কষ্টে পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিলেন, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী মামলা-মোকদ্দমায় বহু অর্থব্যয় করিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। এত কষ্টে পড়িয়াও তিনি বার্ষিক দুর্গোৎসবাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ বন্ধ করেন নাই। তখন তাঁহার ভাইদের মধ্যে মথুরানাথ ও রামচরণ জীবিত ছিলেন। আর তাঁহার পিসতুত ভাই গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ভাগিনের

প্যারীমোহন ঘোষ তাঁহার সহায় ছিলেন। কালীচরণ বাঙ্গলা লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, তখনও এই অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হয় নাই। তিনি ফরিদপুর রাণী রাসমণির এষ্টেটের আমমোক্তার ৺কালীনাথ দত্তের মোহরের নিযুক্ত হইলেন। পরে কালীনাথবাবু অবসর গ্রহণ করিলে কালেক্‌টার সাহেবের নিকট হইতে মোক্তারি সনদ লইয়া তিনি তাঁহার স্থলে উক্ত এষ্টেটের আমমোক্তার নিযুক্ত হইলেন। তিনি ৪০ বৎসরকাল এই কার্য্য করিয়াছিলেন। রামচরণ ২৮ বৎসর বয়সে মারা যান, মথুরানাথ বাড়ীতে থাকিয়া বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি খুব বুদ্ধিমান ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শিশুপুত্রের মৃত্যুর পরে তিনিও অকালে পরলোক গমন করেন।

কালীচরণ যশোর জেলা—টাবনীগ্রাম নিবাসী ৺ভগবানচন্দ্র ঘোষের কন্যা কামিন সুন্দরীকে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমে একটি পুত্র হইয়াই মারা যায়, তাহার পরে ১২৭৫ সালের ১২ই চৈত্র তারিখে যতীন্দ্র মোহন জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার ৬ বৎসর পরে একটি কন্যা জন্মে; তাহার নাম বগলাসুন্দরী। যতীনের বয়স যখন ৮ বৎসর তখন কামিনী সুন্দরী কলেরা রোগে স্বর্গারোহণ করেন; কালীচরণ আর দারপরিগ্রহ করেন নাই।

যতীন গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়া ফরিদপুরে পিতার নিকটে আসে এবং জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হয়। সে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ায় উন্নতি দেখাইতে লাগিল, এবং ১৮৮৬ সনে জেলাস্কুল হইতে ১৫ টাকা বৃত্তি পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। পরে কলিকাতা জেনারেল এসেম্বিলি কলেজে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ১৮৯০সনে ইংরাজী সাহিত্য ও সংস্কৃতে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করেন। ১৮৯১ সনে প্রতিযোগী পরীক্ষা দিয়া সবডেপুটির কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৩ সনে পরীক্ষা দিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।

যতীন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, যশোর জেলা—কামঠান গ্রাম-নিবাসী ৺হরিমোহন বসুর কন্যা শ্রীমতী সরোজিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যতীনের ২৫ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়, পরে আর ২টী পুত্র ও ৬টি কন্যা হইয়াছিল, এখন একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রমোহন এবং চারিটি কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী, শিবরাণী, হৈমবতী ও উষারাণী বিদ্যমান।

যতীন্দ্রমোহন প্রথমে উড়িষ্যায় ৭ বৎসর চাকুরি করেন, পরে নোয়াখালি, ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, পুরুলিয়া, জঙ্গীপুর, ময়মনসিংহ, বহরমপুর, চাঁদপুর, কৃষ্ণনগর, জলপাইগুড়ি এইসকল স্থানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। মাণিকগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, জঙ্গীপুর, বহরমপুর, ও চাঁদপুরে প্রায় দশ বৎসর কাল সব ডিভিসন্যাল অফিসার ছিলেন। কৃষ্ণনগরে প্রায় ৬ বৎসর থাকিয়া কয়েকবার অস্থায়িভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট্-কালেক্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন, পরে বগুড়ার স্থায়ী কালেক্টার নিযুক্ত হইয়া বদলী হন এবং সেখান হইতে ১৯২৪ সালের ২৬শে মার্চ্চ তারিখে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বেতন ১৩৫০৲ টাকা হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রায় বাহাদুর খেতাব প্রাপ্ত হন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা লর্ড লিটন তাঁহাকে এই সনদ প্রদান করিবার সময় বলিয়াছিলেন,—

"Rai Jatindra Mohan Singh Bahadur, after 30 years" meritorious service in the Begal Civil Service, you have recently been confirmed in a listed post of Collector and Magistrate. For seven years you served with credit in the Orissa Settlement. For over 10 years you were a Sub-divisional officer and won the esteem and respect

of the people and the appreciation of Government wherever you worked. During the difficult period when you held charge of Nadia district in 1921, you dealt with of problems of disorder with sound judgment and proved yourself a reliable officer "

অর্থাৎ—"রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, আপনি ৩০ বৎসর কাল বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া সম্প্রতি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টারের কার্য্যে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনি ৭ বৎসর উড়িষ্যার বন্দোবস্ত কার্য্য করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দশ বৎসর অধিককাল আপনি মহাকুমার ভারপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, যেখানে যেখানে ছিলেন, সর্ব্বত্রই আপনি জন-সাধারণের প্রীতি ও সম্মান এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ১৯২১ সনে যখন আপনি নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন তখন শাসনকার্য্য অতি দুরূহ হইয়াছিল, আপনি সেই সময়ে দেশের আপত্তিজনক সমস্যা সকল অতি ধীর বিচারবুদ্ধির সহিত সমাধান করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন।"

বাল্যকাল হইতে যতীন্দ্রমোহনের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হইত। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মসাধন করিয়া আসিতেছেন এবং অবসরমত শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কলেজে পড়িবার সময় হইতে তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তিনি প্রথমতঃ নব্যভারতাদি মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন, পরে উড়িষ্যায় অবস্থানকালে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "সাকার ও নিরাকারতত্ত্ববিচার" পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক পাঠ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ৺ চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছিলেন—

"এই গ্রন্থখানি লিখিয়া আপনি বাঙ্গালা সাহিত্যের গুরুত্ব ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।"

এই পুস্তকের পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন --

"বঙ্গভাষায় সাকার ও নিরাকার উপাসনা বিষয়ে আমি যে কয়খানি গ্রন্থ দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এই গ্রন্থখানিই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়; বঙ্গভাষা-জননীর মহামূল্য রত্ন-ভাণ্ডারে আপনার এই গ্রন্থখানি যে মহামূল্য রত্নালঙ্কার-শোভা বর্ধন করিতেছে তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।"

যতীন্দ্রমোহনের দ্বিতীয় গ্রন্থ "উড়িষ্যার চিত্র।" ইহা একখানি বাস্তব চিত্রসম্বলিত উপন্যাস (Realistic novel)। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"সচেতনচিত্ত এবং সর্ব্বদর্শীকল্পনা বিধাতার দুর্লভ দান। আবার জানিলেও জানান যায় না। যতীন্দ্রবাবুর জানিবার শক্তি ও জানাইবার শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয় পাওয়া গেছে।"

অতঃপর ১৩১৪ সনে তাঁহার 'ধ্রুবতারা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়, এখন ইহার অষ্টম সংস্করণ (একাদশ সহস্র) চলিতেছে। বঙ্গসাহিত্যে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সাহিত্যাচার্য্য ৺ অক্ষয় চন্দ্র সরকার 'সাহিত্য' পত্রিকায় ইহার সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির করিয়া অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন। ঢাকার 'বান্ধব'-সম্পাদক ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর C. I. E. লিখিয়াছিলেন,—

"আপনার 'ধ্রুবতারা' বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি অত্যুজ্জ্বল তারারূপে ধ্রুবস্থান পাইবে।"

যতীন্দ্রমোহনের তৃতীয় উপন্যাস 'অনুপমা' ১৩২৫ সনে প্রকাশিত

হয়। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, মাইকেলের সমালোচক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল এই পুস্তক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"বঙ্গের সাহিত্য-গগনে আপনার 'অনুপমা' ধ্রুবতারারই মত ধ্রুবভাবে বিরাজ করিবে এমন আশা করিতে পারা যায়।"

এই তিনখানি উপন্যাস ছাড়া, যতীন্দ্রমোহনের তিনখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আছে, "তোড়া" "তপস্যা" এবং "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা"; এগুলি তাঁহার পাবলিসার ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্সের আট আনা সংস্করণের অন্তর্গত।

তোড়া—ইহাতে কয়েকটি সুমধুর ব্যঙ্গচিত্র, সরল ক্ষুদ্রগল্প এবং কৌতুকজনক সমালোচনা আছে।

তপস্যা—কয়েকটি সুগভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের সমষ্টি।

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা—আর্টের দোহাই দিয়া যে সকল দুর্নীতিপূর্ণ গল্প ও উপন্যাস সাহিত্য ও সমাজের স্বাস্থ্য দূষিত করিতেছে এই পুস্তকে তাহার কয়েকখানির আর্টের দিক দিয়া ও সমাজের দিক দিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তক বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে চক্ষুষ্মান সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মহোপকার সাধন করিয়াছে।

কৃষ্ণনগর অবস্থানকালে নবদ্বীপ পণ্ডিতসভা যতীন্দ্রমোহনকে নিম্নলিখিত মানপত্র প্রদান পূর্ব্বক "কবিরঞ্জন" উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন,—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ নদীয়া বিভাগ প্রথম শ্রেণীস্থ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের আশার্ব্বাদোপাধিদান পত্রমেতৎ—

১। যদিদং শাব্দিকৈরুক্তং সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।
যতীন্দ্রমোহনে সিংহে কদাপি তন্ন যুজ্যতে ॥

তৎকারণমাহ—

২। যদ্ বর্ণস্ত্বমসি শ্রীমন্ তস্য কর্ত্তব্যপালনম্।
তব সদ্ দৃষ্ট মস্মাভি স্তৎ প্রশস্যমতীব নঃ ॥

৩। প্রসূয় কবি সূক্তানি বহুনি তব লেখনী।
ব্যাপৃতাস্পন্দ্য কাঠিন্যে করোতি লোপ রঞ্জনম্ ॥

৪। "কবিরঞ্জন" ইত্যস্মাদুপাধিস্তে প্রদীয়তে।
আশাস্মহে সবন্ধুস্ত্বং সসুখং জীবতাচিরম্ ॥

১৮৬৯ শকাব্দীয় সৌরফাল্গুনস্য ত্রয়োদশাদিবসীয়ম্ } নবদ্বীপ সভাতঃ পণ্ডিতবৃন্দৈঃ সাদরমুপহ্রিয়তে।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া যতীন্দ্রমোহন নিজের বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং অবসরমত সাহিত্য চর্চ্চা করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রমোহন ডাক্তারি পাশ করিয়া ফরিদপুরে থাকিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার জন্য একটি ডিস্পেনসারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার নাম কালীচরণ ফার্ম্মেসী; যতীন্দ্রমোহন ফরিদপুর টাউনে ইতিপূর্ব্বে "ধ্রুবতারা কুটীর" নামক একটি ক্ষুদ্র বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার সংলগ্ন একটি দ্বিতল বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার নাম "আনন্দ কানন"। ফরিদপুর টাউনে বাসভবন নির্ম্মাণ করিলেও তিনি পল্লীভবনের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বাউষখালীর বাটীতে দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ পূর্ব্বের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে সেগুলি যাহাতে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে, সেই জন্য উক্ত ক্রিয়াকর্ম্মের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে

কতক সম্পত্তি নিয়োগ করিয়া একটি ট্রাষ্ট ডিড (Trust deed) সম্পাদন করিয়াছেন।

যতীন্দ্রমোহনের কন্যাসকল উপযুক্ত পাত্রে দান করা হইয়াছে। জেলা যশোর—বাঘুটীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা। ইনি সবরেজেষ্ট্রারের কার্য্য করেন। চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী বেজড়া-নিবাসী শ্রীমান তারকেশ্বর নাথ মিত্র মধ্যম জামাতা, হাইকোর্টের উকিল। তৃতীয় জামাতা শ্রীমান্ নন্দগোপাল বসুর নিবাস সিঙ্গা হাড়গাড়া, জেলা যশোর। চতুর্থ জামাতা শ্রীমান্ অনিলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ইঁহার নিবাস নড়ালের নিকট কুরিগ্রাম।

যতীন্দ্র মোহনের পুত্র সুরেন্দ্রমোহন কলিকাতা বাগবাজার বিশ্ব-কোষ লেন-নিবাসী বিশ্বকোষ সম্পাদক প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার এখন দুই পুত্র এবং এক কন্যা। যতীন্দ্রমোহন এখন উপযুক্ত পুত্রের হস্তে সংসারের ভার অর্পণ করিয়া ৺কাশীধামে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাবা বিশ্বনাথ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জনের বংশ-তালিকা।

রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাঁচথুপি গ্রামে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে বৈষ্ণবশিরোমণি পুণ্যশ্লোক পরলোকগত জগৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ঔরসে রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় জন্ম গ্রহণ করেন।

উত্তর বঙ্গের দিনাজপুরের রায় সাহেব বংশ পরম ভাগবত এবং দয়াদাক্ষিণ্যাদি বহু সৎগুণের জন্য দেশবিখ্যাত। প্রাচীন হিন্দু রাজন্য বর্গের কীর্ত্তিসৌধের ভগ্ন স্তূপের উপর দিনাজপুর রাজবংশ এবং এই রায় সাহেব বংশ এখনও অতীত যুগের হিন্দুর গৌরবগাথা বক্ষে লইয়া সর্ব্বধ্বংসী কালের বুকের উপর বিরাজ করিতেছে। নিত্য হোমপরায়ণ স্বনামধন্য পুণ্যব্রত মহাত্মা সোম ঘোষের বংশেই দিনাজপুর রাজবংশের উদ্ভব। রায় সাহেব বংশ উক্ত রাজবংশের অন্যতম নিকটবর্ত্তী শাখা মাত্র। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের ইঁহারা ভ্রাতৃবংশ বলিয়া পরিচিত এবং সর্ব্বত্র সম্মানিত।

প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা সোম ঘোষের বংশে পরম বৈষ্ণব বিখ্যাত গৌরচন্দ্র পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ মহাশয়ের আবির্ভাব হয়। তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পার্শ্বদ ছিলেন।. তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অগ্রদ্বীপের ৺গোপীনাথ জীউ এখনও প্রতি বৎসর বারুণীর দিবস তাঁহার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া থাকে. বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত এই অগ্রদ্বীপধামে প্রতিবৎসরই ঘোষ ঠাকুরের মহোৎসব হইয়া থাকে এবং এই মেলা উপলক্ষে বহু দূরদেশ হইতে অসংখ্য ভক্ত সাধকের সমাবেশ হয়। ইঁহার বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য শিষ্য ছিল এবং এখনও কতক আছে। বগুড়ায় ঘোষ ঠাকুর বংশের এখনও অনেকে বিদ্যমান আছেন। উক্ত মহাত্মা বাসুদেব

ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতা মাধব ঘোষের বংশ হইতেই দিনাজপুরের সুবিখ্যাত রায় সাহেব বংশের উদ্ভব। ইঁহাদের উপাধি ঘোষ রায় (ষট কুল, ষোল আনা ভাব)। শ্রেষ্ঠকুলীন বলিয়া উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে ইঁহাদের যথেষ্ট সম্মান এবং প্রতিপত্তি আছে। ইঁহারা পরম বৈষ্ণব, নিরামিষাশী এবং শান্তিপুরের গোস্বামীদের শিষ্য।

এই উত্তর রাঢ়ীয় ঘোষরায় বংশে রামকান্ত, কৃষ্ণকান্ত এবং গোপীকান্ত নামে তিন সহোদরের জন্ম হয়। এই সময় অপুত্রকতা নিবন্ধন মহারাজ কনিষ্ঠ গোপীকান্তকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার "রাধানাথ" নামকরণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে বৃদ্ধ মহারাজ লোকান্তরিত হইলে, রাজা রাধানাথ পিতৃ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর মহামতি মনস্বী রামকান্ত রায়কে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তাঁহার পরিচালনগুণে এবং কার্য্যদক্ষতায় দিন দিন রাজ্যের উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শীঘ্রই সর্ব্ব-সাধারণে বিশ্বাস এবং প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। রাজ্যের উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইলেও তাঁহার দৃষ্টি ঐহিক এবং পারত্রিকের দিকেও ছিল। দিনাজপুরে যে বিখ্যাত "দেওয়ান দীঘি" বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা তাঁহারই অক্ষয় কীর্ত্তি। সর্ব্ববিধ্বংসী কালের ফুৎকারেও এ কীর্ত্তির বিলোপ-সাধন হয় নাই। স্বনামধন্য মহাপুরুষ-গণের স্বকীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ এইরূপভাবে চিরদিনই ধরার বক্ষে দেদীপ্যমান থাকিয়া জগৎবাসীকে তাঁহাদের পুণ্যানুষ্ঠানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহার এইরূপ বহু সদনুষ্ঠান এবং রাজকার্য্য পরিচালনায় সুখ্যাতির কথা শুনিয়া তদানীন্তন মোগলরাজ তাঁহাকে সম্মানিত করিবার জন্য, "রায় সাহেব" উপাধিতে ভূষিত করেন।

মহারাজকে রাজকার্য্য সম্বন্ধে কিছুই করিতে হইত না। সুযোগ্য

দেওয়ান বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে এবং সুব্যবস্থায় সকল কার্য্য সুশৃঙ্খল-ভাবে সমাহিত হইতেছে দেখিয়া অবসর-বিনোদনের জন্য মহারাজ ক্ষত্রোচিত মৃগয়াদিতে কালহরণ করিতে লাগিলেন। দিনাজপুরের তদানীন্তন কালেক্টর সাহেবও অনেক সময় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া শিকার করিতেন; এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর সামান্য কোন কারণ লইয়া, গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ মহারাজের সহিত কালেক্টর সাহেবের মনান্তরের সূচনা হয় এবং পরিশেষে তাহা বিষম মনোমালিন্যে পরিণত হওয়ায় কালেক্টারীর খাজনা দেওয়া রহিত হইয়া যায়। ইহার ফলে বাকী খাজনার দায়ে মহারাজের সুবিশাল জমিদারীর পরগণার পর পরগণা নিলামে উঠিতে লাগিল। দেওয়ান রাধাগোবিন্দ রায় এই অবসরে কতিপয় পরগণা খরিদ করিয়া লয়েন। উক্ত কালেক্টর আরও কিছুকাল দিনাজপুরে অবস্থান করিলে মহারাজের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িত; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের গভর্ণমেণ্ট উক্ত কালেক্টরকে দিনাজপুর হইতে বদলি করিয়া তাঁহার স্থানে অপর একজনকে প্রেরণ করিলেন।

মহারাজকুমার বৈদ্যনাথ নব নিয়োজিত কালেক্টার কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কোন আসন আর পরিগ্রহ করিলেন না। তিনি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, কোন আসনে উপবেশন করিতেছেন না দেখিয়া কালেক্টার তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে তিনি বলেন, "সাহেব দিনাজপুরে আমার আর আসন নাই, বসিব কিসে?"

অতঃপর কালেক্টার সাহেব সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হন। যে সকল খরিদ্দার নিলামে মহারাজের সম্পত্তি বাকি খাজনার দায়ে খরিদ করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া সেই সমস্ত জমিদারী মহারাজকে প্রত্যর্পণ

করিবার জন্য অনুরোধ করেন। অনেকেই কালেক্টরের সে অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইতে সাহস করেন নাই, তাঁহারা যথোপযুক্ত মূল্য লইয়া রাজ সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ আত্মগোপন করিয়া স্থানান্তরে অবস্থান করেন।

এই সময়ে দেওয়ান বাহাদুরের মৃত্যু হয়। তিনি চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার লোকান্তরের পর, তাঁহার মধ্যম সহোদর কৃষ্ণকান্ত রায় কালেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিজানগর পরগণা বিনামূল্যে মহারাজ-কুমারকে প্রত্যর্পণ করেন। ইনি যেমন সদাশয়, পরহিতব্রত, পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তেমনই কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং নানাবিধ লোক-হিতকর সদনুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ইনি দিনাজপুর টাউনে ঘাঘরা নদীর উপর যে দুইটি খিলান পোল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও এই ১৭৫ বৎসরের উপর তাঁহার কীর্ত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পোল দুইটি প্রাচীন হইলেও এখনও কার্য্যোপযোগী রহিয়াছে এবং তাহার উপর দিয়া লোক চলাচল করিতেছে। ইহার পর ১১৭৬ সালে মন্বন্তর উপস্থিত হইলে লক্ষ লক্ষ লোক যখন অন্নাভাবে মরণাপন্ন হইয়া হাহাকার করিতেছিল, তখন করুণার্দ্রহৃদয় কৃষ্ণকান্ত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বুভুক্ষিতের আর্ত্তনাদ তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি সেই সকল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে অন্নসত্র খুলিয়া ক্ষুধার্ত্ত জনগণের প্রাণরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কার্য্যে তাঁহার বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইলেও সে দিকে তাঁহার ভ্রুক্ষেপ ছিল না, অনশন মৃত্যু হইতে নরনারীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ভাবিয়াই আনন্দিত এবং কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই লোকহিতকর সদনুষ্ঠানের জন্য মোগলরাজ তাঁহাকে বংশানুক্রমিক "রায় সাহেব" উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

এই মহাত্মার বহু কীর্ত্তি নানাস্থানে বিদ্যমান আছে। ইনি কাশীধামে ৺পাতালেশ্বর মহাদেব ও শ্রীবৃন্দাবনে ৺মদনমোহন ও ৺রাধাকান্ত জীউ নামক দুইটী বৃহৎ কুঞ্জ বা ঠাকুর-বাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেন। মালদহে মহাপ্রভুর সেবার সুব্যবস্থা করিয়া নিজ ভবন ক্ষেত্রীপাড়ায় ৺রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। দিনাজপুরের লুলাই বাড়ী. দিনাজপুর পল্লী ও সুন্দর বনে যে সকল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয় উহা তাঁহারই কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত বহুতীর্থ স্থানে কত যে পান্থশালা ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইঁহার পোষ্যপুত্র রাজীবলোচন রায় অধিক দিন জমিদারী ভোগ করিতে পান নাই। অপুত্রকাবস্থায় অকালে তাঁহার লোকান্তর হইলে, তাঁহার বিধবা পত্নী শ্বশ্রু দেবতার পরামর্শে কমললোচন রায়কে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইনি পরম ধার্ম্মিক ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণবস্মৃতি হরিভক্তিবিলাস অনুবাদ করিয়া ব্রত-দর্পণ নামক এক উপাদেয় পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইহা প্রাচীন বাঙ্গালায় লিখিত। উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া, বৈষ্ণবমণ্ডলে বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। ইনি গান ও কীর্ত্তন করিতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার স্বরচিত অনেক পদ রচনা আছে, তাহাদের সংখ্যা পাঁচ শতেরও উপর হইবে।

এই কমললোচন রায়ের আমলেই তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর বহুল উন্নতি এবং বিস্তৃতি সাধিত হয়। তিনি বাঙ্গালার বিভিন্ন ছয়টী জেলায় বহু সম্পত্তি খরিদ করিয়া রায় সাহেব বংশকে উত্তর বঙ্গের একটী প্রতিপত্তিশালী প্রধান জমিদার বংশরূপে পরিণত করিয়া যান। ইনি বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বহু স্থলে তাঁহার সদনুষ্ঠানের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। এক নবদ্বীপেই তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের বিখ্যাত "ছোট আখড়া" প্রধানতঃ ইঁহারই অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই কমললোচন রায় সাহেবও নিঃসন্তান। তাঁহার আর কোন সন্তানাদির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া জেলা মুর্শিদাবাদের পাঁচথুপী গ্রামের বৈষ্ণবশিরোমণি, পরম ভাগবত, সাধু জগচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে রাধাগোবিন্দকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। জগচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সংসারী হইলেও সংসারে তাঁহার আসক্তি ছিল না। সাধু-সজ্জনের সেবা, ধর্ম্মালোচনা এবং ভগবচ্চিন্তাতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। এইরূপ শুনা যায়, তিনি একটী মোহর দক্ষিণাসহ স্বীয় পুত্র রায় সাহেব কমললোচন ঘোষ মহাশয়কে দান করিয়া ভেক লইয়া সংসারাশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং ভগবানের লীলা-মুখরিত, তাঁহার পূত পদরজে পবিত্রীকৃত শ্রীবৃন্দাবনের শান্তিময় কোলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশেষে এই স্থানেই প্রায় শতবর্ষ বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠেশ্বরের পাদপদ্মে লীন হন।

রাধাগোবিন্দকে দত্তক গ্রহণ করিয়াই কমললোচন তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি সংস্কৃত ও ফারসি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বাল্যকালে তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষার অবসর দেওয়া হয় নাই। পিতার পরলোক-গমনের পর প্রয়োজনবোধে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ৺গৌরকিশোর পণ্ডিত বাবাজী, ৺রামচন্দ্র শিরোমণি ও কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ মহাশয়গণের নিকট রাধা-গোবিন্দ বৈষ্ণবদর্শন, সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কৈশোরে অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে অর্থাৎ তাঁহার ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রায় সাহেব কমললোচন মহাশয় সংসারলীলা সম্বরণপূর্ব্বক সাধনোচিত-ধামে গমন করেন। এই অল্প বয়সে বিপুল সম্পত্তির অধিকার হইয়া রাধাগোবিন্দ বংশের প্রাচীন "রায় সাহেব" উপাধি লাভ করেন এবং সমাজে দিনাজপুরের রায় সাহেব নামে পরিচিত হন।

রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া স্বীয় পিতৃদেবের দানসাগর শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। পিতা কমললোচনের পরলোক-গমনের পর যখন তিনি নিজহস্তে বিপুল ভার গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার নব যৌবন। হিতোপদেশকার বলিয়াছেন, "যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্।" যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব আর অবিবেকতা – এই চারিটীর একটীতে লোক মত্ত হইয়া পড়ে। দৈবক্রমে এই চারিটীর একত্র সংযোগ বা সমাবেশ হইলে মানুষ না করিতে পারে এমন দুষ্ক্রিয়া নাই; কিন্তু এই স্বর্গীয় মহাত্মা নবযৌবনে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী এবং প্রভুত্ব-বিকাশের প্রচুর অবসর পাইয়াও অবিবেকতার দাস হইয়া পড়েন নাই। পরম বৈষ্ণব জনকের বৈরাগ্য, ভক্তি এবং সাধুতা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন এবং বাল্য-কৈশোরে তাঁহার সুকুমার জীবনে স্বধর্ম্মপরায়ণ পুণ্যকীর্ত্তি পিতা কমললোচনের সাধু জীবনের আদর্শ প্রতিপালিত হইয়াছিল বলিয়াই, তিনি সকল রকম প্রলোভন এবং মোহজাল হইতে নিজেকে নির্ম্মুক্ত রাখিয়া ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহার যশোকুসুমের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। যে সময়ে তিনি কর্ম্মজীবনে প্রবেশ লাভ করেন, সে সময়ে বাঙ্গালার নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মহাবিপ্লব ওতঃপ্রোতভাবে বহিয়া যাইতেছিল। একদিকে চাকচিক্যময় ফেরঙ্গ সভ্যতার প্রবল অনুচিকীর্ষা, অন্যদিকে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জীবিত করণের প্রচেষ্টা। এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া কত নব্য যুবক যে দিশেহারা হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। জীবনের এই মহাসন্ধিক্ষণে বঙ্গদেশের দশটী জেলার বিপুল সম্পত্তি, গঙ্গার জলোচ্ছ্বাসের মত উদ্দাম যৌবন এবং অসীম প্রভুত্ব-বিস্তারের অবকাশ পাইয়াও তিনি বিলাস-ব্যসন হইতে দূরে থাকিয়া, যে অসাধারণ হৃদয় বলের পরিচয় দিয়া

গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অনন্যদুর্লভ এবং প্রশংসনীয়। হৃদয়ে অনন্যসাধারণ ধর্ম্মভাব, প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি না থাকিলে এ অবস্থায় কেহ অবিচলিত থাকিয়া আত্মোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। তিনি এই বয়স হইতেই স্বর্গীয় পিতার আচরিত ধর্ম্ম, তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখাই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনের এ মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে কোন দিনই তাঁহার ত্রুটী বা শৈথিল্য প্রকাশ পায় নাই। এই সময়ে নব্য সম্প্রদায়ের যে সকল খ্যাতনামা মহোদয়ের সহিত কর্ম্মজীবনে তাঁহার সংসর্গ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাইকপাড়ার রাজা ৺ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ এবং রাজা ৺ক্ষেত্রমোহন সিংহ বাহাদুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল মহাপুরুষের প্রভাবও তাঁহার জীবনের উপর বড় কম কাজ করে নাই।

রাজা সাহেব কমললোচনের জীবদ্দশাতেই জেমোর প্রসিদ্ধ সিংহ-বংশে তাঁহার বিবাহ হয়। এই উদ্বাহফলে তাঁহার দুইটী কন্যা এবং দুইটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। দুহিতা দুইটীর নাম শতরূপা ও প্রিয়ম্বদা এবং পুত্রদ্বয়ের নাম শরদিন্দু ও পূর্ণেন্দু। ভাগলপুরে সিংহবংশে কন্যা দুইটীর এবং জ্যেষ্ঠপুত্র শরদিন্দুর বিবাহ ত্রিবেণীর জমিদার ৺গোপী মোহন সিংহের ও কনিষ্ঠ পূর্ণেন্দুর বিবাহ রসোরার সিংহ চৌধুরী বংশের কন্যার সহিত দেন। রায় সাহেব তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দুই পুত্রকে বিভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উভয় পুত্রই উপযুক্ত, কৃতবিদ্য, ধর্ম্মপরায়ণ এবং পিতৃপদাঙ্কের অনুসরণকারী। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় "বড় কুমার" এবং কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ "ছোটকুমার" নামে খ্যাত। শরদিন্দুনারায়ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পরীক্ষা দিয়া ইংরাজীতে

প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিহেতু প্রাজ্ঞ উপাধি লাভ করেন। ইনি পূর্ব্বে দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি এক্ষণে অধিকাংশ সময় ত্রিবেণীতেই অবস্থান করেন এবং উভয় স্থলের জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করেন। এখনও তাঁহার অবসর সময়ের অধিকাংশই জ্ঞানানুশীলনে অতিবাহিত হয়। কনিষ্ঠ দিনাজপুরেই অবস্থান করেন। বর্ত্তমানে তিনি তথাকার মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান।

স্বর্গীয় রায় সাহেবের বয়স যখন সপ্তবিংশ বর্ষ তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয়। তদবধি তিনি স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন এরূপ পূর্ণ যৌবনে নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ়তাই সূচিত হইয়াছিল। সুকুমার বাল্যকাল হইতে তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্ম-ভাবের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া শ্যামল পল্লবিত মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। অতুল সম্পদ এবং ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিয়াও যেরূপ অনাসক্তভাবে তিনি জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, আজিকার দিনে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ না হইলেও নিতান্ত বিরল। ভোগবিলাসের কলুষিত ছায়া কোন দিন তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। পূর্ণ যৌবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ এবং অপরাপর যাবতীয় ভোগবিলাস-বিমুখ থাকিয়া বরাবর পরম নিষ্ঠার সহিত সাত্ত্বিক জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। দিবসে একমুষ্টি আতপান্ন, কাঁচকলা ও ডমুরের ঝোল, এবং রাত্রিকালে সাগু, বার্লি এবং সামান্য দুগ্ধ ছিল তাঁহার নিত্য আহার। শ্রীগোবিন্দের প্রসাদী মিষ্টান্ন পক্বান্ন প্রসাদ বলিয়া কণিকামাত্র প্রতিদিন জিহ্বায় স্পর্শ করিতেন।

স্বর্গীয় মহাত্মা রায় সাহেব মহাশয় একজন পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব

ছিলেন। প্রকৃত বৈষ্ণবের যে লক্ষণ তাহা তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে স্বতঃই ফুটিয়া উঠিত। একজন প্রবল প্রতাপশালী জমিদার হইয়াও তিনি লোকব্যবহারে তৃণাদপি নীচ হইয়া থাকিতেন, তরুর মত তাঁহার সহিষ্ণুতা ছিল এবং সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ লইয়া সাধুসজ্জনসহবাসে দিনযাপন করিতেন। তাঁহার বেশভূষাতেও কোন আড়ম্বর ছিল না। তাঁহাকে জানা না থাকিলে, তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া তাঁহাকে রায় সাহেব বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিত না। প্রকৃত বৈষ্ণবের মত তিনি অতি দীনভাবাপন্ন এবং বিবিধ সৎগুণে ভূষিত ছিলেন। সাক্ষাৎ হইলে প্রথম সম্ভাষণ তিনিই করিতেন, অপরকে সে অবসর দিতেন না। এমন কি একটী বালকের সহিত কথা কহিতে, কি আলাপ করিতে হইলেও তিনি বিনীতভাবেই কথা কহিতেন। আজি-কালিকার বড়লোক বা জমিদারগণের ন্যায় তিনি অনধিগম্য ছিলেন না ; সামান্য ইতর লোক, এমন কি একটী বালক পর্য্যন্ত অসঙ্কোচে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিত।

তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিতেন। বাড়ীতে যে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, নিম্নলিখিতভাবে তাঁহার সেবার্চ্চনা এবং ভোগরাগাদি সম্পন্ন হইত। কোনওক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় ছিল না। অতি প্রত্যূষে মঙ্গল আরতি, প্রভাতী-কীর্ত্তন ; লুচি, ভাজা ও ক্ষীরের লাড়ু ভোগ। বাড়ী প্রদক্ষিণ করিয়া সংকীর্ত্তন ;

তাহার পর স্নান, আরতি, ফলমূল, লুচিভোগ।

তৎপরে মধ্যাহ্নে রাজভোগ—আধ মণ অন্ন, বহুবিধ তরকারি, বিবিধ মিষ্টান্ন, ভোগ, আরতি ও কীর্ত্তন।

বৈকালে—রাস, বৈকালী ভোগ—ফলমূল, ডাব, নানাবিধ সরবৎ, ছানা, মাখন, ক্ষীর সর ইত্যাদি।

সন্ধ্যায়—আরতি, ২ ঘণ্টা কীর্ত্তন।

রাত্রি ১০টায়, শয়ন আরতি ও কীর্ত্তন।

এই ছিল তাঁহার দেবসেবার দৈনন্দিন ব্যবস্থা। প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত তিনি স্বহস্তে ঠাকুরবাড়ী ধৌত করিতেন, বাসন মাজিতেন, পাখা টানিতেন। গ্রীষ্মকালে রাত্রি একটা কিংবা দুইটা পর্য্যন্ত বসিয়া নিজহস্তে পাখা টানিতেন, কাহারও নিষেধ শুনিতেন না। তাঁহার মত এত বড় একনিষ্ঠ ভক্ত আজিকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না। অথচ কোন বিষয়ে প্রতিষ্ঠা-ভিখারী ছিলেন না। তিনি আপনাকে গোবিন্দ জীউর বাড়ীর কাল কুকুর বলিয়া অভিহিত করিতেন।

রাজর্ষি জনকের মত তিনি সংসারে থাকিয়াও সকল বিষয়ে অনাসক্ত এবং উদাসীন ছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যে গীতার নিষ্কামতা প্রকটিত হইত। দিনান্তে এক সন্ধ্যা ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া এই মহাত্মা পরার্থে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার দান সাত্ত্বিক দান ছিল। তিনি কখনও নাম বা প্রতিষ্ঠার লোভে ডঙ্কা বাজাইয়া দান করেন নাই। প্রত্যহ কত অনাথ, আতুর, সাধু, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, অভ্যাগত, ভিখারী তাঁহার নিকট অন্ন ও সাহায্য পাইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কথায় তাঁহার গৃহ ও অতিথিশালা একটী অনাথ ভাণ্ডার ছিল। এ স্থান হইতে তাঁহার জীবদ্দশায় কোন অর্থীকে বিফলমনোরথ হইয়া রিক্ত-হস্তে ফিরিতে হয় নাই। কত অনাথ বালক, কত দুঃস্থ বিদ্যার্থী তাঁহার অর্থে শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছে। তিনি স্বজাতি দরিদ্র উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থসন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বহুকাল যাবৎ বার্ষিক প্রায় সহস্র মুদ্রা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। দিনাজপুর, কাশী, বৃন্দাবন ও মালদহের অতিথি-সৎকারের জন্য তিনি প্রতি বৎসর ৫০।৬০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন বার্ষিক অধ্যাপক পণ্ডিত-বিদায়েও প্রায় ১০।১২ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। তাঁহার দানশৌণ্ডতার অবধি ছিল না। তিনি বহু বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানের

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা"র কার্য্যে তিনি প্রতি বৎসর রীতিমত সাহায্য করিতেন এবং বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সভার শিক্ষা-সমিতিতে বার্ষিক সহস্র টাকা করিয়া সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশের এই অক্ষয়কীর্ত্তি যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, তাহার উপায়বিধানকল্পে তিনি বাষিক চল্লিশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। উহার সমস্ত অংশই দেবতা, অতিথি ও বৈষ্ণবসেবায় ব্যয়িত হইবে। তাঁহার জমিদারীর বিভিন্ন স্থানে যে সকল সেবা-প্রতিষ্ঠান এবং শ্রীবৃন্দাবনধামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যে দুইটি কুঞ্জ বা মন্দির আছে তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহের ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। অর্থের সার্থকতা নিজের বিলাসভোগে নয়—উহার সার্থকতা দানে। পরলোকগত মহাত্মা রায় সাহেব তাঁহার বিপুল সম্পদ পরের সেবায়, আর্ত্তের দুঃখমোচনে বিলাইয়া দিয়া তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নশ্বর দেহ লয় হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার এইসকল কীর্ত্তি চিরদিন অক্ষয় হইয়া দেদীপ্যমান থাকিবে।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষে দেশময় হাহাকার পড়িয়া যায়, একমুষ্টি অন্নের জন্য যখন হাজার হাজার লোক লালায়িত হইয়া মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতে থাকে, সেই সময়ে যে সকল মহাত্মা অনশন-মৃত্যুর কবল হইতে লোকক্ষয় নিবারণ করিবার জন্য মুক্তহস্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রায় সাহেব অন্যতম। প্রজার প্রাণরক্ষাহেতু তাঁহার অসাধারণ দানে মুগ্ধ হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সদনুষ্ঠানের পারিতোষিকস্বরূপ তাঁহাকে রায় সাহেব উপাধি দান করেন। গভর্ণমেণ্ট যখন তাঁহাকে এই উপাধি-অলঙ্কারে ভূষিত করেন, তখন তিনি তরুণ যুবক। পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ ১৮৮২ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আরও সম্মানিত করিবার নিমিত্ত যখন রাজা উপাধি দিবার জন্য

আগ্রহ প্রকাশ করিলেন তখন তিনি সবিনয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি পার্থিব খ্যাতি বা প্রতিপত্তির প্রত্যাশী ছিলেন না। তখন তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে—প্রতিষ্ঠা তখন তাঁহার নিকট শূকরীবিষ্ঠাবৎ। যিনি আপনাকে গোবিন্দজীউর বাড়ীর কাল কুকুর নামে অভিহিত করিয়া বিপুল নির্ম্মল আনন্দ লাভ এবং নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও সম্মানিত মনে করিতেন, পার্থিব রাজ-সম্মান তাঁহাকে কি আর বিচলিত করিতে পারে? বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং ভক্ত বৈষ্ণব তাঁহাকে ভক্তিভূষণ, ভক্তিভৃঙ্গ, বিদ্যারত্ন বা বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি উপাধিগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সকল সময়ে সহাস্যে সবিনয়ে সে সকল প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেন, "গোবিন্দজীর কাল কুকুরই আমার শ্রেষ্ঠ উপাধি। অন্য উপাধির আকাঙ্ক্ষা নাই।"

তিনি বিষয়ে অনাসক্ত এবং সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলেও কোনও রূপ বৈষয়িক বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণে বা সাংসারিক কোনও রূপ কর্ত্তব্য-পালনে কেহ কোনওদিন তাঁহার কোনও রূপ ক্রটী লক্ষ্য করে নাই। তিনি চিরজীবন দিনাজপুরেই অতিবাহিত করিয়াছেন এবংপ্রতি-দিন আহ্নিক পূজার পর নিয়মিতভাবে জমিদারীর কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। এমন কি অন্ধ হইবার পরও এ কার্য্য হইতে বিরত হন নাই। চক্ষে দেখিতে না পাইলে অর্থী-প্রত্যর্থীর এবং দুঃস্থ প্রজার আর্জ্জি বা নিবেদন শুনিয়া তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কর্ম্মচারী-দিগকে যথাবিহিত আদেশ ও পরামর্শ দিয়াছেন। প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতা এবং অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে সকল সময়েই তাঁহাকে অবহিত দেখা গিয়াছে। স্বধর্ম্মে যেমন তাঁহার বিশ্বাস ছিল, পরধর্ম্মেও তেমনই তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। মুসলমান প্রজার জন্যও মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া সর্ব্বধর্ম্মে তাঁহার সমদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই জন্যই মুসলমানগণও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত এবং

তাঁহার পরলোকগমনের পর দিনাজপুরের মুসলমান সম্প্রদায় অগ্রণী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে শোকসভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

আজিকালিকার দিন স্বর্গগত রায়, সাহেবের মত আশ্রিতবৎসল, বহুজন-প্রতিপালক বড় কমই দেখা যায়। তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীরা কোন দিনই তাঁহার প্রভুত্বশক্তির পরিচয় পায় নাই। অতি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিতও তিনি বন্ধুবৎ আচরণ করিতেন। তাঁহারা যে পরাধীন একথা উপলব্ধি করিবার অবসর তাঁহারা কোনও দিনই পান নাই। জীবনে তাঁহাকে কাহারও নিন্দা করিতে বা ক্রোধের বশীভূত হইতে কেহ দেখে নাই। একবারমাত্র তিনি একজন দ্বারবানের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। সেই ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই পার্শ্বস্থিত একজন সুহৃৎ কর্ম্মচারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমার ক্রোধ হল, আমাকে সাবধান করিলেন না কেন?" তদুত্তরে সেই সুহৃৎ বলিয়াছিলেন,—"অন্যায় কিছু করেন নাই। এতে কার না ক্রোধ হয়?" তিনি উত্তর করিলেন,—"অন্যায় না হোক্ ক্রোধ ত বটে, ক্রুদ্ধ না হলেও ত প্রতিকার করিতে পারিতাম, এখনও বুক দুর দুর করছে।" সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারীর যাহা লক্ষণ, তাহা পূর্ণ মাত্রায়ই তাঁহার স্বভাব-চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্ম মহাশয় ১৩৩৩ সালের কায়স্থ পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় উক্ত মহাত্মার লোকান্তর গমনের পর যথার্থই লিখিয়াছেন,—"কায়স্থ সৌরজগতের আর একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হইল। আমাদের কায়স্থ সমাজের গৌরব, বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের উজ্জ্বল রত্ন, দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ রায় সাহেব মহোদয় সম্প্রতি তাঁহার কর্ম্মজীবন হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"২৫ বৎসরের উপর তাঁহার সহিত আমার আলাপপরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। আমি বহুবার তাঁহার

সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কেবল আমি বলিয়া নহে, যিনি কখনও সেই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সাধুতা, উদারতা, সরলতা, বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও জ্ঞানীর উপযুক্ত সদালাপে মুগ্ধ হইয়াছেন। কায়স্থ জাতির তিনি যথার্থ একজন বান্ধব ছিলেন। কিসে কায়স্থ জাতির মর্য্যাদা, সামাজিক গৌরব ও স্বধর্ম্মোচিত সংস্কার অক্ষুণ্ণ থাকে এ সম্বন্ধে তিনি অনেকের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। স্বজাতির গৌরব-প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহারই উদারতা-প্রভাবে প্রথমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম-এ মহোদয় এবং পরে তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ রায় মহাশয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রোচিত উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন। কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠা হইতে রায় সাহেব এই সভার সভ্য হইয়াছেন এবং সভার সকল কার্য্যেই তিনি সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। আজ তাঁহার অভাবে কায়স্থ-জগতের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। আশা করি এবং করুণাময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সেই মহাপুরুষের উপযুক্ত পুত্রদ্বয় পিতৃদেবের নির্ম্মল চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বজাতির ও সমাজের গৌরব ও মঙ্গল-বিধানে নিয়ত তৎপর হইবেন।”

ভগবানের বিধানে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। শেষ জীবনে তাঁহার স্ত্রী ও জামাতৃ-বিয়োগ হয় ও তিনি নিজে অন্ধ হন। এই দুর্ভাগ্যের জন্য তিনি শোকার্ত্ত, ক্লিষ্ট বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। এ সকলও সেই ভগবানের নির্দ্দেশ মনে করিয়া মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন এবং প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় ‘তরোরপি সহিষ্ণুতা’ প্রদর্শন করিয়া অটল প্রশান্ত ছিলেন। কেবল একটী বিষয়ে তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। তিনি অন্ধ হইবার পর পাছে অতিথি-সৎকারে কোনও ত্রুটী হয় ভাবিয়া

সময়ে সময়ে বড়ই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন এবং সে জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। অন্ধাবস্থায়ও তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চার বিরতি ঘটে নাই। একজন পণ্ডিত তাঁহার নিকটে বসিয়া প্রতিদিন তাঁহার অভিপ্রায়-অনুযায়ী শাস্ত্রপাঠ করিয়া শুনাইতেন।

গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার তাঁহার সম্বন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন, "যৌবনকাল হইতে তাঁহার অলোকসামান্য ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্রের দৃঢ়তা সত্যব্রত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও চরিত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল। এই ভোগসর্ব্বস্ব যুগে অতুল সম্পদ ও ভোগ্যবস্তুর মধ্যে এমন অনাসক্তি আমাদের অসাধারণ বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ইহাও বিস্ময়ের বিষয় যে, তাঁহার নিজমুখ হইতে তাঁহার অলৌকিক বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের সামান্য আভাসও কেহ কখনও প্রাপ্ত হয় নাই। "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"—এই ভগবদুক্তি তাঁহার সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য। ধন্য সেই বংশ, ধন্য সেই ভূমি, যাহাতে এই লোকান্তর মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

এই মহাপুরুষ ৭৭ বৎসর বয়সে ১৩৩৩ সালে ২৯শে অগ্রহায়ণ একাদশীর দিন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

চাঁচল রাজ-বংশ।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বড়িশা (বেহালা-বড়িশা) গ্রামের সাবর্ণ চৌধুরী বংশের ৺ সন্তোষ রায় এবং ৺ কালীচরণ রায় দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। গৃহবিবাদের জন্য ৺ কালীচরণ রায় সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ হইয়া মালদহ জেলার অন্তর্গত চাঁচলের অতি সন্নিকটে পাহাড়পুরে যাইয়া তথায় ভূসম্পত্তি খরিদ করিয়া বসবাস করেন। তদবধি চাঁচলের রাজবংশ চলিয়া আসিতেছে। ৺ কালীচরণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র ৺ কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, তাঁহার দত্তক পুত্র ৺ ধরণীধর রায় চৌধুরী, তাঁহার পুত্র ৺ গৌরীকান্ত রায় চৌধুরী, তাঁহার পুত্র ৺ রামচন্দ্র রায় চৌধুরী, তাঁহার পুত্র ৺ ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী, তাঁহার দত্তক পুত্র রাজা শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর।

রায় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সি. আই. ই

রায় তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সি-আই-ই

রায় শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর তাঁহার মাতার মাতুলালয় বর্দ্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত রাণাপাড়া গ্রামে ১২৭২ সনে পৌষসংক্রান্তিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ রাখালদাস মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

৺ রাখালদাস মুখোপাধ্যায় কুলীন বংশোদ্ভব, কুলের মুকুটি, গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান। উত্তরপাড়া-নিবাসী ৺ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় যে বংশোদ্ভব, রায় তারাপ্রসন্নও সেই বংশোদ্ভব। রাজা প্যারীমোহন তারাপ্রসন্নের নিকট জ্ঞাতি ছিলেন।

রায় তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খামারগাছি গ্রামে বাস করিতেন, পরে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হন। রায় বাহাদুরের পিতা জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী পাঁচড়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে বাস করিতেন, এক্ষণে রায় বাহাদুর সেইস্থানে বাস করিতেছেন। রায় বাহাদুর বাল্যকালে কিছুদিন বর্দ্ধমান রাজ-স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া বর্দ্ধমান হইতে চুঁচুড়ায় যান, তথায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন এবং তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া হুগলী কলেজে এফ্-এ পড়েন। পরে কলিকাতায় আসিয়া জেনারেল এসেম্ব্লী কলেজ হইতে এফ্-এ পাশ করেন। মেট্রোপলিটন কলেজ হইতে তিনি বি-এ পাশ করেন। বি-এ পাশ করিবার পর কিছুদিন এটর্ণী অফিসে কার্য্য করিয়া তিনি হাওড়া জেলার

অন্তঃপাতী জগৎবল্লভপুর হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার হন। উক্ত পদে কার্য্য করিতে করিতে তিনি বি-এল্ পরীক্ষা দেন এবং বর্দ্ধমানে ওকালতী আরম্ভ করেন। জগৎবল্লভপুরের অধিবাসিগণ তাঁহার উপর এতাদৃশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে স্কুলের সেক্রেটারী-পদে নিযুক্ত করেন; কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে জগৎবল্লভপুরে আসিয়া সেক্রেটারীর গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে অসুবিধা হওয়ায় কিছুদিন পরে তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন।

আজ প্রায় ৪০ বৎসরকাল তিনি বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতেছেন। ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পরই তিনি সদর লোকাল বোর্ডের মেম্বর নির্ব্বাচিত হন। এই প্রকার অবৈতনিক জনহিতকর কার্য্য করিতে তারাপ্রসন্নবাবু বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন। বর্দ্ধমানের স্বনামধন্য রায় ৺ নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর তাঁহাকে সমধিক স্নেহ করিতেন। রায় বাহাদুরের জীবন হেতমপুর রাজ-ষ্টেটের কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি অনেক সময় বলেন যে, তিনি আপন স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির অপেক্ষা জেলা বোর্ডকে অধিকতর ভালবাসেন। তিনি নিজের পয়সা-কড়ির আদৌ কোন হিসাব রাখেন না, কিন্তু জেলাবোর্ডের একটি পয়সার কোন মতে অপচয় হইবার উপায় নাই। এজন্য তিনি জেলাবোর্ডের অনেক স্বার্থান্বেষী কর্ম্মচারীর বিরাগভাজন হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কখনও আপন কর্ত্তব্যপথ হইতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হন নাই। বর্দ্ধমানের প্রবীণ ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—"Rai Tara Prasanna Mukherjee Bahadoor, a faithful guardian of the District Board finance" অর্থাৎ তারাপ্রসন্নবাবু জেলা বোর্ডের টাকাকড়ির একজন বিশ্বাসভাজন পরিরক্ষক।

বর্দ্ধমান লোকাল বোর্ডের সদস্য হইবার পর কিছুদিনের মধ্যে তিনি

উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং জেলাবোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। একাদিক্রমে ১৮ বৎসরকাল কার্য্য করিবার পর তিনি সদর লোকাল-বোর্ডের চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়া ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করেন। বরাবরই সহরবাসীরা তাঁহাকে লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া আসিতেছে। সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরকাল দেশবাসীর অকপট ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করা নিতান্ত কম লোকপ্রিয়তার পরিচায়ক নহে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বেতনভোগী ভৃত্যের ন্যায় ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ভাইস্-চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার দেশহিতকর কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" ও "সি-আই-ই" উপাধি প্রদান করেন।

তাঁহার মাতৃপিতৃ-ভক্তি আদর্শস্থানীয়। তিনি বলেন, জগতে মাতা-পিতার ন্যায় "সাক্ষাৎ ঈশ্বর" আর নাই। মাতাপিতার পূজা না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করেন না। তিনি তাঁহার আপন চেষ্টায় স্বগ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি পাকা রাস্তা, মধ্য ইংরাজি স্কুল, সংস্কৃত টোল, বালিকা বিদ্যালয় ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি অন্যকে উপদেশ দেন—Appearless than what you are. Go supperless to bed than to rise in debt.

রায় বাহাদুর বেশভূষা সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি অনাড়ম্বর। তাঁহার পিতা তাঁহাকে মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, "কখনও আশ্রিত অথবা অতিথিকে গৃহ হইতে বিফলমনোরথ হইয়া যাইতে দিবে না।" রায় বাহাদুর কখনও পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই এবং অনেক গরীব-দুঃখী ছাত্রকে অন্নদান করিয়া তিনি তাহাদের লেখাপড়া শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিতেছেন।

তিনি তোষামদপ্রিয় লোককে অত্যন্ত ঘৃণা করেন; যাঁহারা

তাঁহাকে উচিত কথা বলে তিনি তাহাদিগকে বরং অধিক শ্রদ্ধা করেন। তাঁহাকে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, তিনি বুঝি গবর্ণমেণ্টের তোষামদপ্রিয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে নানা বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, তিনি কতদূর স্বাধীনচেতা। বিচার ও শাসনবিভাগ পৃথকীকরণ বিষয়ে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরূপে অতি জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতার সারাংশ এই—

"The union of Magistrates with Collectors has been stigmatised as incompatible, but the junction of the thief-catcher with judge is surely more anomalous in theory, more mischievous in practice; so long as it lasts, the public confidence in our criminal tribunals must always be liable to injury and the authority of justice itself must often be abused and mis-applied, and the power of appeal is not a sufficient remedy for the evils."

রায় বাহাদুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে কার্য্য করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিবার পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী মনোহরপুর-নিবাসী ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন, প্রায় ৬।৭ বৎসর হইল শরৎকুমারী পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি বামনদাস নামক একমাত্র পুত্র ও একমাত্র কন্যা শ্রীমতী পঙ্কুবালা দেবীকে রাখিয়া যান। শ্রীমতী পঙ্কুবালার তিনটি পুত্র ও এক কন্যা।

দৌহিত্র ও দৌহিত্রী-পরিবেষ্টিত হইয়াই তিনি কন্যার কলিকাতাস্থ বাসায় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

রায় বাহাদুরের পিতাও তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় রাহাদুর ও কনিষ্ঠ পুত্র হারাধন মুখোপাধ্যায় ও তিনটি কন্যাকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র হারাধন আজ প্রায় ৬।৭ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র শ্রীযুত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

তাঁহার শ্বশুর গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কলিকাতায় অনেক সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। কলিকাতায় তিনি ২৪নং ক্রীক্ রোতে বাস করিতেন।

রায় বাহাদুর নিম্নলিখিত জনহিতকর কার্য্যসমূহ করিয়াছেন :—

(১) প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ সদর লোকাল বোর্ডের সদস্য (২) উক্ত বোর্ডের ১৭ বৎসর যাবৎ চেয়ারম্যান (৩) ৪০ বৎসর যাবৎ বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের সভ্য (৪) ৩৫ বৎসর যাবৎ বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের অন্তর্গত সাব কমিটি সমূহের সভ্য (৫) ৩০ বৎসর যাবৎ বর্দ্ধমান টেক্‌নিকাল স্কুল কমিটির সহকারী সভাপতি (৬) ৩০ বৎসর যাবৎ পশু চিকিৎসা কমিটির সেক্রেটারী ও সভ্য (৭) তিন বৎসর যাবৎ বর্দ্ধমানের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (৮) বর্দ্ধমান জেলা কৃষি সমিতির সদস্য (৮) বর্দ্ধমান ফ্রেজার হাসপাতাল কমিটির সদস্য (৯) বর্দ্ধমান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভাইস্ চেয়ারম্যান (১০) ডিষ্ট্রীক্‌ট হোম ইন্‌ডাষ্ট্রীসের সদস্য (১১) বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান (১২) অন্তরীণ অবরুদ্ধদিগের ও জেলের বেসরকারী পরিদর্শক (১৩) পাঁচড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি (১৪) তিন বৎসর যাবৎ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য (১৫) বর্দ্ধমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-গঠিত দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য (১৬) বর্দ্ধমান

বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য স্থাপিত সমিতির সদস্য (১৭) বর্দ্ধমান করোনেশেন কমিটি (১৮) যুদ্ধঋণ কমিটি (১৯) সৈন্য প্রেরণ কমিটি (২০) "আওয়ার ডে" কমিটি (২০) যুদ্ধ বিরতি দিবস কমিটি (২১) শান্তি উৎসব কমিটি প্রভৃতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য : (২২) শিল্প ও কৃষি-প্রদর্শনীর সেক্রেটারী (২৩) য়্যান্টিম্যালেরিয়াল কমিটির ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট।

১৯২৭ সালে তিনি সি আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি দরবার-পদকও পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা সরকার প্রতি বৎসরই তাঁহাদের কার্য্য-বিবরণীতে রায় বাহাদুরের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন। বর্দ্ধমান জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফিসার, মিঃ ষ্টিভেন্‌সন, মিঃ ফলী, মিঃ চোজনার, মিঃ ও'ব্রায়েন, মিঃ হেকক্, মিঃ জে হুইটী, মিঃ মোবার্লী, মিঃ ওয়াস´, মিঃ মার, মিঃ ওয়াডেল, মিঃ স্কুপ, মিঃ ড্রামণ্ড, মিঃ হার্ট প্রভৃতি বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা বোর্ডের সভাপতিরূপে তাঁহাদের রিপোর্টে রায় বাহাদুরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

সমাপ্ত।

বহরমপুরের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশ-পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম।

হুগলী জেলার দাদপুর খামারগাছী গ্রামের পূর্ব্বপুরুষ ; ইঁহারা ভরদ্বাজ-গোত্র, ৺কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, কুলীন, খড়দহমেল।

৺দীননাথ মুখোপাধ্যায় দেবেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ ইং ১৮৬৪ সালের ১২ই জুন হুগলী জেলার দাদপুর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নৌকা-যোগে ১৬ই জুন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে আসেন।

রাসবিহারী
দেবেন্দ্রনাথ
সত্যেন্দ্রনাথ
Incorporated Acct.
(London)
কন্যা
জ্যোৎস্নাময়ী
পুত্র
পুত্র
কন্যা
পুত্র
কন্যা
পুত্র
পুত্র
পুণ্যপ্রভা
কন্যা
দ্বিজেন্দ্র
গৌরী
কন্যা
দীপ্তি
কন্যা
যোগেন্দ্রনাথ
জ্ঞানদাসুন্দরী
স্বামী
ক্ষীরোদ
চট্টোপাধ্যায়
উকিল, লাহোর
হেমন্তকুমারী
পুত্র
বসন্তকুমারী
৺কীর্ত্তি চট্টোপাধ্যায়
উকিলের
পুত্রবধূ
মথুরানাথ
পান্নারাণী
উষারাণী
স্বামী
সতীপ্রসাদ গাঙ্গুলী
Sub Dy. Collr.
কন্যা
পুরেন্দ্র
কন্যা
পুত্র
পুত্র
কন্যা
পুত্র
কন্যা
দীপেন্দ্রকুমার
কন্যা
বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়
M. A. Ph. D. (London)
সুজনরাজ চট্টোপাধ্যায়
B. S. M. D. (Eng)
পুত্র
পুত্র
কন্যা
কন্যা